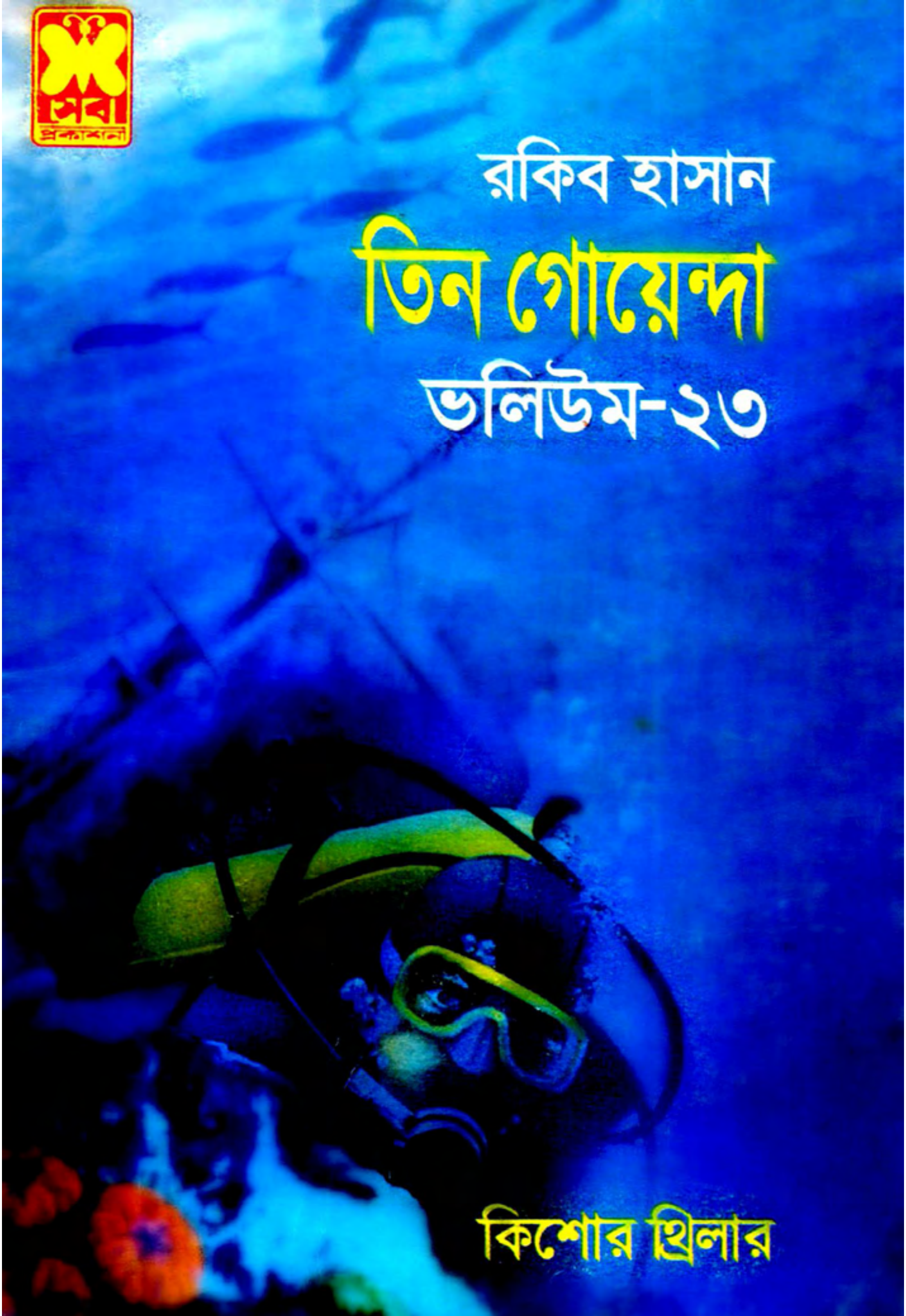
সেবা
প্রকাশনী
রকিব হাসান
তিন গোয়েন্দা
ভলিউম-২৩
কিশোর থ্রিলার

পঁয়তাল্লিশ টাকা

ISBN 984-16-1339-5
প্রকাশক
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
সর্বস্বত্ব প্রকাশকের
প্রথম প্রকাশ: ১৯৯৮
প্রচ্ছদ: বিদেশি ছবি অবলম্বনে
আলীম আজিজ
রচনা: বিদেশি কাহিনি অবলম্বনে
মুদ্রাকর
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেগুনবাগান প্রেস
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
হেড অফিস
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
দূরালাপন: ৮৩১ ৪১৮৪
মোবাইল: ০১১-৯৯-৮৯৪০৫৩
জি. পি. ও বক্স: ৮৫০
E-mail: sebaprok@citechco.net
Web Site: www.ancbooks.com
একমাত্র পরিবেশক
প্রজাপতি প্রকাশন
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
শো-রুম
সেবা প্রকাশনী
৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
প্রজাপতি প্রকাশন
৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
মোবাইল: ০১৭১৮-১৯০২০৩
Volume-23
TIN GOYENDA SERIES
By: Rakib Hassan

পুরানো কামান : ৫—৮০
গেল কোথায় : ৮১—১৫৬
ওকিমুরো করপোরেশন : ১৫৭—২২৪

তিন গোয়েন্দার আরও বই:

তি. গো. ভ. ১/১	(তিন গোয়েন্দা, কঙ্কাল দ্বীপ, রূপালী মাকড়সা)	৫০/-
তি. গো. ভ. ১/২	(ছায়াশ্বাপদ, মমি, রত্নদানো)	৫০/-
তি. গো. ভ. ২/১	(প্রেতসাধনা, রক্তচক্ষু, সাগর সৈকত)	৪৫/-
তি. গো. ভ. ২/২	(জলদস্যুর দ্বীপ-১,২, সবুজ ভূত)	৩৮/-
তি. গো. ভ. ৩/১	(হারানো তিমি, মুক্তোশিকারী, মৃত্যুখনি)	৪৩/-
তি. গো. ভ. ৩/২	(কাকাতুয়া রহস্য, ছুটি, ভূতের হাসি)	৪৩/-
তি. গো. ভ. ৪/১	(ছিনতাই, ভীষণ অরণ্য ১,২)	৪১/-
তি. গো. ভ. ৪/২	(ড্রাগন, হারানো উপত্যকা, গুহামানব)	৪০/-
তি. গো. ভ. ৫	(ভীতু সিংহ, মহাকাশের আগন্তুক, ইন্দ্রজাল)	৪৫/-
তি. গো. ভ. ৬	(মহাবিপদ, খেপা শয়তান, রত্নচোর)	৪১/-
তি. গো. ভ. ৭	(পুরনো শত্রু, বোম্বেটে, ভূতুড়ে সুড়ঙ্গ)	৪২/-
তি. গো. ভ. ৮	(আবার সম্মেলন, ভয়ালগিরি, কালো জাহাজ)	৪৭/-
তি. গো. ভ. ৯	(পোচার, ঘড়ির গোলমাল, কানা বেড়াল)	৪৬/-
তি. গো. ভ. ১০	(বাক্সটা প্রয়োজন, খোঁড়া গোয়েন্দা, অথৈ সাগর ১)	৪৭/-
তি. গো. ভ. ১১	(অথৈ সাগর ২, বুদ্ধির ঝিলিক, গোলাপী মুক্তো)	৪৪/-
তি. গো. ভ. ১২	(প্রজাপতির খামার, পাগল সংঘ, ভাঙা ঘোড়া)	৪৫/-
তি. গো. ভ. ১৩	(ঢাকায় তিন গোয়েন্দা, জলকন্যা, বেগুনী জলদস্যু)	৪৩/-
তি. গো. ভ. ১৪	(পায়ের ছাপ, তেপান্তর, সিংহের গর্জন)	৪৫/-
তি. গো. ভ. ১৫	(পুরনো ভূত, জাদুচক্র, গাড়ির জাদুকর)	৪৭/-
তি. গো. ভ. ১৬	(প্রাচীন মূর্তি, নিশাচর, দক্ষিণের দ্বীপ)	৪৬/-
তি. গো. ভ. ১৭	(ঈশ্বরের অশ্রু, নকল কিশোর, তিন পিশাচ)	৪৬/-
তি. গো. ভ. ১৮	(খাবারে বিষ, ওয়ার্নিং বেল, অবাক কাণ্ড)	৪৩/-
তি. গো. ভ. ১৯	(বিমান দুর্ঘটনা, গোরস্তানে আতঙ্ক, রেসের ঘোড়া)	৪৫/-
তি. গো. ভ. ২০	(খুন, স্পেনের জাদুকর, বানরের মুখোশ)	৪২/-
তি. গো. ভ. ২১	(ধূসর মেরু, কালো হাত, মূর্তির হুঙ্কার)	৪৩/-
তি. গো. ভ. ২২	(চিতা নিরুদ্দেশ, অভিনয়, আলোর সংকেত)	৪২/-
তি. গো. ভ. ২৩	(পুরানো কামান, গেল কোথায়, ওকিমুরো কর্পোরেশন)	৪৫/-
তি. গো. ভ. ২৪	(অপারেশন কক্সবাজার, মায়া নেকড়ে, প্রেতাত্মার প্রতিশোধ)	৩৭/-
তি. গো. ভ. ২৫	(জিনার সেই দ্বীপ, কুকুরখেকো ডাইনী, গুপ্তচর শিকারী)	৪৪/-
তি. গো. ভ. ২৬	(ঝামেলা, বিষাক্ত অর্কিড, সোনার খোঁজে)	৪৫/-
তি. গো. ভ. ২৭	(ঐতিহাসিক দুর্গ, তুষার বন্দি, রাতের আঁধারে)	৪১/-
তি. গো. ভ. ২৮	(ডাকাতের পিছে, বিপজ্জনক খেলা, ভ্যাম্পায়ারের দ্বীপ)	৪৮/-
তি. গো. ভ. ২৯	(আরেক ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইন, মায়াজাল, সৈকতে সাবধান)	৩৮/-
তি. গো. ভ. ৩০	(নরকে হাজির, ভয়ঙ্কর অসহায়, গোপন ফর্মুলা)	৪৫/-
তি. গো. ভ. ৩১	(মারাত্মক ভুল, খেলার নেশা, মাকড়সা মানব)	৩৯/-
তি. গো. ভ. ৩২	(প্রেতের ছায়া, রাত্রি ভয়ঙ্কর, খেপা কিশোর)	৪৫/-
তি. গো. ভ. ৩৩	(শয়তানের থাবা, পতঙ্গ ব্যবসা, জাল নোট)	৪১/-
তি. গো. ভ. ৩৪	(যুদ্ধ ঘোষণা, দ্বীপের মালিক, কিশোর জাদুকর)	৪১/-
তি. গো. ভ. ৩৫	(নকশা, মৃত্যুঘড়ি, তিন বিঘা)	৪৩/-

তি. গো. ভ. ৩৬	(টক্কর, দক্ষিণ যাত্রা, গ্রেট রবিনিয়োসো)	৪২/-
তি. গো. ভ. ৩৭	(ভোরের পিশাচ, গ্রেট কিশোরিয়োসো, নিখোঁজ সংবাদ)	৩৯/-
তি. গো. ভ. ৩৮	(উচ্ছেদ, ঠগবাজি, দীঘির দানো)	৩৯/-
তি. গো. ভ. ৩৯	(বিষের ভয়, জলদস্যুর মোহর, চাঁদের ছায়া)	৩৮/-
তি. গো. ভ. ৪০	(অভিশপ্ত লকেট, গ্রেট মুসাইয়োসো, অপারেশন অ্যালিগেটর)	৪২/-
তি. গো. ভ. ৪১	(নতুন স্যার, মানুষ ছিনতাই, পিশাচকন্যা)	৪৩/-
তি. গো. ভ. ৪২	(এখানেও ঝামেলা, দুর্গম কারাগার, ডাকাত সর্দার)	৪১/-
তি. গো. ভ. ৪৩	(আবার ঝামেলা, সময় সুড়ঙ্গ, ছদ্মবেশী গোয়েন্দা)	৩৯/-
তি. গো. ভ. ৪৪	(প্রত্নসন্ধান, নিষিদ্ধ এলাকা, জবরদখল)	৪০/-
তি. গো. ভ. ৪৫	(বড়দিনের ছুটি, বিড়াল উধাও, টাকার খেলা)	৩৪/-
তি. গো. ভ. ৪৬	(আমি রবিন বলছি, উল্কির রহস্য, নেকড়ের গুহা)	৩৭/-
তি. গো. ভ. ৪৭	(নেতা নির্বাচন, সি সি সি, যুদ্ধযাত্রা)	৩৪/-
তি. গো. ভ. ৪৮	(হারানো জাহাজ, শ্বাপদের চোখ, পোষা ডাইনোসর)	৩৯/-
তি. গো. ভ. ৪৯	(মাছির সার্কাস, মঞ্চভীতি, ডীপ ফ্রিজ)	৩৬/-
তি. গো. ভ. ৫০	(কবরের প্রহরী, তাসের খেলা, খেলনা ভালুক)	৩৬/-
তি. গো. ভ. ৫১	(পেঁচার ডাক, প্রেতের অভিশাপ, রক্তমাখা ছোরা)	৩৬/-
তি. গো. ভ. ৫২	(উড়ো চিঠি, স্পাইডারম্যান, মানুষখেকোর দেশে)	৪০/-
তি. গো. ভ. ৫৩	(মাছেরা সাবধান, সীমান্তে সংঘাত, মরুভূমির আতঙ্ক)	৪০/-
তি. গো. ভ. ৫৪	(গরমের ছুটি, স্বর্গদ্বীপ, চাঁদের পাহাড়)	৩৪/-
তি. গো. ভ. ৫৫	(রহস্যের খোঁজে, বাংলাদেশে তিন গোয়েন্দা, টাক রহস্য)	৩৪/-
তি. গো. ভ. ৫৬	(হারজিত, জয়দেবপুরে তিন গোয়েন্দা, ইলেট্রনিক আতঙ্ক)	৩০/-
তি. গো. ভ. ৫৭	(ভয়াল দানব, বাঁশিরহস্য, ভূতের খেলা)	৩৪/-
তি. গো. ভ. ৫৮	(মোমের পুতুল, ছবিরহস্য, সুরের মায়া)	৩৩/-
তি. গো. ভ. ৫৯	(চোরের আস্তানা, মেডেল রহস্য, নিশির ডাক)	৩৩/-
তি. গো. ভ. ৬০	(শুঁটকি বাহিনী, ট্রাইম ট্র্যাভেল, শুঁটকি শত্রু)	৩৪/-
তি. গো. ভ. ৬১	(চাঁদের অসুখ, ইউএফও রহস্য, মুকুটের খোঁজে তি. গো.)	৩৫/-
তি. গো. ভ. ৬২	(যমজ ভূত, ঝড়ের বনে, মোমপিশাচের জাদুঘর)	৩৩/-
তি. গো. ভ. ৬৩	(ড্রাকুলার রক্ত, সরাইখানায় ষড়যন্ত্র, হানাবাড়িতে তিন গোয়েন্দা)	৩৮/-
তি. গো. ভ. ৬৪	(মায়াপথ, হীরার কার্তুজ, ড্রাকুলা-দুর্গে তিন গোয়েন্দা)	৩৫/-
তি. গো. ভ. ৬৫	(বিড়ালের অপরাধ+রহস্যভেদী তিন গোয়েন্দা+ফেরাউনের কবরে)	৩৫/-
তি. গো. ভ. ৬৬	(পাথরে বন্দী+গোয়েন্দা রোবট+কালো পিশাচ)	৩৫/-
তি. গো. ভ. ৬৭	(ভূতের গাড়ি+হারানো কুকুর+গিরিগুহার আতঙ্ক)	৩৬/-
তি. গো. ভ. ৬৮	(টেরির দানো+বাবলি বাহিনী+শুঁটকি গোয়েন্দা)	৩৫/-
তি. গো. ভ. ৬৯	(পাগলের গুপ্তধন+দুখী মানুষ+মমির আর্তনাদ)	৩৪/-
তি. গো. ভ. ৭০	(পার্কে বিপদ+বিপদের গন্ধ+ছবির জাদু)	৩৮/-
তি. গো. ভ. ৭১	(পিশাচবাহিনী+রত্নের সন্ধানে+পিশাচের থাবা)	৩৯/-
তি. গো. ভ. ৭২	(ভিনদেশী রাজকুমার+সাপের বাসা+রবিনের ডায়েরি)	৪১/-
তি. গো. ভ. ৭৩	(পৃথিবীর বাইরে+ট্রেইন ডাকাতি+ভুতুড়ে ঘড়ি)	৩৯/-

বিক্রয়ের শর্ত: এই বইটি ভিন্ন প্রচ্ছদে বিক্রয়, ভাড়া দেওয়া বা নেওয়া, কোনভাবে এর সিডি, রেকর্ড বা প্রতিলিপি তৈরি বা প্রচার করা, এবং স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ব্যতীত এর কোনও অংশ মুদ্রণ বা ফটোকপি করা আইনত দণ্ডনীয়।

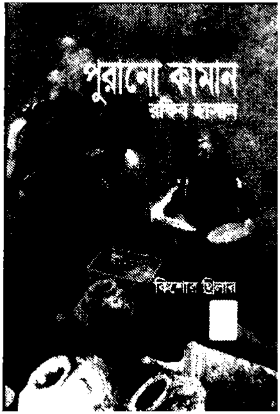

পুরানো কামান

প্রথম প্রকাশ: ১৯৯৬

নিচের দিকে সাঁতরে নামতে নামতে আচমকা মুসার কব্জি চেপে ধরল রবিন। হাত তুলে দেখাল। বিশ ফুট ওপরে একটা ছায়া, ওদেরই মত ডুবুরির পোশাক পরে ধীরে ধীরে নেমে আসছে। লোকটার পোশাকের রঙ কালো, মাথার রবারের হুডে হলুদ রঙের ডোরা আঁকা। হাতে একটা স্পীয়ারগান। তাতে বসানো বর্শার তীরের মাথার মত চোখা ফলাটা ওদের দিকে ফেরানো।

ওদেরকেই তাক করল লোকটা। টিপে দিল ট্রিগার।

শেষ মুহূর্তে রবিনকে ধাক্কা মেরে নিজেও ডাইভ দিয়ে পাশে সরে গেল মুসা।

বর্শাটা চলে গেল ওদের মাঝখান দিয়ে। অল্পের জন্যে মিস করল।

এমন করল কেন লোকটা!—অবাক হয়ে ভাবল মুসা। ওদেরকে মাছ মনে করেছিল?

এগিয়ে এসে মাফ চাওয়ার কোন লক্ষণই দেখাল না লোকটা। তাড়াহুড়ো করে ওপরে উঠতে শুরু করল।

আশ্চর্য!—রবিনও অবাক।

ওকে ইশারা করে আচমকা ওপরে উঠতে শুরু করল মুসা। কিন্তু তাকে পিছু নিতে দেখেই গতি বাড়িয়ে দিল লোকটা।

ভুস করে পানির ওপর মাথা তুলল মুসা। তার কয়েক সেকেণ্ড পরই রবিন। বড় বড় ঢেউয়ের ওপর দিয়ে তাকাল চারপাশে। বিশ ফুট দূরে ভাসছে ওদের ভাড়া করে আনা বোটটা, যেখানে নোঙর করেছিল সেখানেই আছে। তার খানিক দূরে একমনে মাছ ধরছে এক বৃদ্ধ। লোকটাকে দেখা গেল না কোথাও।

কথা বলার জন্যে ফেস মাস্ক খুলল দুজনে।

'গেল কোথায়?' মুসার প্রশ্ন।

'চলো, ওই বুড়োকে জিজ্ঞেস করি।'

সাঁতরে এগোল ওরা। নিজেদের বোটের কাছে এসে কিনার ধরে ঝুলে পড়ল। চিৎকার করে জিজ্ঞেস করল মুসা, 'অ্যাই, শুনুন, আরেকজন ডুবুরিকে দেখেছেন?'

ফিরে তাকাল বুড়ো। কুঁচকে যাওয়া মুখের চামড়া আরও কুঁচকে, টুপিটা একপাশে ঠেলে কাত করে দিয়ে এমন ভঙ্গি করল যেন বুঝতে পারেনি।

আরও জোরে চিৎকার করে মুসা বলল, 'কালো পোশাক পরা আরেকজন ডুবুরিকে দেখেছেন?'

একটা হাত কানের ওপর নিয়ে গিয়ে বলল লোকটা, 'কালো পোশাক পরা কি?'

'ডুবুরি, ডুবুরি। স্কিন ডাইভার।'

'ও, ডাইভার,' আবার ফাৎনার দিকে তাকাল বুড়ো। কয়েক মুহূর্ত পর ফিরে তাকিয়ে নিরাসক্ত ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল, 'ডাইভার কি করেছে?'

'দেখেছেন কিনা জিজ্ঞেস করছি।'

'ফাৎনা ছাড়া কিছুই দেখছি না আমি। পাশ দিয়ে তিমি গেলেও দেখতাম না।'

'সম্ভবত পানির ওপর মাথা তোলেনি,' মুসার দিকে তাকিয়ে বলল রবিন, 'ঢেউয়ের নিচ দিয়ে দিয়ে চলে গেছে তীরের দিকে।'

'হুঁ,' চিন্তিত ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল মুসা। 'আমাদের মাছ মনে করে বর্শা ছুঁড়েছিল। যখন দেখল মাছ না, মানুষ, ভয় পেয়ে পালিয়েছে।'

এটাই সহজ যুক্তি, কিন্তু কেন যেন বিশ্বাস হতে চাইল না রবিনের। তার মনে হচ্ছে জেনেশুনে ইচ্ছে করেই লোকটা বর্শা ছুঁড়েছে ওদের দিকে।

আবার ডুব দিল ওরা। দুজনেই এখন সতর্ক। লোকটাকে দেখতে পেলেই ধরার চেষ্টা করবে। কিন্তু আর দেখা গেল না ওকে। কিছুক্ষণের মধ্যেই অস্বস্তি দূর হয়ে গেল ওদের। ঘুরে বেড়াতে লাগল সাগরতলের বাগানে।

এখানে একটা বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে এসেছে ওরা। রকি বীচের কাছেই জায়গাটা। বদনাম আছে। সাগরে ঝড় উঠলে বড় বেশি উত্তাল হয়ে ওঠে এখানকার সাগর, জাহাজের জন্যে বিপজ্জনক। প্রাচীনকালে অনেক জাহাজ ডুবেছে এখানে। লোকে বলে, সেসব জাহাজ খুঁজলে আজও নাকি গুপ্তধনের সন্ধান মেলে।

অনেক খোঁজাখুঁজি করেও কোন জাহাজ চোখে পড়ল না ওদের। আরও গভীর পানির দিকে যাওয়ার ইঙ্গিত করল মুসা। ঠিক এই সময় চোখের কোণে একটা কালো ছায়া দেখতে পেল সে।

ফিরে এল নাকি লোকটা! ঝট করে সেদিকে ঘুরল সে।

মানুষ না, তবে এটাও কম ভয়ঙ্কর নয়। ভঙ্গি দেখে মনে হচ্ছে হাঙর।

কোমর থেকে ছুরি খুলে তৈরি হয়ে গেল মুসা।

আরও এগিয়ে এল প্রাণীটা।

হাঙর না, টিউনা। চিনতে পেরে শরীর ঢিল করে দিল আবার মুসা।

কিন্তু মুহূর্ত পরেই ভয়ঙ্কর এক ঘটনা ঘটল।

কতগুলো রঙিন মাছের দিকে তাকিয়ে ছিল রবিন। টিউনাটাকেও দেখেনি, অন্য কোনদিকেও নজর ছিল না। হঠাৎ প্রচণ্ড এক ঝাঁকুনি লাগল ফেস মাস্কের নলে। হ্যাঁচকা টানে মুখ থেকে খুলে গেল মাস্ক। মরিয়া হয়ে থাবা মারল সে। মাস্কটা ধরে বসিয়ে দিল আবার আগের জায়গায়। ঘোরের মধ্যে যেন বুঝতে পারল অজ্ঞান হয়ে যাচ্ছে।

টিউনার দিক থেকে নজর ফেরাতেই ধক করে উঠল মুসার বুক। আতঙ্কিত হয়ে দেখল আবার ফিরে এসেছে লোকটা। স্পীয়ারগান তাক করেছে রবিনের দিকে। ওকে সতর্ক করার আগেই ট্রিগারে চাপ দিয়ে ফেলল লোকটা।

বর্শার খোঁচায় ছিন্ন হয়ে গেল রবিনের এয়ার ট্যাংকের সঙ্গে যুক্ত ফেস মাস্কের নল। ভুরভুর করে বুদ্বুদ উঠতে লাগল।

লোকটার দিকে তাকানোর সময় নেই। জোরে জোরে ফ্লিপার নেড়ে রবিনের

দিকে ছুটল মুসা।

জ্ঞান হারিয়েছে রবিন। মরা ব্যাঙের মত চার হাত-পা ছড়িয়ে দিয়ে ধীরে ধীরে নেমে যাচ্ছে নিচের দিকে।

কাছে এসে ধরে ফেলল মুসা। রবিনকে নিয়ে উঠতে শুরু করল ওপর দিকে। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ওপরে ওঠার জন্যে পা চালাচ্ছে, তবে মাথা গরম করল না।

ভেসে উঠল। রবিনের কোমর জড়িয়ে ধরে তার মাথাটা ঠেলে ধরে রাখল ওপর দিকে। এ জন্যে অমানুষিক পরিশ্রম করতে হচ্ছে তাকে। ঢেউ না থাকলে অতটা কষ্ট হত না। নৌকাটা প্রায় চল্লিশ ফুট দূরে। রবিনকে ওপরে তুলে ধরে রেখে ধীরে ধীরে রওনা হলো সেদিকে।

সে বলেই পারল। ওর জায়গায় রবিন হলে কিছুতেই তুলে আনতে পারত না ওকে। মারা পড়ত সে। ভাগ্যিস···

আর ভাবতে চাইল না মুসা। নৌকার কাছে পৌঁছে গেল রবিনকে নিয়ে। দুহাতে ধরে অজ্ঞান দেহটাকে ঠেলে তুলল যতটা সম্ভব ওপরে। নৌকার কিনার দিয়ে ফেলে দিল পাটাতনে। নিজেও উঠে এল নৌকায়।

এই যে এত কাণ্ড ঘটে গেল কিছুই চোখে পড়ল না বুড়ো মৎস্য-শিকারির। একমনে ফাৎনার দিকে তাকিয়ে আছে।

মাস্ক খুলে দিয়ে রবিনের বুকে জোরে চাপ দিতে লাগল মুসা। পানি তেমন বেরোল না। পানির নিচে থাকার সময় নলের কাটা মুখটা টিপে বন্ধ করে রেখেছিল সে। পানি ঢুকতে পারেনি।

মুখে মুখ লাগিয়ে ফুঁ দিতে শুরু করল মুসা।

কয়েক মিনিট পর নড়েচড়ে উঠল রবিন। গুঙিয়ে উঠল। চোখ মেলতে না মেলতে শুরু হলো কাশি।

কাশি থামতে আবার গোঙাল। চোখ মেলে তাকাল মুসার দিকে। দুর্বল কণ্ঠে বিড়বিড় করে বলল, 'আমার কি হয়েছিল?'

'আবার এসেছিল লোকটা,' রেগে গিয়ে বলল মুসা। 'তোমাকে সই করে বর্শা ছুঁড়েছিল। ফেস মাস্কের নলে লেগে নল কেটে গেছে।'

'সেই লোকটাই?'

'সে ছাড়া আর কে?'

ফ্লাস্ক খুলে রবিনকে এককাপ গরম দুধ ঢেলে দিল মুসা।

খেয়ে দুর্বলতা অনেকটা কাটল রবিনের। বলল, 'ছিল কোথায় লোকটা?'

'ছিল হয়তো কোন ডুবোপাথরের আড়ালে লুকিয়ে।' আনমনে মাথা নাড়তে লাগল মুসা, 'ভূতুড়ে কাণ্ড! দুইবারই এমন করে এল আর গেল, কিছু টেরই পেলাম না।'

'কিন্তু আমাদের ওপর এত আক্রোশ কেন লোকটার? তোমার কি মনে হয় সেও গুপ্তধন খুঁজতে এসেছিল, পথের কাঁটা ভেবে সরিয়ে দিতে চেয়েছে আমাদের?'

'কি জানি কেন এমন করেছে,' গাল চুলকাল মুসা। 'তবে আমরা তার কোন ব্যাপারে না জেনে বাগড়া দিয়েছি, তাতে কোন সন্দেহ নেই। দুই দুইবার মাছ ভেবে ভুল করেছে, এ হতে পারে না। আসার আর সময় পেল না ব্যাটা,' গজগজ

করতে লাগল সে, 'আমাদের ডুব দেয়াটারই বারোটা বাজাল আজ।'

'কি আর করা। চলো, বাড়ি ফিরে যাই।'

এত তাড়াতাড়ি ফিরতে ইচ্ছে করছে না মুসার। কিন্তু আর নামারও উপায় নেই। রবিনের মাস্কের নল ছেঁড়া। ভাল থাকলেও আর নামার ঝুঁকি নেয়া ঠিক হত না। লোকটা খুনী।

কাঁধ ঝাঁকিয়ে একটা নিরাশ ভঙ্গি করে ইঞ্জিন স্টার্ট দেয়ার জন্যে হাত বাড়াল মুসা।

ডাকল রবিন, 'মুসা।'

'কি?'

'থ্যাংক ইউ।'

বুঝতে পারল না মুসা। ভুরু কুঁচকাল। 'মানে?'

'আমাকে বাঁচানোর জন্যে ধন্যবাদটা দিলাম।'

হাসল মুসা। রোদ লেগে ঝিক করে উঠল তার সাদা দাঁত।

দুই

জেটিতে পৌছে মালিককে নৌকাটা ফিরিয়ে দিয়ে সবে রাস্তার দিকে রওনা হয়েছে ওরা, এই সময় উঠে দাঁড়াল খানিক দূরে বেঞ্চে বসা একজন লোক। লম্বা লম্বা পায়ে এগিয়ে এল। পেছন থেকে ডাকল, 'অ্যাই, শোনো।'

ফিরে তাকাল দুজনেই।

রবিন জিজ্ঞেস করল, 'আমাদের ডাকছেন?'

মাথা ঝাঁকিয়ে এগিয়ে এল লোকটা। বয়েস পঁয়তিরিশ হবে, গাট্টাগোট্টা শরীর, কালো চুল। বলল, 'আমার নাম হ্যামার রকবিল। ফ্লোরিডার টাম্পা থেকে এসেছি আমি। তোমরা তিন গোয়েন্দা না?'

চট করে মুসার চোখে চোখে তাকাল রবিন। লোকটার দিকে ফিরে বলল, 'হ্যাঁ। আমাদেরকে কি দরকার?'

'একটা তদন্ত করে দিতে হবে।'

দুজনেই বুঝতে পারল, ভালমত খোঁজ নিয়েই ওদের কাছে এসেছে।

'ইয়ার্ডে গিয়েছিলাম,' লোকটা বলল, 'তোমাদের নেতা কিশোর পাশাকে পেলাম না। বাড়ি নেই। কোথায় নাকি বেড়াতে গেছে।'

'হ্যাঁ,' মাথা ঝাঁকাল রবিন। কিশোর গেছে মেরিচাচীর সঙ্গে দূরের এক শহরে তাঁর এক বোনের বাড়িতে বেড়াতে। সেকথা লোকটাকে বলার প্রয়োজন মনে করল না।

'ভালুকের মত এক লোক বলল এখানে এলে তোমাদেরকে পাওয়া যেতে পারে। অনেকক্ষণ ধরে এসে বসে আছি।'

রবিনের দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসল মুসা। নিশ্চয় ব্যাভারিয়ান দুই ভাই বোরিস অথবা রোভার কারও সঙ্গে দেখা হয়েছে। লোকটার দিকে ফিরল। 'বেশ,

বলে ফেলুন এবার, কিসের তদন্ত করতে হবে?'

'চলো, হাঁটতে হাঁটতে বলছি,' মুসা আর রবিনকে সঙ্গে নিয়ে রাস্তার দিকে এগোল হ্যামার। 'আঠারো শতকে তৈরি পুরানো একটা কামান খুঁজে বের করে দিতে হবে। যতদূর জানি, জিনিসটা জলদস্যুরাও ব্যবহার করেছিল, ডেমিকালভেরিন জাতের কামান। আমার ধারণা, রকি বীচের আশেপাশেই কোনখানে আছে ওটা।'

'রকি বীচে জলদস্যুদের কামান লুকানো আছে?' বিশ্বাস করতে পারল না রবিন।

'আছে। নির্ভরযোগ্য সূত্র থেকে জেনেছি আমি। তবে কোন্ সূত্র, সেটা আপাতত বলা যাবে না তোমাদের।'

রাস্তায় এসে ফুটপাথ ধরে এগোল ওরা। কামানটা কেমন জানতে চাইল রবিন। হ্যামার জানাল, লম্বায় নয় ফুট, ওজন তেরো-চোদ্দ মন। আট পাউণ্ড ওজনের গোলা ছোঁড়া হত ওটা দিয়ে।

'কিন্তু পুরানো কামান দিয়ে আপনি কি করবেন?' জিজ্ঞেস করল রবিন।

হাসল হ্যামার। 'টাম্পা সিটিতে এ বছর জলদস্যুদের ওপর একটা মেলা হতে যাচ্ছে। অনেকগুলো জলদস্যুর জাহাজ আর বোট সাজানো হবে। তাতে যদি এমন কোন কামান রাখা যায় যেটা সত্যি সত্যি জলদস্যুরা ব্যবহার করেছিল, অনেক বেশি আকর্ষণীয় হবে সেটা।'

'মানুষ আসলে পাগল,' ফস করে বলে বসল মুসা। 'আর কোন কাজ পায় না, জলদস্যুদের নিয়ে মেলা...'

পথের একটা মোড় ঘুরল ওরা। মুসার এ রকম চাঁছাছোলা কথায় অনেকে রেগে যায়, হ্যামারও যেতে পারে, তাই সামলানোর জন্যে তাড়াতাড়ি বলল রবিন, 'আমি যদ্দূর জানি ও ধরনের কামান তো ক্যারিবিয়ানের ওদিকটায় পাওয়া যায়, এক সময় অনেক স্প্যানিশ জাহাজ ডুবেছে ওখানে।'

'এদিকেও ডুবেছে। অনেক জায়গায়ই ডুবেছে স্প্যানিশ জাহাজ...'

হ্যামারের কথা শেষ হলো না। বুম করে একটা শব্দ, পরক্ষণে কেঁপে উঠল বাতাস।

চমকে গেল তিনজনেই।

হ্যামার বলল, 'কি হলো?'

খোলা একটা চত্বরের দিকে হাত তুলল মুসা, 'ওদিকে হয়েছে।' বলেই দৌড় দিল সে। পেছনে পেছনে ছুটল বাকি দুজন।

দেখতে দেখতে লোক জমে গেল চত্বরে। টাউন হলের সামনের চত্বরে. সিমেন্টে বাঁধাই একটা মঞ্চের ওপর একটা পুরানো কামান রাখা। ধোঁয়া বেরোচ্ছে মুখ থেকে।

'গোলা ছুঁড়েছে কেউ!' অবাক হয়ে চিৎকার করে উঠল রবিন। 'বারুদের গন্ধ পাচ্ছ?'

ভিড় ঠেলে ভেতরে ঢুকে পড়ল মুসা। পেছনে পথ করে এগোল রবিন আর হ্যামার।

ততক্ষণে পৌঁছে গেছে ওখানে রকি বীচ থানার দুজন অফিসার, মরিস ডুবয়

আর লুক কারম্যান। ওদের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন ছুঁড়ে দিচ্ছে জনতা:

'কি হয়েছে?'

'গোলা ছুঁড়ল কে?'

'কেউ কি ব্যথা পেল?'

পুলিশ অফিসাররা জবাব দেবার আগেই গর্জে উঠল একটা কণ্ঠ। মঞ্চে কামানের পেছন থেকে বেরিয়ে এসেছে ঝাঁকড়া চুলওয়ালা এক বৃদ্ধ, পরনে দুশো বছর আগের সেনাবাহিনীর পোশাক, মাথায় তিনকোণা হ্যাট।

'হচ্ছেটা কি এখানে?' গমগম করে উঠল তার গলা।

'তার আগে আমি জানতে পারি কি,' কঠিন পুলিশী গলায় জিজ্ঞেস করল ডুবয়, 'আপনি লোকটা কে?'

রোদে পোড়া মুখে হাসি ফুটল লোকটার। জানাল তার নাম জ্যাক হুবার্ট। ন্যাশনাল গার্ডের গোলন্দাজ বিভাগের সার্জেন্ট ছিল, বর্তমানে অবসরপ্রাপ্ত। ইনডিপেনডেন্স ডে-র ক্যানন স্যালুটের দায়িত্ব নিতে তাকে অনুরোধ করেছেন পুলিশ চীফ ক্যাপ্টেন ইয়ান ফ্লেচার। 'এবং আমার ধারণা,' বলল সে, 'এ কাজের জন্যে যোগ্য লোক আমি।'

'কিন্তু আজ তো ফোর্থ জুলাই নয়,' ডুবয় বলল। 'মোটে এক তারিখ। এত আগেই এসে কামান দেগে শহরটাকে অস্থির করে তোলার মানে কি?'

স্যালুটের ভঙ্গিতে হাত তুলল জ্যাক। 'আমি দুঃখিত। লোকে যে এতটা ভয় পেয়ে যাবে ভাবতে পারিনি। কামানে গোলাও ভরিনি, বারুদ ভরে ফাটিয়ে কেবল টেস্ট করে দেখতে চেয়েছিলাম কতটা আওয়াজ হয়।'

পকেট থেকে একটা চিঠি বের করে দেখাল সার্জেন্ট। তাতে ফোর্থ জুলাইয়ের জন্যে কামান পরীক্ষা করার অনুমতি দেয়া আছে। নিচে ফোর্থ-অভ-জুলাই কমিটির পক্ষে সই করেছেন ইয়ান ফ্লেচার।

'হুঁ,' জ্যাকের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নিতে না পারায় হতাশ মনে হলো ডুবয়কে, 'জানতাম না। আমাকে কিছুই জানানো হয়নি এ ব্যাপারে। যাই হোক, আশা করি কতটা আওয়াজ হয় বুঝতে পেরেছেন?'

মাথা কাত করল জ্যাক। 'আরও বুঝেছি, লোকে গোলাবারুদের আওয়াজ সহ্য করতে পারে না।'

'আপনার মত তো আর গোলন্দাজ নয় ওরা। আশপাশের পাঁচ মাইলের মধ্যে সব লোকই নিশ্চয় ভয় পেতে আরম্ভ করেছে যুদ্ধ বেধে গেল মনে করে।'

লুককে নিয়ে চলে গেল ডুবয়। আস্তে আস্তে পাতলা হয়ে এল ভিড়। কয়েকজন লোকের সঙ্গে কথা বলছে জ্যাক। তাকে আর কামানটাকে ভাল করে দেখার জন্যে মঞ্চের আরও কাছে এগিয়ে গেল মুসা ও রবিন। পেছনে এগোল হ্যামার।

আগ্রহ হারিয়ে একে একে চলে গেল কৌতূহলী জনতাও, দাঁড়িয়ে রইল কেবল দুই গোয়েন্দা আর হ্যামার।

মঞ্চের আরও কাছে এগিয়ে গেল হ্যামার। গভীর আগ্রহ নিয়ে দেখছে কামানটা। 'এটা কি জিনিস? ডেমিকালভেরিন?'

'না,' ভুরু কোঁচকাল জ্যাক, 'পুরানো কামানের ব্যাপারে মনে হয় আগ্রহ আছে আপনার?'

'না,' বিনীত ভঙ্গিতে জবাব দিল হ্যামার, 'এই একটু খোঁজখবর রাখি আরকি। আর দু'চারটা বই পড়েছি কামানের ওপর।'

'ও,' বড় একটা ন্যাকড়া নিয়ে কামান মোছায় মন দিল জ্যাক।

গোয়েন্দাদের নিয়ে সরে এল হ্যামার। আচমকা বলল, 'যে কামানটা খুঁজছি আমি, সেটা খুঁজে বের করে দিতে পারলে পাঁচ হাজার ডলার দেব তোমাদের।'

হাঁ হয়ে গেল দুই গোয়েন্দা। বলে কি! মেলায় ব্যবহার করার জন্যে মরচে পড়া সাধারণ একটা কামান বের করে দিতে পারলে এত টাকা দেবে?

ওদের মনের কথা পড়তে পেরেই যেন হ্যামার বলল, 'আমি এক কথার মানুষ। ফালতু কথা বলি না। যা বলেছি তাই দেব।'

সে জানাল, ইতিমধ্যেই কামানটার জন্যে রকি বীচ চষে ফেলেছে সে। পায়নি। সুতরাং ওদের খুঁজতে হবে রকি বীচের লাগোয়া আশপাশের শহর আর গ্রামগুলোতে। মহাসড়কের ধারের গোল্ডেন গেট মোটেলে উঠেছে সে। যোগাযোগ করার প্রয়োজন হলে ওখানে যেতে পারে তিন গোয়েন্দা।

রবিন বলল, 'কিন্তু গোয়েন্দাগিরির জন্যে তো টাকা নিই না আমরা। টাকার বিনিময়ে কাজ করব কথা দিয়েছি আপনাকে শুনলে রাগ করবে কিশোর।'

বিস্ময় চাপা দিতে পারল না হ্যামার। 'টাকা ছাড়া গোয়েন্দাগিরি করো তোমরা?'

মাথা ঝাঁকাল রবিন। 'হ্যাঁ, এটা আমাদের পেশা নয়, শখ।'

'বেশ, তোমরা ধরে নাও শখের জন্যেই কাজটা করছ তোমরা। টাকা দেব কি দেব না সেটা আমার ব্যাপার। কোন কিছু উপহার দিলে নিশ্চয় না করতে পারবে না।'

দ্বিধায় পড়ে গেল রবিন আর মুসা দুজনেই।

হাসল হ্যামার। 'ঠিক আছে, কিশোরের সঙ্গে কথা বলে দেখো কাজটা করতে সে রাজি হয় কিনা।' মঞ্চের ওপর থেকে জ্যাক নেমে যাচ্ছে দেখে গোয়েন্দাদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে তাড়াতাড়ি তার সঙ্গে কথা বলতে ছুটল হ্যামার।

চত্বর পেরিয়ে এসে থানায় রওনা হলো দুই গোয়েন্দা। পানির নিচে ওদের ওপর যে হামলা হয়েছে, এটা রিপোর্ট করার জন্যে। অফিসেই আছেন ক্যাপ্টেন ইয়ান ফ্লেচার। তাঁর সঙ্গে দেখা করার অনুমতি চাইল ওরা। অনুমতি মিলল। ঢুকে পড়ল দুজনে।

সব কথা শোনার পর ক্যাপ্টেন বললেন, 'ব্যাপারটাকে সিরিয়াসই মনে হচ্ছে। ঠিক আছে, হারবার পেট্রলকে জানিয়ে দেব আমি লোকটাকে যাতে খুঁজে বের করে।'

তাঁকে ধন্যবাদ জানিয়ে থানা থেকে বেরোল দুজনে। বাড়ি রওনা হলো। ফুটপাথ ধরে হাঁটতে হাঁটতে রবিন বলল, 'হ্যামারকে কেমন লাগল তোমার?'

'ভালই তো,' জবাব দিল মুসা। 'তোমার কি মনে হয়?'

'পুরো ব্যাপারটাই যেন কেমন! একটা অতি সাধারণ কামানের জন্যে এত টাকা দিতে চাইল কেন?'

'হয়তো অ্যানটিক মূল্য অনেক বেশি কামানটার। অ্যানটিকের তো কোন ঠিকঠিকানা নেই, কোন কোনটার এত বেশি দাম ওঠে, শুনলে চমকে যেতে হয়।'

'কেসটা কি নেয়া উচিত?'

'ক্ষতি কি? তবে সব কিছুই কিশোরের ওপর নির্ভর করে। সে রাজি না হলে আমরা কিছু করতে পারব না। বাদ দিতে হবে কেসটা।'

তিন

'পাঁচ হাজার ডলার দেবে বলেছে!' নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটতে কাটতে বলল কিশোর। 'তাহলে তো রাজি না হয়ে উপায় নেই। কেসটা নিতেই হচ্ছে।'

দুপুরের পর হেডকোয়ার্টারে আলোচনায় বসেছে তিন গোয়েন্দা।

'তারমানে টাকার জন্যে কেসটা নিচ্ছ তুমি!' অবাক হয়ে গেল মুসা। 'অত্ত বড় মুখ করে হ্যামারকে বলে এলাম আমরা, টাকার কথা শুনলেই তুমি রাগ করবে, অথচ...'

'বলেছ ঠিকই করেছ। টাকা পাওয়ার জন্যে কেসটা নেব তা না, পাঁচ হাজার ডলার দেবে বলাতে কৌতূহল হচ্ছে। পুরানো একটা ডেমকালভেরিনের জন্যে এত টাকা দিতে চাইবে কেন?'

'প্রশ্নটা আমার মনেও জেগেছিল,' রবিন বলল।

'এক কাজ করো, হ্যামারকে ফোন করে জানিয়ে দাও, কেসটা আমরা নিচ্ছি।'

ফোন করা হলো গোল্ডেন গেট মোটেলে। হ্যামারকে পাওয়া গেল না। তার জন্যে একটা মেসেজ রেখে লাইন কেটে দিল রবিন। কিশোরের দিকে ফিরল। 'কামানটা পাব কি করে, বলো তো? পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দেব?'

'লাভ হবে না,' মাথা নাড়ল কিশোর। 'অত সহজ হলে হ্যামারই খুঁজে বের করে ফেলত। তবে যেহেতু কোন সূত্র নেই আমাদের হাতে, আপাতত পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিয়েই শুরু করতে হবে।'

'যদি কোন সাড়া না পাওয়া যায়?' মুসার প্রশ্ন।

'যাবে না, ধরেই নিচ্ছি। তবে যেতেও তো পারে। আরেকটা কথা ভাবছি।'

'কি?' আগ্রহে সামনে ঝুঁকল মুসা আর রবিন দুজনেই।

'মেরিচাচীর সাহায্য নেব নাকি?'

'খাইছে! বলো কি?' আঁতকে উঠল মুসা। 'রাশেদ আংকেল হলেও নাহয় এককথা ছিল। মেরিচাচী সাহায্য করবে আমাদের গোয়েন্দাগিরিতে?'

'করবে, গোয়েন্দাগিরিতে নয়, কামানগিরিতে।'

মুখ বিকৃত করে ফেলল মুসা, 'এই তো শুরু হলো ল্যাটিন ভাষা!'

রবিন বলল, 'পুরানো জিনিস বলে আগ্রহী হবেন ভাবছ?'

'না,' মাথা নাড়ল কিশোর, 'একটা খবর বোধহয় তোমরা জানো না। এই কয়েকদিন আগে রকি বীচ হিসটরিকাল সোসাইটিতে যোগ দিয়েছেন চাচী। শোনা যাচ্ছে, সোসাইটির প্রেসিডেন্ট নির্বাচনেও দাঁড় করানো হবে তাঁকে। অবাক হচ্ছ?'

'না, এতে অবাক হওয়ার কি আছে। পুরানো মালের ব্যবসা করেন, পুরানো জিনিসে এত আগ্রহ, তিনি প্রেসিডেন্ট হবেন না তো কে হবেন?'

কানের গোড়া চুলকাল মুসা, 'কিন্তু তিনি আমাদের সাহায্য করতে যদি রাজি না হন?'

'সে ভার আমার। চলো যাই।'

রান্নাঘরে কাজে ব্যস্ত মেরিচাচী। এ সময় ওদের দেখে অবাক হলেন তিনি। মুসার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'কি ব্যাপার, খিদে পেয়েছে নাকি?'

'না, খিদে নয়, তবে…' কথা হারিয়ে ফেলল মুসা। কামানের কথা কিভাবে শুরু করবে বুঝতে পারছে না।

'তবে কি? ফ্রুট কেকের গন্ধ পেয়েছ? দাঁড়াও, একটু ঠাণ্ডা হয়ে নিক, কেটে দিচ্ছি।'

'না, কেকের জন্যে নয়…'

'তাহলে কিসের জন্যে? অত হেঁয়ালি করছ কেন?'

জবাব দিতে পারল না মুসা। সাহায্যের আশায় তাকাল কিশোরের দিকে।

হাসল কিশোর। 'ও তোমাকে অভিনন্দন জানাতে এসেছে, চাচী।'

'দেখ্ কিশোর, অত হেঁয়ালি ভাল লাগে না আমার। যা বলার জলদি বল, কাজ আছে।'

'সত্যি বলছি, চাচী, মুসা আর রবিন দুজনেই অভিনন্দন জানাতে এসেছে। তুমি প্রেসিডেন্ট ইলেকশনে দাঁড়াচ্ছ তো, সেজন্যে…'

'আমি প্রেসিডেন্ট…' হঠাৎ মনে পড়ল চাচীর, হেসে ফেললেন, 'ও, তাই বল। হিসটরিকাল সোসাইটি। এত আগেই অভিনন্দন কিসের? আগে হয়েনি, তারপর…'

'তুমি যখন দাঁড়াতে রাজি হয়েছ, আর কারও সাধ্য আছে নাকি পদটা কেড়ে নেয়ার। ধরে নিতে পারি, হয়ে গেছ।'

হাসলেন চাচী। সরাসরি তাকালেন কিশোরের দিকে, 'কি ব্যাপার, অত তেল মাখছিস কেন?'

'ওমা, তেল আবার মাখলাম কখন!'

'ওসব ভানভণিতা করিসনে আমার সঙ্গে, সব বুঝি। আসল কথাটা বলে ফেল, আমাকে দিয়ে কোন্ কাজটা উদ্ধার করতে চাস…'

'এই জন্যেই তোমাকে এত ভালবাসি আমি, চাচী, বলার আগেই অনেক কিছু বুঝে ফেলো। একটা পুরানো কামান খুঁজে বের করার ব্যাপারে সাহায্য করতে হবে আমাদের।'

দীর্ঘ একটা মুহূর্ত কিশোরের দিকে তাকিয়ে রইলেন মেরিচাচী। তাক থেকে তুলে নিলেন একটা লম্বা ছুরি। চেয়ারে বসে টেবিলে রাখা কেকের ট্রেটা টেনে নিলেন। কেক কাটতে কাটতে তিন গোয়েন্দার মুখে কামানটার কথা সব শুনলেন। কাটা শেষ করে ছুরি রেখে কাপড় দিয়ে হাত মুছে বললেন, 'একটা কামানের খবর

আমি জানি।'

'কোথায় আছে ওটা?' প্রায় চিৎকার করে উঠল কিশোর।

'ইয়েলো লীফ ভিলেজের এক মিউজিয়ামের পেছনের আঙিনায়।'

'কি জাতের কামান?'

'জাতটা জানি না। স্প্যানিশ হতে পারে, শিওর না আমি। তবে সিভিল ওঅরের সময় তৈরি কিংবা ব্যবহার হয়নি ওটা, আরও পুরানো।'

লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল কিশোর। দুই বন্ধুর দিকে তাকাল। 'চলো, এখনি যাব।'

'আরে দাঁড়া দাঁড়া,' বাধা দিলেন মেরিচাচী, 'অত তাড়াহুড়ো কিসের। মুসাকে কেকের অন্তত একটা টুকরো খেয়ে যাওয়ার সুযোগ দে।'

একটা টুকরো নয়, প্রায় আধখানা কেক সাবাড় করে দেয়ার আগে চেয়ার থেকে উঠল না মুসা। ভাল লাগায় কিশোর আর রবিনও দুই টুকরো করে খেল। মুসা যুক্তি দেখাল, কামানের মত ভারি জিনিস খুঁজতে যাওয়ার অনেক পরিশ্রম, সুতরাং ফ্রিজে রাখা খানিকটা দুধও খেয়ে নেয়া দরকার, তাতে গায়ে শক্তি পাবে।

হাসিমুখে দুধের জগ বের করে এনে দিলেন মেরিচাচী।

পুরো জগটাই প্রায় মেরে দিল মুসা। হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে ডলে ঠোঁট মুছে, ঘড়াৎ করে ঢেকুর তুলে ধীরেসুস্থে উঠে দাঁড়াল। 'হ্যাঁ, চলো এবার, যাই দেখি, কোথায় লুকিয়ে আছে পুরানো ডেভিল।'

'ডেভিল নয়,' শুধরে দিল রবিন, 'ডেমিকালভেরিন।'

'ওই হলো, কামানও একধরনের ডেভিলই। খুন করার জন্যে বানানো হয় যে সব অস্ত্র, সেগুলো শয়তান ছাড়া আর কি?'

চার

ইয়ার্ডের গেট দিয়ে বেরিয়ে এল মুসার পুরানো জেলপি। ভটভট করে বিকট শব্দ তুলে পথচারীকে সচকিত করে ছুটে চলল।

পথে একটা পত্রিকার অফিস দেখে থামতে বলল কিশোর। সে আর রবিন মিলে একটা বিজ্ঞাপন তৈরি করে এনেছে। সেটা দিয়ে যাবে।

বিজ্ঞাপন প্রকাশের ব্যবস্থা করার পর ইয়েলো লীফ গাঁয়ে রওনা হলো ওরা।

মিউজিয়ামটা খুঁজে বের করতে মোটেও বেগ পেতে হলো না। পাতাবাহারের বেড়ার পাশে গাড়ি রেখে গেটের দিকে হেঁটে এগোল তিন গোয়েন্দা। ভেতরে ঢুকে বাড়ির পাশ ঘুরে চলে এল পেছনের আঙিনায়। ছড়ানো লন। মাঝখানে সিমেন্টের বেদি বানিয়ে তার ওপর রাখা হয়েছে লম্বা নলওয়ালা পুরানো একটা কামান।

কামানটার দিকে এগিয়ে গেল রবিন। বিবরণ লেখা রয়েছে গায়ে লাগানো একটা ব্রোঞ্জের পাতে। স্প্যানিশ কামান। ছয় পাউণ্ড ওজনের গোলা ছোঁড়া হত এটা থেকে।

কিশোর আর মুসাও এসে দাঁড়াল ওর পাশে।

বিবরণ পড়ে কিশোর বলল, 'প্যাসাভলেন্টি। তার মানে খুব দ্রুত গোলা ছুঁড়তে পারে। স্পেনের টলেডোতে তৈরি। সেরবাটানাও বলে অনেকে। শব্দটা এসেছে সেরিবাস থেকে। সেরিবাস কি জানো তো? ভয়ঙ্কর পৌরাণিক কুকুর।'

'এই কামানটাই খুঁজছে নাকি হ্যামার?' মুসার প্রশ্ন।

'না,' জবাবটা দিল রবিন, 'ও খুঁজছে ডেমিকালভেরিন। তা ছাড়া ও যেটা খুঁজছে সেটা থেকে আট পাউণ্ড ওজনের গোলা ছোঁড়া হত।'

'তাহলে আর দাঁড়িয়ে থেকে কি হবে,' নিরাশ ভঙ্গিতে বলল মুসা, 'চলো, যাই।'

লন ধরে এগোতে গিয়ে থমকে দাঁড়াল তিন গোয়েন্দা। পাশের গেট দিয়ে লম্বা এক লোক ঢুকছে। মাথায় ক্যাপ নেই লোকটার। গায়ে সুতির কালো জ্যাকেট, সাধারণত মোটর সাইকেল আরোহীরা পরে এরকম। কোনদিকে না তাকিয়ে সোজা গিয়ে দাঁড়াল কামানটার কাছে।

'কি চায়?' ফিসফিস করে প্রশ্ন করল রবিন।

'চলো, ওকেই গিয়ে জিজ্ঞেস করি,' বলল কিশোর।

কামানের কাছে ঝুঁকে দাঁড়াল লোকটা। ব্রোঞ্জের পাতে লেখা বিবরণের দিকে চোখ।

'এই লোকও ডেভিল খুঁজতে এল নাকি?' তাকিয়ে আছে মুসা। 'হঠাৎ করে কামানের জন্যে অমন পাগল হয়ে উঠল কেন লোকে?'

আবার কামানটার কাছে এসে দাঁড়াল তিন গোয়েন্দা। ওদের দিকে তাকাল লোকটা।

'কামান খুঁজছেন?' নিরীহ স্বরে প্রশ্ন করল কিশোর।

চমকে গেল লোকটা। 'তুমি জানলে কি করে?'

নিশ্চিত হয়ে গেল কিশোর, কামানই খুঁজছে। 'এটা নয় নিশ্চয়? ডেমিকালভেরিনটা খুঁজছেন তো?'

কোন জবাব না দিয়ে ঘুরে দাঁড়াল লোকটা। হনহন করে হাঁটতে আরম্ভ করল গেটের দিকে।

'শুনুন, শুনুন,' বলে ডাকল কিশোর।

গতি আরও বাড়িয়ে দিল লোকটা।

অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল তিন গোয়েন্দা। এমন করে পালাচ্ছে কেন লোকটা? ডেমিকালভেরিনের ব্যাপারে জানে নাকি কিছু?

সবার আগে দৌড় দিল মুসা। গেটের বাইরে এসে দেখল একটা মোটর সাইকেল স্টার্ট দিচ্ছে লোকটা।

রবিন আর কিশোরও বেরিয়ে এসেছে। লোকটাকে আটকানোর জন্যে রাস্তায় পাশাপাশি দাঁড়িয়ে গেল তিনজনে। কিন্তু থামার বিন্দুমাত্র লক্ষণ দেখাল না লোকটা। গতি না কমিয়ে ওদের দিকে ছুটে এল। ভঙ্গি দেখে মনে হলো না সরলে ওদের গায়ের ওপরই তুলে দেবে মোটর সাইকেল।

তিনজন তিনদিকে ঝাঁপ দিয়ে পড়ল। মুসা পড়ল পাতাবাহারের বেড়ার ওপর। অল্পের জন্যে তার পায়ে লাগল না মোটর সাইকেলের চাকা।

শাঁ করে পাশ দিয়ে চলে গেল মোটর সাইকেলটা।

উঠে হাত-পায়ের ধুলো ঝাড়তে লাগল তিন গোয়েন্দা।

ঝাঁঝাল কণ্ঠে রবিন বলল, 'গায়ে তুলে দিচ্ছিল আরেকটু হলে! অমন করল কেন? চোর নাকি?'

প্যান্টের দিকে চোখ পড়তে আঁতকে উঠল মুসা, 'খাইছে!' চোখা ডালে লেগে অনেকখানি চিরে গেছে কাপড়। 'গেল আমার নতুন প্যান্টটা!'

মোটর সাইকেলটা যেদিকে গেছে সেদিকে তাকিয়ে চিন্তিত ভঙ্গিতে জিজ্ঞেস করল কিশোর, 'নম্বরটা রাখতে পেরেছ?'

'না,' মাথা নাড়ল রবিন।

মুসার দিকে তাকাল কিশোর।

'রাখব কখন?' মুসা বলল, 'পায়ের হাড্ডি বাঁচাব না প্লেটের দিকে তাকাব? তবে পেট্রোল ট্যাংকের গায়ে লেখা একটা অক্ষর চোখে পড়েছে, K. মোটর সাইকেলটা আমেরিকান নয়, অন্য কোন দেশে তৈরি।'

'হুঁ! K দিয়ে কি বোঝায় বলো তো? কোন্ মোটর সাইকেলের নাম K দিয়ে শুরু হয়?'

'জাপানী হলে বলতাম কাওয়াসাকি। কিন্তু এটা জাপানী মোটর সাইকেল নয়, সম্ভবত কেসেলরিং, জার্মানির তৈরি।'

'এ জিনিস আর দেখিনি আমি। তারমানে খুব একটা জনপ্রিয় নয়। খুঁজলে হয়তো বের করা যাবে এ শহরে কার কেসেলরিং মোটর সাইকেল আছে।'

'জিনিসটা নতুন,' মুসা বলল, 'কিনেছে যে বেশিদিন হয়নি। রকি বীচের মোটর সাইকেল বিক্রেতাদের কাছে খোঁজ নেয়া যায়।'

'তাহলে ওদের কাছেই চলো।'

রকি বীচে ফিরে চলল ওরা। শহরে ঢুকে প্রথমে যে দোকানটা পড়ল, তার সামনেই গাড়ি রাখল মুসা। দোকানটা বেশ বড়, অনেক মোটর সাইকেল দেখা যাচ্ছে শো-রুমে।

দোকানে একজন মাত্র লোক, মালিক নিজে। এগিয়ে এল সে। কিশোরের প্রশ্নের জবাবে বলল, 'অতটা জনপ্রিয় হতে পারেনি এখানে। তবে ইদানীং চোখে পড়ছে দু'একটা।'

'আপনি বিক্রি করেন?'

'না।'

'কারা করে?'

'রকি বীচে কেউ করে না। যদ্দূর জানি, এ শহরে কারও নেইও ও জিনিস।'

'কার দোকানে আছে, বলতে পারেন?'

'নাহ্। হফম্যানদের দোকানে খোঁজ নিয়ে দেখতে পারো।'

'ওরা কি কেসেলরিং বিক্রি করেছে কখনও?'

'তাও জানি না। হফম্যান যেহেতু জার্মান, আর কোম্পানিটাও জার্মান কোম্পানি, ওদের কাছে থাকতে পারে। স্টকে না থাকলেও কাউকে আনিয়ে দিয়েছে কিনা বলতে পারবে।'

'ওদের দোকানটা কোথায়?'

'লণ্ডনে।'

দোকানিকে ধন্যবাদ দিয়ে বেরিয়ে এল তিন গোয়েন্দা।

সন্ধ্যা হয়ে এসেছে। লণ্ডন ছোট্ট শহর, রকি বীচ থেকে বেশ অনেকটা দূরে। সেদিন আর যাবার সময় নেই।

কিশোরের দিকে তাকাল মুসা, 'কাল সকালে গিয়ে লণ্ডনে খোঁজ নেয়া যাবে, কি বলো?'

মাথা ঝাঁকাল কিশোর।

পাঁচ

পরদিন সকালে পত্রিকায় দেখছে কিশোর, বিজ্ঞাপনটা ছেপেছে কিনা, এই সময় তার ভটভটি নিয়ে ইয়ার্ডে হাজির হলো মুসা। কিশোর তৈরি হয়ে ওঅর্কশপে বসে আছে। রবিন আসেনি।

'এত দেরি করছে কেন?' বার বার গেটের দিকে তাকাচ্ছে মুসা। 'বাড়িতে আটকে দিল নাকি?'

'মনে হয় না। তাহলে ফোন করে জানাত।' কাগজটা মুসার দিকে ঠেলে দিল কিশোর, 'এই যে, আমাদের বিজ্ঞাপনটা।'

আরও পনেরো মিনিট পর এল রবিন। সাইকেল নিয়ে এসেছে। সেটা ওঅর্কশপের বেড়ায় ঠেস দিয়ে রেখে ভেতরে ঢুকল।

'এত দেরি?' মুসা জিজ্ঞেস করল।

'লাইব্রেরিতে গিয়েছিলাম।' সাইকেলের ক্যারিয়ার থেকে একটা বই টেনে বের করল রবিন। কিশোরের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বলল, 'এটা আনতে। দেখো, পছন্দ হবে।'

হাতে নিল কিশোর। মলাটের টাইটেল দেখেই বলে উঠল, 'আরি, কামানের ওপর লেখা! একদম ঠিক জিনিসটা এনেছ। কালকেই বলতাম তোমাকে, ভুলে গিয়েছিলাম।'

'রাতে মনে হলো আমার। সকালে নাস্তা সেরেই লাইব্রেরিতে ছুটলাম।'

কামানের চেয়ে মোটর সাইকেলে বেশি আগ্রহী মুসা। কিশোরের দিকে তাকাল, 'আরও দেরি করব?'

'না, চলো।'

মুসার জেলপি নিয়েই লণ্ডন রওনা হলো ওরা। মুসা গাড়ি চালাচ্ছে। পেছনে বসেছে রবিন আর কিশোর। কোলের ওপর বইটা মেলে নিয়েছে রবিন। একটা কামানের ছবি দেখা যাচ্ছে। নিচের লেখার ওপর আঙুল রেখে বলল সে, 'কালভেরিন শব্দটা এসেছে ল্যাটিন কোলোব্রা থেকে। কোলোব্রা মানে হলো সাপ...'

'তারমানে আমি ঠিকই বলেছিলাম, ডেভিল,' বলে উঠল মুসা। 'সাপ হলো

ডেভিল, আস্ত শয়তান।'

কিশোর জিজ্ঞেস করল রবিনকে, 'আর কি লিখেছে?'

'এক সময় এ জিনিসকে খুব মূল্য দেয়া হত এর গোলা নিক্ষেপের ক্ষমতার জন্যে। অনেক দূরে আর লক্ষ্যবস্তুর ওপর নিখুঁত ভাবে গোলা ফেলা যেত এ জাতের কামান দিয়ে। অনেক পুরু করে তৈরি, লম্বা নল আর অনেক বেশি বারুদ ঠাসা যেত। ডাঙায় ব্যবহারের জন্যে সেসময় যত কামান আবিষ্কার হয়েছিল, তার মধ্যে এই কামান সেরা।'

'ডাঙায় ব্যবহারের জন্যে!' অবাক হলো কিশোর। 'পানিতে নয়? তাহলে জলদস্যুর জাহাজে ওই কামান রেখে দেখিয়ে কি হবে?'

হাসল রবিন। 'কামানের ব্যাপারে আমাদের মতই বিশেষজ্ঞ আরকি হ্যামার, কোনটা ডাঙার আর কোনটা পানির, জানেই না। ভেবেছে, পুরানো কামান একটা হলেই হলো।'

'তাহলে যে কোন একটা কামান নিয়ে গিয়ে জাহাজে তুলে রাখলেই হয়, লোকে তো আর অতশত বুঝতে পারবে না, কোনটা সেনাবাহিনী ব্যবহার করত আর কোনটা জলদস্যুরা। পুরানো কামানের অভাব নেই। অ্যানটিক বিক্রেতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করে সহজেই কামান জোগাড় করতে পারত সে। সেই টাম্পা থেকে এতদূরে রকি বীচে ছুটে এসেছে কেন বিশেষ একটা কামানের জন্যে?'

জবাব দিতে পারল না রবিন। পথের ধারে একটা সাইনবোর্ড চোখে পড়ল ওর। মূল রাস্তা থেকে আরেকটা সরু পথ চলে গেছে, বোর্ডটা বসানো হয়েছে ওই রাস্তার মুখের কাছে একপাশে। তাতে লেখা: গোল্ডেন গেট মোটেল। নিচে তীর চিহ্ন দিয়ে দেখানো হয়েছে কোন দিকে যেতে হবে।

সেদিকে তাকিয়ে থেকে রবিন বলল, 'এই মোটেলের ঠিকানাই দিয়েছে হ্যামার। একবার দেখা করে গেলে কেমন হয়?'

'মন্দ হয় না,' কিশোর বলল। 'মুসা, যাও তো ওদিকে।'

মোটেলের আঙিনায় ঢুকে কারপার্কে গাড়ি রেখে বসে রইল মুসা। কিশোর আর রবিন নেমে গেল। ডেস্কে খোঁজ নিয়ে জানতে পারল হ্যামার থাকে ১১৮ নম্বর রুমে।

লম্বা একটা বারান্দা ধরে এগোল দুই গোয়েন্দা। একপাশে সারি সারি দরজা, নম্বর লাগানো।

'ওই যে ওটা,' একটা নম্বর দেখে বলল রবিন। দরজার সামনে দাঁড়িয়ে টোকা দিল।

সাড়া নেই।

জোরে থাবা দিল সে।

তাও সাড়া নেই।

আরও জোরে থাবা দিতে লাগল।

ডোরনবের নিচে পড়ে থাকা দলামোচড়া পাকানো একটা কাগজ দৃষ্টি আকর্ষণ করল কিশোরের। তুলে নিল। কাগজটা খুলেই স্থির হয়ে গেল হাত। তাকিয়ে রইল কাগজের দিকে।

'কি ব্যাপার?' কাগজটার দিকে তাকাল রবিন। তারও চোখ আটকে গেল কাগজে লেখা একটামাত্র লাইন:

হ্যামার, সময় থাকতে কেটে পড়ো।

'তার কোন শত্রু আছে বলেছিল?' জিজ্ঞেস করল কিশোর।

'না,' মাথা নাড়ল রবিন, 'তেমন কিছু তো বলেনি।'

'তবে শত্রু আছে, বোঝা যাচ্ছে।'

'ওই লোকটাও ডেমিকালভেরিন খুঁজছে না তো?'

'কি করে বলব? খুঁজতে পারে।'

'ওর ভয়েই হয়তো পালিয়েছে হ্যামার।'

'হুঁ,' চিন্তিত ভঙ্গিতে আরেকবার কাগজটার দিকে তাকিয়ে ভাঁজ করে পকেটে রেখে দিল কিশোর। 'চলো, যেখানে যাচ্ছিলাম যাই। ফেরার পথে আবার দেখে যাব এল কিনা।'

পার্কিং লটে ফিরে এল দুজনে। গাড়িতে উঠল কিশোর। রবিন উঠতে যাবে, এই সময় তার চোখে পড়ল কয়েকটা গাছের আড়ালে মোটর সাইকেলে বসে আছে একজন লোক। ওদের দিকেই নজর লোকটার। মোটর সাইকেলটা পরিচিত লাগল। গাড়িতে উঠে বলল, 'দেখো, মনে হয় সেই লোকটা!'

'খাইছে!' দেখেই বলে উঠল মুসা, 'কেসেলরিং মোটর সাইকেল!'

'যাও ওর কাছে, জিজ্ঞেস করব···'

কিশোরের কথা শেষ হওয়ার আগেই স্টার্ট দিয়ে ফেলল মুসা। রওনা হলো সেদিকে।

ওদের উদ্দেশ্য টের পেয়েই যেন মোটর সাইকেলে স্টার্ট দিল লোকটা। শাঁ করে বেরিয়ে গেল গাছপালার আড়াল থেকে।

'আমাদের ওপরই নজর রাখছিল, কোন সন্দেহ নেই!' চিৎকার করে বলল রবিন। 'মুসা, ধরো ওকে!'

খুবই শক্তিশালী ইঞ্জিন মোটর সাইকেলটার। পুরানো জেলপি গাড়ি নিয়ে কিছুতেই কুলিয়ে উঠতে পারল না মুসা। চোখের আড়ালে চলে গেল কেসেলরিং। গতি কমাল না মুসা। আশেপাশে আর কোন শাখাপথ চোখে পড়ছে না, তারমানে সোজা গেছে মোটর সাইকেলটা।

কয়েক মাইল যাওয়ার পর দেখা গেল একপাশে পাহাড়ের ঢালের পথ বেয়ে নেমে যাচ্ছে কেসেলরিং। রাস্তাটার কাছে এসে একবিন্দু গতি না কমিয়ে শাঁই করে গাড়ির নাক ঘুরিয়ে দিল মুসা। নেমে পড়ল ঢালের পথে।

গাছপালার আড়ালে আবার অদৃশ্য হয়ে গেল মোটর সাইকেল।

ছুটতে ছুটতে ঢালের নিচে নেমে এল মুসার জেলপি। সামনে ছড়ানো প্রান্তরের মাঝখান দিয়ে চলে গেছে পথ। কয়েক মাইল দূরের পাহাড়ী অঞ্চলের দিকে। মোটর সাইকেলটা গায়েব। এত তাড়াতাড়ি ওই পথ পেরিয়ে পাহাড়ে পৌঁছানো অসম্ভব।

কিশোর বলল, 'পেছনেই কোথাও আছে। আমাদের ফাঁকি দিয়ে লুকিয়ে পড়েছে।'

ইঞ্জিন বন্ধ করে দিয়ে কান পাতল মুসা। নীরব বন। মাঝে মাঝে দু'একটা

গায়ক পাখির টুইই-টুইই ভেসে আসছে। আর কোন শব্দ নেই

'থেমে পড়েছে ও,' আবার বলল কিশোর। 'ফিরে চলো।'

আস্তে আস্তে গাড়ি চালাতে লাগল মুসা। পথের দুপাশে কড়া নজর তিনজনের। রাস্তাটা মুসার চোখেই প্রথম পড়ল। একপাশে বনের ভেতর ঢুকে গেছে একটা সরু কাঁচা রাস্তা।

কিশোর বলল, 'ঢোকো ওটা দিয়ে। দেখব কি আছে।'

কাঁচা রাস্তায় গাড়ি নামাল মুসা। এগিয়ে চলল সামনে। দুই পাশে গাছপালা আর বড় বড় ঝোপ। তার কোনটাতে যদি লুকিয়ে বসে থাকে লোকটা, সহজে দেখা যাবে না। রাস্তায় সাংঘাতিক ধুলো। এত বেশি উড়ছে, গাড়ির ভেতরে ঢুকে দম আটকে দিতে চাইছে গোয়েন্দাদের, বাধ্য হয়ে শেষে জানালার কাঁচ তুলে দিতে হলো।

বেশি লম্বা না রাস্তাটা। সামনে শেষ হয়ে আসছে দেখতে পাচ্ছে মুসা। আর সামান্য এগোতেই চোখে পড়ল কেবিনটা। পথের শেষ মাথায় পাইন গাছের জঙ্গলের মধ্যে একটা ঘর তৈরি করে রেখেছে কে যেন। চারপাশে জঙ্গল এত ঘন, গাড়ি তো দূরের কথা, মোটর সাইকেলও ঢুকতে পারবে না। লোকটা এদিকে এসে থাকলে, ওই ঘরের কাছেই কোথাও আছে। যাওয়ার আর কোন জায়গা নেই।

সতর্ক নজর রেখে সামনে এগিয়ে চলল মুসা।

ছয়

আরেকটু এগোতে কেবিনের সামনের অংশ দেখা গেল। কেসেলরিং মোটর সাইকেলটা দাঁড় করানো দরজার সামনে। কিশোরকে জানাল মুসা। গাড়ি থামাতে বলল কিশোর।

গাড়ি থেকে নেমে পা টিপে টিপে কেবিনের দিকে এগোল তিন গোয়েন্দা।

ঘরের কাছে গিয়ে ফিসফিস করে বলল কিশোর, 'মুসা, তুমি পেছনে চলে যাও। রবিন, তুমি যাও ডানে। নজর রাখো, কোনওদিক দিয়ে বেরিয়ে পালায় কিনা লোকটা।'

দুজন দুদিকে চলে গেল। ঘরের সামনে এসে দাঁড়াল কিশোর। দরজায় টোকা দিল।

সাড়া নেই।

থাবা দিতে গিয়ে ঠেলা লাগতেই খুলে গেল পাল্লা। ভেতরে কোন লোক আছে বলে মনে হলো না।

বার কয়েক ডাকাডাকি করে জবাব না পেয়ে দুই সহকারীকে ডাকল কিশোর, 'মুসা, রবিন, চলে এসো। কেউ নেই।'

ওরা এসে জানাল কাউকে সটকে পড়তে দেখেনি।

'আমরা আসার আগেই কেটে পড়েছে,' রবিন বলল।

'তবে আবার আসবে,' বলল কিশোর। 'মোটর সাইকেলটা নিতে।' কণ্ঠস্বর

খাদে নামাল, 'এক কাজ করতে হবে চলে যাওয়ার ভান করব আমরা লুকিয়ে লুকিয়ে আবার ফিরে আসব।'

'রাস্তায় যদি গাড়িটা আছে দেখে?' মুসার প্রশ্ন

'ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে রেখে আসতে হবে তারপরেও যদি দেখে ফেলে করার কিছু নেই'

গাড়িতে ফিরে এল ওরা। পাঁচশো গজ মত যাওয়ার পর একটা ঝোপের ভেতর গাড়ি ঢুকিয়ে দিল মুসা। গাড়ির অর্ধেকটা শরীর ঢাকা পড়ে গেল ডালপাতার আড়ালে। বাকিটুকু ঢাকার উপায় নেই ওটাকে ওই অবস্থায়ই রেখে, বনে ঢুকে পড়ে কেবিনের দিকে এগোল ওরা

কেবিনটা চোখে পড়ার পর ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে বসে নজর রাখতে লাগল।

পনেরো মিনিট কাটল। তিরিশ

হঠাৎ মট করে একটা শুকনো ডাল ভাঙার শব্দ হলো। নিশ্চয় জুতোর নিচে পড়েছে। নীরবতার মধ্যে ওই শব্দই অনেক বেশি জোরাল লাগল। নড়েচড়ে বসল ওরা। লোকটাকে দেখামাত্র তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে তৈরি।

এগিয়ে আসছে পায়ের শব্দ।

গাছের আড়াল থেকে বেরিয়ে এল লোকটা।

'খাইছে!' কণ্ঠস্বর চেপে রাখতে পারল না মুসা। 'এ তো হ্যামার! ও এখানে কি করছে?'

উঠে দাঁড়াল রবিন, 'চলো, জিজ্ঞেস করি।'

কিশোর বাধা দেয়ার আগেই বেরিয়ে গেল দুজনে। সে আর বসে থেকে কি করবে, পিছে পিছে চলল।

হ্যামারও অবাক হলো ওদের দেখে। 'তোমরা?'

'একটা লোকের পিছু নিয়ে এসেছি···'

'কে?'

'চিনি না।'

'আশ্চর্য!'

'কিন্তু আপনি এখানে কেন?'

প্রশ্নের জবাব দিল না হ্যামার। 'লোকটার পিছু নিলে কেন?'

মোটর সাইকেলটা দেখাল রবিন, 'ওই জিনিসটা আমাদের লক্ষ্য ওটার মালিকের সঙ্গে কথা বলা দরকার।'

'কে ওই লোক?'

'বললামই তো, চিনি না। এবার বলুন, আপনি কেন এসেছেন?'

কিশোরের দিকে তাকিয়ে রইল হ্যামার।

পরিচয় করিয়ে দিল রবিন, 'ও-ই কিশোর পাশা···'

'দেখেই বুঝেছি,' হাত বাড়িয়ে দিল হ্যামার তারপর জবাব দিল রবিনের প্রশ্নের, 'আমি এসেছি কামানটা খুঁজতে। একটা সূত্র পেয়েছি, তাতে মনে হলো এদিকেই কোনখানে মাটির নিচে পোতা আছে ওটা।'

পরস্পরের দিকে তাকাল রবিন আর কিশোর বোঝা গেল, হ্যামারের কথা বিশ্বাস করেনি ওরা কামান খুঁজতে এসেছে, কিন্তু মাটি খোঁড়ার কোন যন্ত্রপাতি নেই কেন সঙ্গে?

'কি সূত্র পেলেন?' জানতে চাইল কিশোর।

'সেটা তোমাদের বলা যাবে না।'

এক মুহূর্ত চুপ করে রইল কিশোর 'আসার আগে আপনার মোটেলে গিয়েছিলাম, কামানটার ব্যাপারে আলোচনা করতে আপনাকে পেলাম না। দরজার নিচে পড়ে থাকতে দেখলাম একটা নোট আপনাকে হুমকি দিয়ে লিখেছে।'

গম্ভীর হয়ে গেল হ্যামার 'হুমকি দিয়ে?'

নোটটা দেখাল কিশোর।

হেসে ফেলল হ্যামার, 'নিশ্চয় ওই বাচ্চাগুলোর কাজ মোটেলে কয়েকটা ছেলেমেয়ে উঠেছে চোর-ডাকাত খেলছে বোর্ডারদের সঙ্গে ' ঘড়ি দেখল সে। 'আমাকে যেতে হচ্ছে।'

'কামান খুঁজবেন না?' না জিজ্ঞেস করে পারল না মুসা।

'না এইমাত্র মনে পড়ল, আরেকটা জরুরী কাজ আছে। মোটেলে যাব।'

তাড়াহুড়ো করে চলে গেল হ্যামার।

সেদিকে তাকিয়ে বলল রবিন, 'কিশোর, ওর কথা বিশ্বাস করেছ?'

'না। মোটেলে একটা ছেলেমেয়েকেও চোখে পড়েনি। ওর হাসিটাও ছিল মেকি। চোখের তারায় রাগ দেখেছি আমি।'

কিশোরের দিকে তাকাল মুসা, 'দেখব নাকি কোথায় যায়?'

'যাও, দেখো। আমি আর রবিন আছি এখানে। মোটর সাইকেল পাহারা দিই। হ্যাঁ, এক কাজ কোরো, সুযোগ পেলে থানায় একটা ফোন করে ক্যাপ্টেনকে জানিয়ে দিয়ো, মোটর সাইকেলটা পাওয়া গেছে।'

গাছের আড়ালে আড়ালে দৌড়ে চলল মুসা। দেখতে পেল হ্যামারকে। গটগট করে এগিয়ে চলেছে লোকটা। কিছুদূর গিয়ে পথের পাশে রাখা একটা গাড়িতে চড়ল।

আবার দৌড়ে নিজের গাড়ির কাছে ফিরে এল মুসা। হ্যামারের পিছু নেয়া খুব সহজ। এত বেশি ধুলো উড়ছে, ওকে দেখতে পাবে না হ্যামার। আরেকটা সুবিধে, সামনের গাড়িটা কোথায় আছে বুঝতে পারবে মুসা।

বড় রাস্তায় উঠে বেশ খানিকটা দূরত্ব রেখে ওর পিছে পিছে চলল মুসা। কিন্তু খানিক পরেই হতাশ হলো দেখে, সোজা মোটেলের দিকেই যাচ্ছে হ্যামার। শেষে ওকে পুরোপুরি হতাশ করে মোটেলে ঢুকে গেল লোকটা।

কয়েক মিনিট অপেক্ষা করল মুসা। বেরোল না আর হ্যামার।

গাড়ি থেকে নেমে গিয়ে একটা ফোন বুদে ঢুকল মুসা। অফিসেই পাওয়া গেল ক্যাপ্টেন ইয়ান ফ্লেচারকে মোটর সাইকেলটার কথা জানাল তাঁকে।

গাড়িতে বসে হ্যামারের জন্যে আরও কয়েক মিনিট অপেক্ষা করল মুসা। বেরোল না লোকটা। এখন আর বেরোবে বলে মনে হয় না। আবার বনের

ভেতরের কেবিনের উদ্দেশে রওনা হলো মুসা।

কাঁচা রাস্তায় পৌঁছে গাড়িটা আগে যেখানে লুকিয়েছিল সেখানে রেখে হেঁটে ফিরে এল কেবিনের কাছে। কিশোর বা রবিন, কাউকে চোখে পড়ল না। কিছু ঘটল নাকি? নিশ্চিত হওয়ার জন্যে পাখির মত করে শিস দিল। এটা ওদের সঙ্কেত। কিশোর আর রবিন কাছাকাছি থাকলে জবাব দেবে।

জবাব দিল না, ঝোপের ভেতর থেকে নিজেরাই বেরিয়ে এল ওরা।

'আর কিছু ঘটেছে?' জিজ্ঞেস করল মুসা।

মাথা নাড়ল রবিন. 'না। আসেনি লোকটা।'

কিশোর জানতে চাইল, 'তোমার খবর কি? হ্যামার কোথায় গেছে?'

সব জানাল মুসা।

হ্যামারের রহস্যময় আচরণে অবাক হয়েছে তিনজনেই. কেন এমন করল লোকটা কোন অর্থ খুঁজে পেল না।

বিশ মিনিট পর মোটর সাইকেলের ইঞ্জিনের শব্দ শোনা গেল। সাদা পোশাকে এসে হাজির হলো দুজন পুলিশ অফিসার। তাদের একজন মরিস ডুবয়। কিশোরদের মুখে সব কথা শুনে বলল, মোটর সাইকেলটার পাহারায় থাকবে ওরা। দেখবে, লোকটা ফেরে কিনা। কোন অসুবিধে না হলে তিন গোয়েন্দাকেও থাকার অনুরোধ করল, লোকটা এলে তাকে শনাক্ত করার জন্যে।

সারাটা দিন পুলিশের সঙ্গে মোটর সাইকেল পাহারা দিতে বসে রইল তিন গোয়েন্দা। সন্ধ্যা হয়ে গেলেও যখন এল না লোকটা, নিশ্চিত হলো মরিস, আর আসবে না সে। ওঅ্যারলেসে যোগাযোগ করল থানার সঙ্গে। একটা পিকআপ পাঠাতে বলল, কেসেলরিংটা তুলে নিয়ে যাওয়ার জন্যে।

এখানে বসে থাকার আর কোন মানে হয় না। সেদিন আর লণ্ডনে যাওয়ারও সময় নেই। বাড়ি রওনা হলো তিন গোয়েন্দা।

সাত

পরদিন সকালে আবার লণ্ডন রওনা হলো ওরা। সেদিন আর কোন গণ্ডগোল হলো না, সময়মতই ওখানে পৌঁছল। একটা জেলখানা আছে। ওটার পাশ দিয়ে শহরে ঢুকল। চলে এল বাণিজ্যিক এলাকায়। খুঁজে বের করল মোটর সাইকেলের দোকানটা।

ওদের ঢুকতে দেখে এগিয়ে এল দোকানের বেঁটেখাটো জার্মান মালিক, একগাল হেসে বলল, 'গুড মর্নিং। মোটর সাইকেল চাই? কিনবে, না ভাড়া নেবে?'

'আমরা আসলে কেসেলরিং মোটর সাইকেলের ব্যাপারে আগ্রহী,' কিশোর বলল। 'আপনারা কি বিক্রি করেন?'

'করি। কিন্তু চলে না। জাপানী বাইক চায়। কেমন চলে দেখার জন্যে কয়েক মাস আগে একটা কেসেলরিং এনেছিলাম, আজও পড়ে আছে সেটা।'

'কোথায়?' শো-রুমের চারপাশে চোখ বোলাল কিশোর।

'এখানে না, স্টোর রুমে রেখেছি।' পেছনের একটা দরজার তালা খুলে ভেতরে ঢুকল হফম্যান। পেছন পেছন এল তিন গোয়েন্দা।

ঘরটা অন্ধকার। সুইচ টিপে আলো জেলে দিল হফম্যান। কয়েকটা বড় বাক্সের পাশ কাটিয়ে অন্য পাশে এসেই থমকে দাঁড়াল। হাঁ করে তাকিয়ে রইল দীর্ঘ একটা মুহূর্ত। অবাক হয়ে বলল, 'গেল কোথায়!'

পাশে এসে দাঁড়াল কিশোর, 'কি হয়েছে?'

'এখানেই রেখেছিলাম,' হাত তুলে দেখাল হফম্যান, 'নিশ্চয় চুরি হয়ে গেছে। অনেকদিন দেখি না...'

'এখান থেকে বেরোনোর আরও পথ আছে?'

'তা তো আছেই,' বলতে বলতে প্রায় দৌড়ে এগোল হফম্যান। একটার ওপর আরেকটা বাক্স রাখা, প্রায় ছাতসমান উঁচু হয়ে আছে। সেগুলোর অন্যপাশে এসে থমকে দাঁড়াল। দেখে, শাটারটা নামানোই আছে। কিন্তু নিচু হয়ে হাতল ধরে যেই টান দিল, উঠে এল শাটার। বাইরে থেকে তালা দেয়া ছিল, সেটা খুলে মোটর সাইকেল বের করে নিয়ে গেছে।

'ভেতর থেকেও তালা দিয়ে রাখা উচিত ছিল,' মুসা বলল।

'আমি কি আর জানি নাকি চোর ঢুকবে! কখনও তো ঢোকে না।'

হফম্যান জানাল কিছুদিন আগে ট্রাকে করে কয়েকটা মোটর সাইকেল এসেছিল। সেগুলো গুদামে রেখে বাইরে থেকে তালা আটকে দিয়েছিল। তারপর চলে গিয়েছিল দুই হপ্তার জন্যে ছুটিতে। দোকান খোলা হয়নি। আসার পর আজই প্রথম গুদামে ঢুকল।

বোঝা গেল চুরিটা হয়েছে তার ছুটিতে থাকার সময়।

গজগজ করতে লাগল হফম্যান, 'এখানে এই জেলখানার কাছে দোকান দেয়াই ভুল হয়ে গেছে।'

রবিন ধরল কথাটা, 'জেলখানা থাকলেই লোকে চোর হয় নাকি?'

'আমি সেকথা বলছি না। বলছি, চুরি করে ধরা পড়ে জেলে ঢোকে, বেরিয়েই আবার শুরু করে, চোরের স্বভাব বদলায় না। কাছাকাছি যেখানে সুযোগ পায় সেখান থেকেই শুরু করে। ওরকম অনেক দেখেছি।'

দুঃখে কাতর হয়ে পড়ল হফম্যান। অনেক দামী জিনিস চুরি গেছে তার।

তাকে সান্ত্বনা দিল কিশোর, 'অত ভেঙে পড়বেন না। আমার বিশ্বাস, আপনার মোটর সাইকেল খুব শীঘ্রি ফেরত পাবেন। কাল একটা নতুন কেসেলরিং থানায় নিয়ে গেছে পুলিশ। আমার মনে হয় আপনারটাই।'

মোটর সাইকেলটা কোনখানে নিয়ে গেছে পুলিশ, জানাল কিশোর।

শুনে মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল হফম্যানের। 'তাহলে করো না, পুলিশকে এক্ষুণি একটা ফোন করো!'

হফম্যানের অফিসে ঢুকে ইয়ান ফ্লেচারকে ফোন করল কিশোর। নতুন কোন খবর আছে কিনা জানতে চাইল। কেসেলরিং মোটর সাইকেল চুরির কথা জানাল।

ক্যাপ্টেন বললেন, 'এখুনি মরিসকে পাঠাচ্ছি আমি। তোমরা কি থাকবে?'

'দরকার আছে?'

'নাহ্, দরকার নেই।'

ফোন রেখে ক্যাপ্টেন কি বললেন, হফম্যানকে জানাল কিশোর। কৃতজ্ঞতায় তিন গোয়েন্দাকে বার বার ধন্যবাদ দিতে লাগল সে। তাকেও ধন্যবাদ দিয়ে বেরিয়ে এল গোয়েন্দারা।

গাড়িতে উঠে কিশোরের দিকে তাকাল মুসা, 'বাড়ি যাব?'

'না।'

'তাহলে?'

'খিদে পায়নি তোমার?'

'পায়নি মানে? তোমাদের টিটকারির ভয়ে চুপ করে ছিলাম।'

'চলো আগে, জেলখানায় যাই। ওখান থেকে বেরিয়ে কোন খাবারের দোকানে ঢুকব।'

অবাক হলো মুসা আর রবিন দুজনেই।

'জেলে ঢোকার সাধ হলো কেন আবার?' রবিনের প্রশ্ন।

'হফম্যানের কথায় যুক্তি আছে—জেল থেকে বেরিয়েই অনেক চোর আবার চুরি শুরু করে।'

'বলতে চাইছ এখানেও সেরকম কিছুই ঘটেছে? কেসেলরিংটা চুরি করেছে কোন দাগী চোর?'

'করাটা অসম্ভব নয়।'

'তাহলে চোরাই মার্কেটে বিক্রি করে দিল না কেন? নগদ পয়সা পেয়ে যেত।'

'চুরিটা করেছেই হয়তো অন্য কোনভাবে পয়সা রোজগারের ধান্দায়। হয়তো বিশেষ কারও ওপর নজর রাখতে বলা হয়েছে ওকে, বিনিময়ে পয়সা পাবে। নজর রাখার জন্যে মোটর সাইকেল একটা দরকার, তাই চুরি করেছে। হানা দিয়েছে সবচেয়ে কাছের দোকানটাতে, যা পেয়েছে তাই বের করে নিয়ে এসেছে। এমন জায়গা থেকে নিয়েছে যাতে খোঁজ পড়ে দেরিতে।'

'সাধারণ জিনিস আনলে ভাল করত, যেটা চোখে পড়ে না,' মুসা বলল।

'চোর কি আর ভালমন্দ ভেবে চুরি করে নাকি? যা পায় তাই করে।'

জেলখানায় এসে ওয়ার্ডেনের সঙ্গে দেখা করল ওরা। প্রথমে তিন গোয়েন্দার কার্ড বের করে দিল কিশোর। তাতে সন্তুষ্ট হতে পারলেন না তিনি। শেষে ক্যাপ্টেন ইয়ান ফ্লেচারের প্রশংসাপত্র বের করে দিয়ে যখন বলল কিশোর, প্রয়োজন মনে করলে ক্যাপ্টেনের সঙ্গে ফোনে যোগাযোগ করে ওদের ব্যাপারে খোঁজ নিতে পারেন, তখন সাহায্য করতে রাজি হলেন ওয়ার্ডেন। 'বেশ, বলো কি জন্যে এসেছ?'

মোটর সাইকেল চুরির কথা জানিয়ে কিশোর বলল, 'গত পনেরো দিনে যেসব আসামী ছাড়া পেয়েছে তাদের নাম জানতে চাই।'

উঠে গিয়ে ফাইলিং কেবিনেট থেকে একটা ফাইল বের করে আনলেন ওয়ার্ডেন। উল্টেপাল্টে দেখে বললেন, 'মোট ছয়জন আসামী ছাড়া পেয়েছে; চারজন দাগী, আর দুজন নতুন—প্রথমবার জেল খাটল।'

'দাগীদের নাম দরকার নেই তাহলে। আমরা যাকে খুঁজছি তার বয়েস

একেবারেই কম. বিশের কোঠায়। নতুন দুজনের নাম হলেই চলবে।'

'একজনের নাম এরিক র‍্যাম্বার্ট. গাড়ি চুরির অপরাধে জেল খেটেছে। আরেকজন বার্ড বম্বার. সেফ ভাঙার ওস্তাদ।'

'ছবিগুলো দেখতে পারি. প্লীজ?'

দুটো রেকর্ড কার্ড বের করে দিলেন ওয়ার্ডেন তাতে ছোট ছোট দুটো ফটোগ্রাফ সাঁটা।

বার্ডের ছবিটার দিকে তাকিয়েই বলে উঠল মুসা. 'খাইছে! এই তো আমাদের মোটর সাইকেল চোর!'

চিন্তিত ভঙ্গিতে ছবিটার দিকে তাকিয়ে আছে কিশোর। 'ওয়ার্ডেন. এর ব্যাপারে আর কোন তথ্য দিতে পারেন আমাদের?'

'হ্যাঁ,' বার্ডের রেকর্ড কার্ডটায় দ্রুত চোখ বোলালেন ওয়ার্ডেন. 'তালা খোলায় পারদর্শী হওয়া ছাড়াও এই লোক বিস্ফোরক বিশেষজ্ঞ। আরেকটা অস্বাভাবিক হবি আছে, তা হলো পুরানো কামান নিয়ে গবেষণা।'

প্রায় চেঁচিয়ে উঠল রবিন. 'তাহলে তো আর কোন সন্দেহই নেই. এই লোককেই খুঁজছি আমরা!'

আবার কি যেন চিন্তা করল কিশোর। 'আচ্ছা. হ্যামার রকবিল নামে কোন আসামী ছিল কিনা দেখুন তো, মাসখানেকের মধ্যে ছাড়া পেয়েছে।'

ভাল করে দেখে মাথা নাড়লেন ওয়ার্ডেন, 'না, ওই নামের কোন আসামীর কার্ড তো দেখছি না।'

জেলারকে ধন্যবাদ জানিয়ে তাঁর অফিস থেকে বেরিয়ে এল তিন গোয়েন্দা।

মুসা জিজ্ঞেস করল. 'আর কোথাও যাবে?'

'না,' জবাব দিল কিশোর, 'ভাল কোন একটা খাবারের দোকানের সামনে রাখো।'

আট

দুপুর নাগাদ রকি বীচে ফিরে এল ওরা।

ইয়ার্ডে ঢুকে ওঅর্কশপের সামনে গাড়ি রাখল মুসা। স্টার্ট বন্ধ করে দিয়ে ঘড়ি দেখল। 'কিশোর, সন্ধ্যা হতে এখনও অনেক দেরি। কি করে কাটানো যায় বলো তো?'

ইয়ার্ডের একধারে জঞ্জাল সরাচ্ছে দুই ব্যাভারিয়ান ভাই বোরিস আর রোভার। গাদাগাদি হয়ে আছে পুরানো জিনিস। জঞ্জালের পাহাড় জমে গেছে। একেবারে বাতিলগুলো ফেলে দিয়ে, বিক্রি করা যেতে পারে এমন যা আছে, সেগুলো বেছে বেছে বের করছে।

'চুপ! আস্তে!' মুসাকে বলে ভয়ে ভয়ে চারপাশে তাকাল কিশোর। 'আমাদের কাজ নেই. চাচীর কানে এ কথা গেলে আর রক্ষা থাকবে না! সোজা লাগিয়ে দেবে জঞ্জাল সাফ করার কাজে।'

আশেপাশে কোথাও দেখা গেল না চাচীকে। চাচাও নেই।

দুই সহকারীকে নিয়ে রান্নাঘরে ঢুকল কিশোর। টেবিলে বসে আছেন মেরিচাচী। সামনে একগাদা চিঠি। ডাকবাক্স থেকে বের করে এনেছেন। ওদের দেখে মুখ তুললেন, 'কামানটা পেলি?'

'নাহ্,' মাথা নাড়ল কিশোর। 'অত সহজে পাওয়া গেলে কি আর আমাদের এত টাকা দিতে চায় হ্যামার। চাচাকে দেখছি না, কোথায় গেছে?'

'হলিউডে।'

'কেন? মাল পেয়েছে নাকি?'

'হ্যাঁ। একটা পুরানো বাড়ি ভাঙা হবে। দামে বনলে ওটার সমস্ত জিনিস নিয়ে আসবে।' তিনটে খাম কিশোরের দিকে ঠেলে দিলেন মেরিচাচী। 'তোর।'

অবাক হলো কিশোর, 'একসঙ্গে এতগুলো? কে লিখল?'

একটা চেয়ার টেনে বসতে বসতে রবিন বলল, 'দেখো, পত্রিকায় যে বিজ্ঞাপন দিয়েছিলাম তার জবাব কিনা।'

'হ্যাঁ, তাই হবে। নইলে আমাকে এত চিঠি লিখবে কে,' খামগুলো টেনে নিল কিশোর।

'দেখো, কামানটার কথা কিছু বলেছে কিনা,' মুসাও বসে পড়ল চেয়ারে। মেরিচাচীর দিকে তাকাল, 'আন্টি, গলাটা শুকিয়ে গেছে। কমলার রসটস কিছু আছে?'

হেসে মাথা ঝাঁকিয়ে চেয়ার থেকে উঠে ফ্রিজের দিকে এগোলেন মেরিচাচী।

একটা খাম তুলে নিল কিশোর। লিখেছে এক বুড়ো সৈনিক, গোলন্দাজ বাহিনীর সেই সার্জেন্ট, জ্যাক হুবার্ট, টাউন হলের চত্বরে মঞ্চে উঠে কামান দেগেছিল যে লোক। জানাল, সাগরের তীরে একটা পাহাড়ের গোড়ায় বাস করে সে। লোকে পাহাড়টার নাম রেখেছে পাইরেটস হিল, অর্থাৎ জলদস্যুদের পাহাড়। গুজব আছে, বহুদিন আগে ওই পাহাড়ের ওপর একটা পুরানো কামান ছিল। প্রচণ্ড ঝড়ের মধ্যে একদিন ভূমিকম্পে পাহাড় ধসে গিয়ে কামানটা দেবে যায় পাহাড়ের ভেতর। সেটা জ্যাকের জন্মের আগের ঘটনা।

'মরেছে! আস্ত পাহাড় খুঁড়ে এখন কামান বের করোগে, যাও!' বিরক্তি চাপার জন্যেই যেন এক চুমুকে গ্লাসের অর্ধেকটা কমলার রস খালি করে ফেলল মুসা।

'তোমার কি ধারণা একেবারে মঞ্চের ওপর সাজানো থাকবে, গিয়ে খালি নিয়ে আসবে?' রবিন বলল, 'এত সহজ হলে পাঁচ হাজার ডলার দিতে চাইবে কেন?'

দ্বিতীয় চিঠিটা খুলল কিশোর। লিখেছেন হিরন বাওয়ার নামে এক ভদ্রলোক, রকি বীচ হিস্টরিকাল সোসাইটির পরিচালক ছিলেন, এখন অবসরপ্রাপ্ত।

চাচীর দিকে তাকাল কিশোর, 'চাচী, মিস্টার বাওয়ারকে তো চেনো, চেনো না?'

মাথা ঝাঁকালেন চাচী, 'চিনি, তাতে কি?'

'তিনি লিখেছেন হিসটরিকাল সোসাইটি বিল্ডিঙের সেলারে তিনটে পুরানো কামান রাখা আছে তিরিশ বছর ধরে।'

ভুরু কোঁচকালেন মেরিচাচী, 'বলিস কি! ওখানে মাটির নিচের ঘরে কামান

পড়ে আছে, আর আমি জানি না!'

'তুমি জানবে কি? বাওয়ার তো বলছেন সোসাইটির বর্তমান পরিচালক মিস্টার কারম্যানও নাকি জানেন না এ খবর।'

'ও, তাই বল,' আবার হিসেবের খাতায় ফিরে গেলেন মেরিচাচী।

রবিন বলল, 'কামানগুলো দেখতে গেলে হয় না?'

'যাব,' কিশোর বলল।

তৃতীয়টা কোন চিঠি নয়, হুমকি দিয়ে লেখা হয়েছে দুটো লাইন। নিচে নাম সই করা নেই। কলম বা পেন্সিল দিয়ে লেখেনি। খবরের কাগজ থেকে কাটা অক্ষর সাজিয়ে তৈরি করা হয়েছে বাক্য দুটো:

পুরানো কামান খুঁজলে ঝুঁকি নিয়ে নিজেদের দায়িত্বে খুঁজবে

ঘটে যদি একফোঁটা বুদ্ধিও থেকে থাকে হ্যামারের কাজ থেকে সরে দাঁড়াও

হাঁ হাঁ করে উঠতে যাচ্ছিল মুসা, চোখ টিপে ওকে থামাল কিশোর। এই হুমকির কথা মেরিচাচী শুনলে ওদের তদন্ত করাই বন্ধ করে দেবেন। কামান খোঁজা বাদ।

চিঠিগুলো সব আবার খামে ভরে ফেলল কিশোর। হিসেবে মনযোগ থাকায় তৃতীয় চিঠিটাতে কি লিখেছে জানতে চাইলেন না মেরিচাচী। মুসা আর রবিনকে নিয়ে রান্নাঘর থেকে বেরোতে যাবে কিশোর, এই সময় বসার ঘরে ফোন বাজল।

খাতার দিকে তাকিয়ে থেকেই চাচী বললেন, 'কিশোর, ধরগে তো।'

রিসিভার কানে ঠেকাল কিশোর, 'হালো।'

ওপাশ থেকে শোনা গেল অস্থির কণ্ঠস্বর, 'কিশোর পাশা আছে?'

'আমি কিশোর।'

'ও, আমি হ্যামার,' অস্বস্তিভরা কণ্ঠে বলল লোকটা, 'কিশোর, আমাকে হুমকি দেয়া হচ্ছে!'

'কে দিচ্ছে?' তরল গলায় খানিকটা ব্যঙ্গের সুরেই বলল কিশোর, 'ওই বাচ্চা ছেলেমেয়েগুলো?'

'না না!' অস্পষ্ট হয়ে গেল হ্যামারের গলা, আবার জোরাল হলো, 'কিশোর, শুনতে পাচ্ছ?'

'পাচ্ছি। বলুন। কে হুমকি দিচ্ছে আপনাকে?'

কি যেন বলতে গিয়ে থেমে গেল হ্যামার।

'মিস্টার হ্যামার?'

জবাব নেই। আচমকা ভোঁতা, অস্পষ্ট একটা শব্দ ভেসে এল। পরক্ষণেই মেঝেতে রিসিভার আছড়ে পড়ার শব্দ।

'মিস্টার হ্যামার! হালো! হালো!' চিৎকার করতে লাগল কিশোর।

কয়েক সেকেণ্ড পর ভেসে এল একটা ভারি কণ্ঠ, 'কে, তিন গোয়েন্দা? কামান খোঁজা বাদ দাও! এটাই শেষ ওয়ার্নিং।'

কেটে গেল লাইন।

রিসিভার রেখে ফিরে তাকাল কিশোর। মুসা আর রবিন দাঁড়িয়ে আছে, চোখে কৌতূহল। ওদেরকে জানাল সে, 'মনে হয় হ্যামার বিপদে পড়েছে। ওর ঘর থেকে

একটা লোক আমাদেরকেও হুমকি দিল। চলো, এক্ষুণি যেতে হবে।'

নয়

যতটা জোরে সম্ভব গাড়ি চালাচ্ছে মুসা। বিকট শব্দে পথচারীকে সচকিত করে ঝড়ের গতিতে ছুটছে জেলপি।

মোটেলের চত্বরে ঢুকতেই ঝটকা দিয়ে দরজা খুলে ফেলল কিশোর। গাড়ি থামতে না থামতে লাফিয়ে নামল। প্রায় ছুটতে ছুটতে রিসেপশনে ঢুকে ডেস্কে বসা ক্লার্কের কাছে জানতে চাইল হ্যামার ঘরে আছে কিনা

'আছে,' মাথা ঝাঁকিয়ে বলল ক্লার্ক। 'একশো আঠারো নম্বর।'

'জানি,' বলে বারান্দার দিকে দৌড় দিল কিশোর। তার পেছনে ছুটল রবিন আর মুসা।

অবাক হয়ে সেদিকে তাকিয়ে রইল ক্লার্ক।

হাঁ হয়ে খুলে আছে হ্যামারের ঘরের দরজা।

ছুটে ঘরে ঢুকে পড়ল কিশোর। ঢুকেই থমকে দাঁড়াল। মেঝেতে পড়ে আছে হ্যামার। মাথার পেছনের ক্ষত থেকে রক্ত পড়ছে। ঘরে আর কেউ নেই।

হুড়াহুড়ি করে এসে হ্যামারের পাশে বসে পড়ল তিন গোয়েন্দা। ঘাড়ের কাছে নাড়িতে হাত রেখে মাথা নাড়ল রবিন, বেঁচে আছে। তিনজনে মিলে তাকে চিত করে শোয়াল। গুঙিয়ে উঠল হ্যামার।

'আমি পানি আনছি,' উঠে বাথরুমে চলে গেল রবিন। ফিরে এল জগ ভরে পানি নিয়ে। হ্যামারের মুখে পানির ছিটে দিল। একটা তোয়ালে ভিজিয়ে ঘাড়ে চেপে ধরল।

ধীরে ধীরে জ্ঞান ফিরল হ্যামারের। আরও কয়েকবার গোঙানোর পর চোখ মেলল। ঝুঁকে থাকা মুখগুলোকে চিনতে পারল। 'তোমরা?' গুঙিয়ে উঠল আবার, 'উফ্, আমার মাথা···'

'কথা বলবেন না, চুপ করে থাকুন,' কিশোর বলল।

ধরাধরি করে ওকে বিছানায় নিয়ে গেল ওরা। উপুড় করে শুইয়ে দিল। বাথরুমের মেডিসিন চেস্ট থেকে ব্যাণ্ডেজ খুঁজে আনল রবিন। বেঁধে দিল হ্যামারের মাথায়। অনেকটা সামলে নিল সে। কে তার ওপর হামলা চালিয়েছে জিজ্ঞেস করল কিশোর।

'দরজায় ছিটকানি লাগাইনি,' হ্যামার বলল। 'কখন ঢুকল লোকটা কিছুই টের পাইনি। আমি তখন তোমাকে ফোন করছি। হঠাৎ মাথায় যেন আকাশ ভেঙে পড়ল। আর কিছু জানি না।'

'লোকটাকে দেখেছেন?'

'না।'

'কিভাবে হুমকি দিল?'

'টেলিফোনে।'

'কি বলল?'

'বলল, কামান খোঁজা বন্ধ করো। নইলে মারা পড়বে।'

রবিনের দিকে তাকাল কিশোর, 'ক্লার্ককে খবর দাও পুলিশকে জানাতে হবে।'

'না না, দরকার নেই,' তাড়াতাড়ি বাধা দিল হ্যামার 'পুলিশ এসে কিছুই করতে পারবে না, অহেতুক ঝামেলা করবে প্রশ্ন করে করে মাথাটা খারাপ করে দেবে আরও।'

সেবাযত্ন পেয়ে হ্যামারের অবস্থার অনেকটা উন্নতি হলো তার কাছ থেকে তথ্য আদায়ের চেষ্টা চালাল কিশোর, 'টাম্পার কোনখানে যেন থাকেন বলেছেন আপনি?'

'বলিনি তো। কেন?'

কিশোর বলল, 'ঠিকানাটা জানা থাকলে ভাল হয়। বলা তো যায় না, শত্রু যখন আছে, বাই চান্স যদি খারাপ কিছু ঘটে যায় আপনার, তাহলে আপনার পরিবারকে জানাতে পারব।'

'আমার পরিবার নেই।'

অন্য প্রসঙ্গে এল কিশোর, 'যে কামানটা খুঁজছেন সেটা যে ডাঙায় ব্যবহারের জন্যে এ কথা কি আপনি জানেন?'

চমকে গেল হ্যামার। সেটা চাপা দেয়ার জন্যেই বোধহয় সিগার বের করল। প্রয়োজনের চেয়ে অনেক বেশি সময় লাগিয়ে দিল ধরাতে। মুখ তুলে বলল, 'ভাল গোয়েন্দা তোমরা, সবদিকেই নজর আছে। হ্যাঁ, আমি জানি ওই ডেমিকালভেরিন ডাঙায় ব্যবহার হত।'

'তারমানে জাহাজে তুলতে চাইছেন ডামি হিসেবে? তাহলে আর আসল কামানের কি দরকার? কাঠ দিয়ে বানিয়ে নিলেই তো হয়। সিনেমায় হরদম ব্যবহার করা হচ্ছে।'

'কিন্তু...' জবাব খুঁজে না পেয়ে লাল হয়ে যাচ্ছে হ্যামার। 'আসলে...নকল জিনিস দিয়ে দর্শককে ঠকাতে চাই না আমি। আসল জিনিস দেখাতে চাই।' কিশোরের বাহুতে হাত রাখল সে। 'তোমরা আমাকে সাহায্য করো। দরকার হলে টাকা আরও বাড়িয়ে দেব আমি। পাঁচ হাজারের জায়গায় দশ হাজার দিতেও আপত্তি নেই।'

'টাকার জন্যে কাজ করি না আমরা, মিস্টার রকবিল। যে কাজ আমাদের পছন্দ হবে না, সেটা করব না, যত টাকার প্রস্তাবই আসুক না কেন। মক্কেল অপছন্দ হলেও কাজ করি না। দয়া করে কয়েকটা প্রশ্নের সত্যি জবাব দিন। নইলে কামান খোঁজা বন্ধ করে দিতে বাধ্য হব আমরা।'

'ঠিক আছে ঠিক আছে, অত রেগে যাওয়ার কিছু নেই। করো, কি প্রশ্ন করবে।'

'কামানটা আসলে কি দরকার আপনার?'

'সেটা জানা কি খুব জরুরী?'

'হ্যাঁ।'

কিশোরের চোখ থেকে চোখ সরিয়ে নিল হ্যামার। ঘন ঘন টান দিল কয়েকবার সিগারে। তারপর বলল, 'বুঝতে পারছি, তোমাদের ফাঁকি দেয়া যাবে না। হ্যাঁ, মিথ্যে কথাই বলেছি আমি তোমাদের, মেলায় দেখানোর জন্যে কামানটা আমি চাইছি না। চাইছি, ওটার দামের কারণে। ঐতিহাসিক ভ্যালু আছে ওটার, অ্যানটিক মূল্য অনেক। যে কোন জাদুঘর ওটা পেলে লুফে নেবে।'

'কি করে জানলেন, এই এলাকাতেই আছে?'

'জেনেছি আমার এক ঐতিহাসিক বন্ধুর কাছে। তার দৃঢ় বিশ্বাস, এই উপকূলেরই কোনখানে আছে কামানটা।'

হ্যামারের এবারকার কথা অনেকটা বিশ্বাসযোগ্য মনে হলো কিশোরের কাছে। 'হুঁ। তা এবার বলুন, আপনার শত্রু কে, কিছু কি আন্দাজ করতে পারেন?'

হাসল হ্যামার, 'পুলিশ না ডেকে আর লাভটা কি হলো? পুলিশের মতই তো জেরা শুরু করলে?'

'তা তো করবই, কারণ আমরা গোয়েন্দা। আমার প্রশ্নের জবাব কিন্তু পেলাম না।'

এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে জবাব দিল হ্যামার, 'না, তেমন কারও নাম বলতে পারছি না। তবে আমি যেমন শুনেছি, কামানটার কথা আরও কেউ শুনে থাকতে পারে। খুঁজতেও বেরোতে পারে। তাদের কেউই হয়তো শত্রু হয়েছে এখন আমার।'

আচমকা প্রশ্নটা করে বসল কিশোর, 'বার্ড বম্বারকে চেনেন?'

হ্যামারের চোখের তারা সামান্য কেঁপে উঠল বলে মনে হলো কিশোরের, তবে তার মুখ দেখে কিছু বোঝা গেল না। মাথা নাড়ল, 'না, ওই নামের কারও সঙ্গে পরিচয় নেই।'

'হুঁ,' কয়েক সেকেণ্ড চুপ করে রইল কিশোর। তারপর উঠে দাঁড়াল, 'আজ তাহলে যাই। সাবধানে থাকবেন। নতুন কিছু ঘটলে সঙ্গে সঙ্গে জানাবেন।'

'ঠিক আছে।'

দুই সহকারীকে নিয়ে হ্যামারের ঘর থেকে বেরিয়ে এল কিশোর।

রকি বীচে ফেরার পথে রবিন জিজ্ঞেস করল, 'কি মনে হচ্ছে তোমার?'

'রহস্যটা আরও ঘনীভূত হচ্ছে,' জবাব দিল কিশোর। 'হ্যামারের শত্রু আছে। কে, সেটা সে জানে এবং কোন কারণে ফাঁস করতে চাইছে না; জিজ্ঞেস করলে মিথ্যে কথা বলছে।'

ড্রাইভিং সীট থেকে মুসা বলল, 'আমাদেরকে ফলো করছে একটা গাড়ি। কনভারটিবল।'

ফিরে তাকাল কিশোর আর রবিন। পঞ্চাশ গজ দূরে রয়েছে গাড়িটা। চালক সুদর্শন এক তরুণ।

'ফলো করছে কিনা শিওর হওয়া দরকার,' রবিন বলল।

আচমকা পথের পাশে গাড়ি সরিয়ে আনল মুসা। থামিয়ে দিল। পাশ দিয়ে এক এক করে চলে যাচ্ছে পেছনের গাড়িগুলো। কনভারটিবলটাও গেল। পাশ কাটানোর সময় গোয়েন্দাদের দিকে ফিরে তাকাল তরুণ লোকটা।

'চিনতে পেরেছ?' জিজ্ঞেস করল রবিন।
'কি করে চিনব,' জবাব দিল মুসা। 'জিন্দেগিতেও দেখিনি।'

দশ

পরদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে নিচে নেমেই মেরিচাচীর হই-চই শুনতে পেল কিশোর। রান্নাঘরে এসে ঢুকল। রাশেদ পাশা মনোযোগ দিয়ে পত্রিকায় একটা খবর পড়ছেন। কিশোরকে দেখেই চাচী বলে উঠলেন, 'দেখ, কি কাণ্ড করেছে!'

'কি?'

'হিসটরিকাল সোসাইটিতে ডাকাতি!'

'কামান নিয়ে গেছে নাকি?'

'আরে না! যার মনে যে চিন্তা···কামান নেবে কি করে, অত ভারি জিনিস। ছোট জিনিস নিয়েছে, তার মধ্যে কাটলাস আছে কয়েকটা। অ্যানটিক মূল্য অনেক।'

কাটলাস কি জিনিস জানা আছে কিশোরের—একদিকে ধারওয়ালা বড় ছুরি, জলদস্যুরা ব্যবহার করত। বিশেষ আগ্রহী হলো না সে। তবে চাচার কাছ থেকে পত্রিকাটা নিয়ে খবরটা পড়ল। বিল্ডিঙের পেছনের দরজা দিয়ে তালা খুলে ঢুকেছে চোর।

সঙ্গে সঙ্গে বার্ড বম্বারের কথা মনে পড়ল কিশোরের, তালা খোলার ওস্তাদ।

নাস্তা সেরে এসে ওঅর্কশপে বসল সে। ঘড়ি দেখল। সাতটা বাজে। ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই মুসা আর রবিনের আসার কথা। দুই জায়গায় যাওয়ার কথা আছে আজ। জ্যাক হুবার্ট আর হিরন বাওয়ারের ওখানে যাবে ডেমিকালভেরিন কামানটার ব্যাপারে খোঁজখবর করতে। সোসাইটির কামানগুলো দেখতে যাওয়ার আগে বাওয়ারের সঙ্গে আলোচনা করা প্রয়োজন। যে জাতের কামান খুঁজছে ওরা সে জিনিস না হলে অহেতুক গিয়ে সময় নষ্ট করার কোন মানে হয় না। বাওয়ারের সঙ্গে কথা বলে সোজা হুবার্টের বাড়িতে চলে গেলেই হবে।

আটটার আগেই চলে এল মুসা আর রবিন। তৈরি হয়ে বসে আছে কিশোর। ওরা আসতেই বেরিয়ে পড়ল।

ছোটখাট মানুষ বাওয়ার। হাসিখুশি। বাগান করার শখ। চাকরি থেকে অবসর নেয়ার পর বাগান নিয়েই আছেন। বাড়ির সামনের বাগানে চেয়ার পাতা আছে। সেখানেই বসতে বললেন ছেলেদের। হাতের নিড়ানিটা ফেলে দিয়ে বললেন, 'এক মিনিট, আমি হাতটা ধুয়ে আসি।'

বাগানের কোণের কল থেকে হাত ধুয়ে এলেন তিনি। বসলেন তিন গোয়েন্দার মুখোমুখি।

'সুন্দর বাগান আপনার,' প্রশংসা করল রবিন।

জবাবে হাসলেন শুধু বাওয়ার। অহেতুক কথা পছন্দ করেন না, বোঝা গেল, সরাসরি আসল কথায় চলে এলেন তিনি, 'তোমরা নিশ্চয় কামানের কথা জানতে

এসেছ?'

মাথা ঝাঁকাল কিশোর। 'আপনি যে তিনটে কামানের কথা লিখেছেন, ওগুলোর কথা।'

সংক্ষেপে জলদস্যুদের এক গল্প শোনালেন বাওয়ার। ১৭৬০ সালে রকি বীচের উপকূলে আক্রান্ত হয়েছিল দুটো সশস্ত্র বাণিজ্য তরী একটা জাহাজ দখল করে নেয় দস্যুরা, আরেকটা পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়। কোন রহস্যময় কারণে একটা জাহাজ দখল করেই সন্তুষ্ট থাকল ডাকাত সর্দার, দ্বিতীয় জাহাজটাকে আর তাড়া করল না। তীরে ভেড়ানোর আদেশ দিল। সম্ভবত জাহাজ লুট করার পর মালপত্রে বোঝাই হয়ে এত ভারি হয়ে গিয়েছিল ওদের নিজেদের জাহাজ, পালের শক্তিতে আর কুলায়নি, তাই তাড়া করতে পারেনি অন্য জাহাজটাকে।'

'উপকূলের ঠিক কোনখানে এ ঘটনা ঘটেছিল, বলতে পারেন?' জিজ্ঞেস করল কিশোর।

'পাইরেটস হিল।'

ঝট করে একে অন্যের দিকে তাকাল মুসা আর রবিন। বিড়বিড় করল কিশোর, 'জলদস্যুদের পাহাড়!'

'কি বললে?'

'না, কিছু না। আচ্ছা, পাইরেটস হিলে এখনও কোন কামান লুকানো আছে, জানেন আপনি?'

'থাকতে পারে। একসময় যে হারে জলদস্যুর আনাগোনা ছিল ওখানে, একটা কেন, একাধিক কামান থাকতে পারে।'

'হিস্টরিকাল সোসাইটিতে ওদের কোন কামান আছে?'

'উঁহু। যে তিনটে আছে, সব ব্রিটিশ কামান। একটা মিনিয়ন, একটা স্যাকার আর একটা পেডরেরো। সব কাস্ট ব্রোঞ্জে তৈরি।'

'বাপরে বাপ, নাম কি একেকখান!' মুসা বলল।

মুচকি হাসলেন বাওয়ার। 'দুনিয়ার সব আগ্নেয়াস্ত্রেরই নাম থাকে, কামানের থাকলে দোষ কি? স্যাকার নামটা নেয়া হয়েছে ভয়ঙ্কর বাজপাখি স্যাকার হকের নাম থেকে। অস্ত্রটাও ওরকমই ভয়ঙ্কর, যদিও আধুনিক কামানের কাছে ওটা হাস্যকর একটা খেলনা। এ তিনটের মধ্যে সবচেয়ে লম্বা হলো পেডরেরো, অন্য দুটোর তুলনায় হালকা। এটা দিয়ে পাথর ছোঁড়া হত। পুরুও অন্য দুটোর চেয়ে কম। এর মধ্যে সবচেয়ে ছোট মিনিয়ন। শুধু জাতই নয়, আলাদা আলাদা নামও দেয়া হত কোন কোন কামানের। এই যেমন দি টেরর, দি অ্যাংরি ওয়ান, দি অ্যাভেঞ্জার।'

'অলঙ্করণ করা নেই তো?' জানতে চাইল রবিন। 'ব্রিটিশদের ওই ধরনের কামানে সাধারণত যা থাকে?'

'আছে,' রবিনের দিকে তাকালেন বাওয়ার। 'কামান সম্পর্কে তো বেশ ভাল ধারণা তোমার?'

হাসল রবিন।

মুসা বলল, 'থাকবে না, সারাদিন লাইব্রেরিতে পড়ে থাকে।

ডেমিকালভেরিনটার কথা জানার পর থেকে রকি বীচ লাইব্রেরিতে কামানের ওপর যত বই আছে সব ঘেঁটে ফেলেছে।'

বাওয়ার বললেন, 'তিনটে কামানের গায়েই ফুল, লতা-পাতা এ সব আঁকা, ছাঁচের সাহায্যে করা হয়েছে। স্যাকারের হাতলটা তৈরি হয়েছে ডলফিনের আকৃতিতে।'

'সোসাইটিরগুলোর নাম আছে?' জিজ্ঞেস করল রবিন।

'একটার আছে, ওয়াম্প। বাকি দুটো বেনামী।'

অনেক তথ্য পাওয়া গেল বাওয়ারের কাছে। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো পাইরেটস হিলের কাছে জলদস্যুদের কামান থাকার খবর। কিশোর এখন নিশ্চিত, কালভেরিনটা সত্যি যদি পাওয়া যায়, ওখানেই যাবে।

বাওয়ারকে অনেক অনেক ধন্যবাদ দিয়ে তাঁর বাড়ি থেকে বেরিয়ে এল তিন গোয়েন্দা।

গাড়িতে উঠে মুসা জিজ্ঞেস করল, 'কোথায় যাব, পাইরেটস হিলে?'

'অবশ্যই,' মাথা ঝাঁকাল কিশোর। 'কামানটা ওখানেই আছে।'

এগারো

পাইরেটস হিলে আগেও গেছে তিন গোয়েন্দা। পিকনিক করতে। চেনা জায়গা। ওখানকার সাগরেও ডুবুরির পোশাক পরে ডুব দিয়েছে মুসা। বড়শি দিয়ে মাছ ধরেছে। প্রচুর জেলে মাছ ধরে ওখানে।

ওখানে পৌঁছে জ্যাক হুবার্টের ডেরা খুঁজে বের করতে মোটেও বেগ পেতে হলো না। সাগরের ধারে বড়শি দিয়ে মাছ ধরছে এক জেলের ছেলে, ওকে জিজ্ঞেস করতেই হাত তুলে দেখিয়ে দিল।

সৈকত থেকে বেশ খানিকটা দূরে পাহাড়ের গোড়ায় পথের পাশে গাড়ি রেখে পায়ে হেঁটে এগোল ওরা।

অতি সাধারণ একটা কাঠের কেবিন। সামনের বালিতে চোখ পড়তেই থমকে দাঁড়াল কিশোর।

'কি হলো?' জানতে চাইল রবিন।

হাত তুলে দেখাল কিশোর, 'জুতোর ছাপ।'

রবিন আর মুসা দুজনেই দেখল। কিছু বুঝতে পারল না।

মুসা বলল, 'লোক যখন আছে জুতোর ছাপ তো থাকবেই। এতে অবাক হওয়ার কি হলো?'

'এদিকে আর কোন বাড়িঘর নেই, লক্ষ করেছ?'

'তাতে কি?'

'তাতে? অনেক কিছু। জুতোর ছাপগুলো তাজা।'

'তাতেই বা কি?' অধৈর্য হয়ে উঠল মুসা, 'তোমার হেঁয়ালি করে কথা বলা একটিবারের জন্যে অন্তত থামাও না।'

'এত সূত্র হাতে থাকতে ব্যাপারটা বুঝতে পারছ না? জুতোর তাজা ছাপ পড়ে আছে—তারমানে খানিক আগে কেউ একজন দেখা করতে এসেছিল জ্যাক হুবার্টের সঙ্গে।'

'কেন, এগুলো জ্যাকের জুতোর ছাপ হতে পারে না?'

'না, পারে না,' সুযোগ পেয়েই লেকচার দিতে আরম্ভ করল কিশোর, যা তার স্বভাব, 'আসলে কোন কথা মনে রাখো না তোমরা, কোন জিনিস খুঁটিয়ে দেখো না। জ্যাককে দেখেছ, কিন্তু মনে রাখোনি। ওর শরীর অত বড় না যে তার জুতোর ছাপ এতবড় হবে।'

'বেশ, বুঝলাম জ্যাকের সঙ্গে কেউ দেখা করতে এসেছিল,' কিশোরের লেকচারে কিছু মনে করল না মুসা, শুনতে শুনতে গা সওয়া হয়ে গেছে, 'কিন্তু তাতে কি?'

গাল চুলকাল কিশোর। 'চলো, তাকেই জিজ্ঞেস করি। এমনও হতে পারে, কামানের ব্যাপারে আমাদের মতই আগ্রহী কেউ এসে খোঁজখবর করে গেছে জ্যাকের কাছে।'

অনুমান সাধারণত ভুল হয় না কিশোরের, বহুবার এর প্রমাণ পেয়েছে রবিন, দেখা যাক এবার কি হয়, ভেবে সদর দরজায় টোকা দিল সে।

ভেতর থেকে সাড়া এল, 'কে?'

'আমরা, তিন গোয়েন্দা। প্লীজ, খুলুন।'

দরজা খুলে দিল জ্যাক, প্রায় দুশো বছর আগের আমেরিকান আর্মির পোশাক পরে আছে। 'বাহ্, আজ মেহমান আসার একেবারে হিড়িক লেগে গেছে দেখি। এই খানিক আগে এসেছিল আরেকজন।'

'কামানের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করতে নিশ্চয়?' জানতে চাইল কিশোর।

অবাক হলো জ্যাক, 'তুমি জানলে কি করে?'

'অনুমান।'

পরস্পরের দিকে তাকাল মুসা আর রবিন। তবে অবাক হলো না। এরকম কিছুই শুনবে আশা করেছিল ওরা।

'কোত্থেকে এসেছিল, কিছু বলেছে?' জিজ্ঞেস করল রবিন।

'বলল কোন একটা কলেজে নাকি থিসিস করছে, পুরানো কামানের ব্যাপারে আগ্রহী। শুনেছে, এখানে পাহাড়ের ওপর একটা কামান ছিল, আমার কাছে খোঁজ নিতে এসেছে কোন্ জায়গায় খুঁড়লে কামানটা পাওয়া যেতে পারে।'

'লোকটা কে?'

'নাম জিজ্ঞেস করেছিলাম, বলল, হ্যারি বোগার্ট।'

'দেখতে কেমন?' জানতে চাইল কিশোর।

'লম্বা, বেশ সুন্দর চেহারা। সবজে চোখ, বাদামী চুল। তা ওই লোকের ব্যাপারে এত আগ্রহ কেন তোমাদের? কি করেছে সে?'

'না, কিছু করেনি,' কোনমতে প্রথম প্রশ্নটা এড়িয়ে গিয়ে কিশোর বলল, 'আপনার চিঠি পেয়ে এলাম। কামানটার কথা জানতে।'

'ভেতরে এসো,' দরজা থেকে সরে জায়গা করে দিল হুবার্ট। ঘরে ঢুকল তিন

গোয়েন্দা।

বাওয়ারের কাছে শুনে আসা জলদস্যুদের কথা বলে জিজ্ঞেস করল কিশোর, 'আপনার কি মনে হয় পাহাড়ের ওপর যে কামানটা ছিল, ওটা জলদস্যুদেরই জিনিস?'

'হতে পারে, যদি ডেমিকালভেরিন না হয়। আরও একটা ঘটনা ঘটেছে তখন যেটা মিস্টার বাওয়ার জানেন না কিংবা তোমাদের বলার প্রয়োজন মনে করেননি, সেটা হলো এই এলাকায় জলদস্যুরা নামত বলে একটা সময় ওদের ধরার জন্যে আর্মি এসে ঘাপটি মেরে ছিল। প্রচণ্ড লড়াই হয়েছিল জলদস্যুদের সঙ্গে। কামানটা আর্মিরও হতে পারে।'

জ্যাকের দিকে তাকিয়ে রইল কিশোর। হ্যাঁ, এতক্ষণে মিলছে। জলদস্যুদের কাছে ডেমিকালভেরিন যাওয়ার কথা নয়, কারণ ওগুলো ডাঙায় ব্যবহারের জন্যে, স্থলবাহিনীর গোলন্দাজদের হওয়া স্বাভাবিক। এ অঞ্চলে কি করে এল কামানটা, তারও একটা জবাব পাওয়া গেল।

জ্যাক বলল, 'তবে ধস নেমে হারিয়ে যাওয়া কামানটা বাণিজ্য তরীরও হতে পারে। গুজব আছে একটা কামান ছিল ওখানে, তবে কোন জাতের কামান, কার কামান সেটা জানা যায়নি।'

তারমানে বোঝা যাচ্ছে পাহাড়ের ওপরে একটা কামান ছিল এটা ধরে নিলেও কোনমতেই নিশ্চিত হওয়া যাচ্ছে না যে ওটাই ডেমিকালভেরিনটা কিনা। হতে হলে কামানটা খুঁড়ে বের করতে হবে আগে। তবে তার আগে জানতে হবে ঠিক কোনখানে আছে ওটা।

জ্যাকের পোশাক দেখিয়ে জিজ্ঞেস করল রবিন, 'এসব কাপড় কোথায় পেলেন? এত পুরানো?'

হাসল জ্যাক, 'শুধু এগুলোই না, আরও আছে। দেখতে চাও?'

মাথা ঝাঁকাল রবিন।

'ওঠো তাহলে, জলদস্যুদের ডেরায় যেতে হবে।'

'জলদস্যুদের ডেরা!' চোখ বড় বড় হয়ে গেছে মুসার।

'হ্যাঁ, যেতে ভয় লাগছে?' মিটিমিটি হাসছে জ্যাক।

'এখনও বেঁচে আছে নাকি ওরা?'

'এখন থাকবে কোত্থেকে? কবে মরে ভূত হয়ে গেছে...'

ভূতের ভয়ে যদি না যেতে চায় মুসা, ডেরাটা আর দেখা হবে না, এই আশঙ্কায় তাড়াতাড়ি বলে উঠল কিশোর, 'চলুন, দেখব।'

উঠে দাঁড়াল জ্যাক, 'চলো।'

একা বসে থাকতে ভাল লাগছে না। সামান্য ইতস্তত করে মুসাও ওদের সঙ্গে রওনা হলো।

ওদেরকে রান্নাঘরে নিয়ে এল জ্যাক। ঘরের এককোণে ছাত থেকে ঝুলছে একটা দড়ির সিঁড়ি। ছাতের বড় একটা ফোকর গলে ওপরে উঠে গেছে সিঁড়িটা।

ছেলেদের দিকে তাকিয়ে সার্জেন্ট বলল, 'আমি যাচ্ছি। একজন একজন করে ওঠো।'

সিঁড়ি বেয়ে সে ওপরে অদৃশ্য হয়ে যেতেই এগিয়ে গেল কিশোর।

বারো

ওপরতলার একটা ঘরে উঠে এল ওরা। অন্ধকার। কিছু দেখা যাচ্ছে না। ঘরের কোণের একটা লণ্ঠন জ্বেলে দিল জ্যাক।

আলো জ্বলতে প্রথমেই গোয়েন্দাদের চোখে পড়ল দুটো কাটলাস। একটা মুহূর্ত অবাক হয়ে ভাবল তিনজনেই, ওগুলো হিস্টরিকাল সোসাইটির চুরি যাওয়া জিনিসগুলো নয় তো? পরক্ষণে দূর করে দিল ভাবনাটা, কারণ ফুঁ দিয়ে ওগুলোর ওপর থেকে ধুলো সরাল জ্যাক। ধুলোর পুরু আস্তরণ জমে ছিল। তারমানে বহুদিন ধরে ওগুলো এখানে এভাবেই পড়ে আছে।

ঘরটা একটা ছোটখাট জাদুঘর। পুরানো আমলের যে সব সিন্দুকে মোহর আর দামী রত্ন, অলঙ্কার এ সব রাখত জলদস্যুরা সেই সিন্দুক, প্রাচীন বন্দুক, পিস্তল, মোহর, সামরিক বাহিনীর ব্যবহৃত মরচে পড়া জিনিসপত্র, পুরানো ম্যাপ, জলদস্যুদের পতাকা আর পোশাক, কুখ্যাত দস্যুসর্দারদের রঙ মলিন হয়ে যাওয়া ছবি; সব সাজানো রয়েছে টেবিলে আর দেয়ালে যেটা যেখানে মানায়। একপাশে একটা র‍্যাকে সাজানো রয়েছে বিভিন্ন আমলের সামরিক বাহিনীর কিছু পোশাক।

'দারুণ তো!' রবিন বলল। 'প্রতিটি জিনিস হাতে নিয়ে নিয়ে দেখতে ইচ্ছে করছে। আজ তো সময় নেই, আবার আসব আমি, সার্জেন্ট হুবার্ট।'

'এসো। যে কোন সময় তোমাদের জন্যে দরজা খোলা থাকবে। পছন্দ হয়েছে তাহলে?'

'খুউব!'

'এখান থেকেই পোশাক নিয়ে নিয়ে পরেন আপনি তাহলে,' কিশোর বলল।

'হ্যাঁ। এটা আমার শখ। পুরানো ইউনিফর্ম জোগাড় করে রেখেছি, যখন যেটা ইচ্ছে, পরি।'

দেয়ালে হেলান দিয়ে রাখা বরফ খোঁচানোর শিকের মত একটা চোখা শিক দৃষ্টি আকর্ষণ করল রবিনের। 'এই আইস পিকটা এখানে রেখেছেন কেন? এটা দিয়ে জাহাজের বরফ পরিষ্কার করত নাকি জলদস্যুরা?'

হাসল জ্যাক, 'আইস পিক নয় এটা, গানারস পিক।'

'মানে?' বুঝতে পারল না রবিন। 'কামানের ভেতর লেগে থাকা বারুদ পরিষ্কার করত?'

'না। আঠারো শতকের গোলন্দাজরা কামান দাগার জন্যে যে এগারোটা অতি জরুরী টুলস ব্যবহার করত, তার মধ্যে এটা একটা। গানারস পিক।'

'তা তো বুঝলাম,' অধৈর্য হয়ে উঠল মুসা, 'নিশ্চয় কোন কিছু খোঁচাত এটা দিয়ে। কি খোঁচাত?'

বুঝিয়ে বলল জ্যাক। প্রথম দিকে কামানের নলে বারুদ ভরা হত মোটা লাঠি বা শিক দিয়ে ঠেসে ঠেসে। তাতে সময় লাগত, অনেক ঝামেলা হত, সেটা দূর

করার জন্যে আবিষ্কার হলো একধরনের পুঁটুলি, তাতে বারুদ ভরা থাকত। এর নাম ছিল পাউডার ব্যাগ। ওই ব্যাগ কামানের ভেতর রেখে একটা চোখা শিক দিয়ে খোঁচা মেরে ছিদ্র করে দেয়া হত যাতে সরাসরি বারুদে আগুন লাগানো যায়।

'তারপর?' মুসার প্রশ্ন।

'তারপর আর কি, ভ্রাম্‌ম্! যেত ফেটে পাউডার ব্যাগ, গোলা ছুটিয়ে নিয়ে যেত।'

'কি সব কাণ্ড!'

'হ্যাঁ, এখন শুনলে কেমন হাসি পায় না? অথচ এটা ছিল তখন খুব আধুনিক ব্যবস্থা।'

'পিকটা কোথায় পেয়েছেন?' জানতে চাইল কিশোর।

'পানির নিচে...'

তাকিয়ে রইল কিশোর।

'সাগরের নিচে ডুব দেয়া আমার আরেকটা শখ,' জ্যাক বলল। 'একদিন পানির নিচে নেমে খোঁজাখুঁজি করছি, পুরানো জাহাজের কোন জিনিস মেলে কিনা দেখছি, এই সময় পেয়ে গেলাম এটা।'

'ওখানে গেল কি করে?'

'সে জিজ্ঞাসাটা তো আমারও। জলদস্যুদের জাহাজ থেকে পড়ে গিয়ে থাকতে পারে।'

নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটল একবার কিশোর। দীর্ঘ একটা মুহূর্ত চুপ থেকে আনমনে বিড়বিড় করল, 'ডাঙায় হলে পিকটা যেখানে পাওয়া গেছে সেখানকার মাটি খুঁড়ে দেখতাম।' জ্যাকের দিকে তাকাল, 'পিক যেখানে কামানও সেখানে, এটা হতে পারে না?'

'পারে, তবে ডাঙায় হলে সে সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু পানির নিচে যেহেতু পেয়েছি, জাহাজ থেকে পড়াই স্বাভাবিক।'

গোয়েন্দাদের নিয়ে নিচে নেমে এল জ্যাক। তার কাছ থেকে বিদায় নেবার আগে কিশোর বলল, 'অনেক ধন্যবাদ আপনাকে, সার্জেন্ট হুবার্ট। অনেক বিরক্ত করলাম।'

'না না বিরক্ত কিসের। তোমাদের সঙ্গে কথা বলতে বরং ভালই লেগেছে আমার।'

কেবিন থেকে বেরিয়ে মুসা জিজ্ঞেস করল, 'বাড়ি যাব, নাকি আর কোন কাজ আছে?'

'না, আর কি কাজ,' অন্যমনস্ক ভঙ্গিতে বলল কিশোর। 'চলো।'

গাড়ির দিকে এগোল তিনজনে।

চলতে চলতে হঠাৎ থমকে দাঁড়াল রবিন। কিশোরের হাত খামচে ধরে বলল, 'ওই দেখো! বোধহয় ওই লোকটাই!'

কিশোর আর মুসাও দেখল, একটা গিরিখাতে দাঁড়িয়ে উবু হয়ে কি যেন দেখছে লম্বা একজন লোক। কারুরই কোন সন্দেহ রইল না এই লোকই কামান খুঁজতে এসেছে।

সোজা হয়ে দাঁড়াল আবার লোকটা। হনহন করে হাঁটতে শুরু করল।

'নিশ্চয় আমাদের কথা শুনে গেছে! পালাচ্ছে!' মুসা বলল।

'জলদি চলো!' প্রায় দৌড়াতে শুরু করল কিশোর। 'ওকে ধরতে হবে!'

খাতের পাড়ে লম্বা ঘাসের ভেতরে ঢুকে গেল লোকটা। মাথাটা কেবল দেখা যাচ্ছে।

'ডাকব নাকি?' লম্বা লম্বা পা ফেলে কিশোরের পাশ কাটানোর সময় বলল মুসা।

'না। আমাদের সঙ্গে কথা বলার ইচ্ছে না থাকলে দৌড়ে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করবে।'

না দেখে হাঁটতে গিয়ে আচমকা একটা গর্তে পা পড়ে গেল রবিনের। গোড়ালি গেল মুচড়ে। আঁউ করে উঠল ব্যথায়। বসে পড়ল সে।

ওর পাশে বসে পড়তে বাধ্য হলো মুসা আর কিশোরও। টেনেটুনে দাঁড় করাল ওকে দুজনে। কিন্তু পায়ে ভর দিতে পারছে না রবিন। দিতে গেলেই উফ্ করে উঠছে ব্যথায়। শেষে দুজনের কাঁধে ভর রেখে খোঁড়াতে খোঁড়াতে এগোল।

সামনে তাকিয়ে দেখা গেল, লোকটা নেই, পাহাড়ের একটা বাঁকের ওপাশে অদৃশ্য হয়েছে

নিজের ওপর রাগ করে বলল রবিন, 'দূর! পা মচকানোর আর সময় পেল না! এক কাজ করো, আমাকে এখানে ফেলে রেখেই দৌড় দাও। ধরোগে আগে ওকে।'

কথাটা মন্দ বলেনি ও। যাবে কি যাবে না দ্বিধা করছে মুসা আর কিশোর, এই সময় আবার দেখা গেল লোকটাকে। বেরিয়ে এসেছে বাঁকের এপাশে। তারমানে ওদের দেখে পালানোর চেষ্টা করেনি সে, এদিকে ঘোরাফেরা করে কোন একটা জিনিস খুঁজছে। নিশ্চয় কামানটা কোথায় ছিল বোঝার চেষ্টা করছে। চোখ পড়ল গোয়েন্দাদের ওপর। থমকে দাঁড়াল একটা মুহূর্ত। তারপর ওদের অবাক করে দিয়ে এগিয়ে আসতে লাগল এদিকেই।

আরেকটু কাছে আসতেই চিনে ফেলল মুসা, 'খাইছে! আরি, এ তো সেই লোক, সেদিন আমাদেরকে ফলো করেছিল যে!'

কিশোর আর রবিনও চিনতে পারল, সেই লোকটাই। বয়েস সাতাশ-আটাশের বেশি না। বাদামী চুল, সবুজ চোখ।

কাছে এসে দাঁড়াল লোকটা। 'কি হয়েছে? পায়ে ব্যথা পেয়েছ নাকি?'

'হ্যাঁ,' জবাব দিল কিশোর, 'পা মচকে ফেলেছে।'

সেদিন ফলো করাতেই বোধহয় লোকটার ওপর রেগে আছে মুসা, কড়া গলায় জিজ্ঞেস করল, 'আপনি এখানে কি করছেন?'

ভুরু কোঁচকাল লোকটা। 'কি করছি মানে? এটা কি প্রাইভেট জায়গা নাকি?'

'না, তা বলছি না...'

'তাহলে? যে কেউ আসতে পারে এখানে। আমিও এসেছি। একটা কামান খুঁজতে।'

'সেসব জানি,' আরও রুক্ষ হয়ে গেল মুসার কণ্ঠ, 'সেদিন আমাদের পিছু

নিয়েছিলেন কেন?'

হেসে ফেলল লোকটা, 'ও তাই বলো। এজন্যেই এত রাগ।' হাত বাড়িয়ে দিল, 'আমার নাম হেগ ব্রাইটন। তোমাদের পিছু নিয়েছিলাম ভুল করে। তোমাদের নয়, আসলে গাড়িটার পিছু নিয়েছিলাম। আমার এক পরিচিত লোক, তার ওরকম একটা জেলপি গাড়ি আছে। পরে যখন দেখলাম, ওটা নয়, চলে গেলাম।'

কথাটা কতখানি বিশ্বাস করল মুসা, বোঝা গেল না, তবে চুপ হয়ে গেল। আর কোন প্রশ্ন খুঁজে পেল না।

'আমি কোন সাহায্য করতে পারি তোমাদের?' জিজ্ঞেস করল হেগ।

'না, থ্যাংক ইউ,' জবাব দিল কিশোর, 'আমাদের গাড়ি আছে। দুজনে ধরাধরি করে রবিনকে গাড়ির কাছে নিয়ে যেতে পারব।' সামান্য দ্বিধা করে বলল, 'তবে একটা প্রশ্নের জবাব পেলে খুশি হব—ডেমিকালভেরিন কামান খুঁজছেন কেন?'

'থিসিস করব,' এমন করে বলল কথাটা হেগ, সন্দেহ না কমে আরও বাড়ল গোয়েন্দাদের। আর একটাও কথা না বলে ঘুরে হাঁটতে শুরু করল যেদিক থেকে এসেছে সেদিকে। হারিয়ে গেল বাঁকের ওপাশে।

তেরো

পরদিন আবার কামান খুঁজতে বেরোনোর আগে হ্যামারের সঙ্গে দেখা করতে যাওয়ার প্রস্তাব দিল কিশোর। 'সে আর হেগ দুজনেই যখন ডেমিকালভেরিনটা খুঁজছে দেখতে চাই দুজনের মধ্যে যোগাযোগ আছে কিনা।'

'চলো,' রবিন বলল। পায়ের ব্যথা সেরে গেছে ওর। 'তবে তার আগে আমার মনে হয় মোটেলে ও আছে কিনা দেখে নেয়া দরকার। না থাকলে অহেতুক ঘুরে আসব।'

'ঠিক।' ফোন করল কিশোর। পাওয়া গেল হ্যামারকে। ওরা আসতে চায় শুনে বলল মোটেলেই থাকবে সে। বেরোবে না।

হ্যামারের সঙ্গে দেখা করে জানাল কিশোর, আগের দিন তদন্তে কতটা উন্নতি হয়েছে। গানারস পিকটার কথাও বলল ওকে।

হাসিমুখে হ্যামার বলল, 'বাহ্, ভালই তো অগ্রগতি হচ্ছে। চালিয়ে যাও। দেখো, কত তাড়াতাড়ি বের করতে পারো কামানটা।'

আসল কথাটা জিজ্ঞেস করল কিশোর, 'আচ্ছা, হেগ ব্রাইটন নামে কাউকে চেনেন আপনি?'

প্রচণ্ড এক ধাক্কা খেল যেন হ্যামার। লাল হয়ে গেল মুখ। 'ব্রাইটন! চিনি। ও লোক ভাল না। নিজেকে নেভির লোক বলে পরিচয় দেয়। অথচ প্রতারণার দায়ে পুলিশ ওকে খুঁজছে।'

'তাই নাকি?'

'হ্যাঁ। তোমাদের সঙ্গে দেখা হলো কি করে?'

সব কথা খুলে বলল কিশোর।

বাধা না দিয়ে চুপচাপ শুনল হ্যামার। কিশোরের কথা শেষ হলে বলল, 'খবরদার, ওর কাছে কোন তথ্য ফাঁস কোরো না। মনে হচ্ছে, এই লোকই আমার শত্রু।'

'হতে পারে, দুজনে একই জিনিস খুঁজে বেড়াচ্ছেন যখন। তা আপনার সঙ্গে ওর পরিচয় কিভাবে?'

হাসল হ্যামার। 'তোমাদের সঙ্গে যেভাবে পরিচয় হয়েছে ওর। একদিন পাহাড়ে দেখা। ভাবল, আমিও বুঝি কিছু খুঁজতে গেছি ওখানে। কথায় কথায় কামানের কথা তুলল। জিজ্ঞেস করল আমি কিছু জানি কিনা।'

এই গল্প বিশ্বাস করল না কিশোর। 'ও যে লোক খারাপ, জানলেন কি করে?'

'পুলিশ ডিপার্টমেন্টে লোক আছে আমার—বন্ধু। যেহেতু কামান খুঁজছে, আগ্রহী হলাম ওর ব্যাপারে, কায়দা করে খোঁজ-খবর নিলাম বন্ধুর কাছে।'

'ধরিয়ে দিলেন না কেন?'

'ওকে পাব কোথায়?'

'বলতে পারতেন ওর সঙ্গে দেখা হয়েছে।'

'কে যায় ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়াতে। ঝামেলা ভাল লাগে না। পুলিশের কাজ পুলিশ করুক। তবে এ অঞ্চলে এসে হাজির যখন হয়েছে, ধরা সে একদিন না একদিন পড়বেই। আমার তো ধারণা কাটলাসগুলোও সেই চুরি করেছে।'

'কাটলাস!' সঙ্গে সঙ্গে কথাটা ধরল কিশোর, 'কোন কাটলাস?'

থমকে গেল হ্যামার। বোধহয় মুখ ফসকে বলে ফেলেছে কথাটা। 'কেন, পত্রিকায় পড়োনি? হিসটরিকাল সোসাইটি থেকে চুরি গেছে যেগুলো?'

'হেগ কাটলাস চুরি করতে যাবে কেন?'

কাশি দিয়ে গলা পরিষ্কার করল হ্যামার। 'যাবে, তার কারণ, ওগুলোর ব্যাপারেও সে আগ্রহী। অ্যানটিকে আমার আকর্ষণ আছে জেনে জিজ্ঞেস করছিল, আমার কাছে কোন পুরানো কাটলাস আছে কিনা।'

'কি বললেন?'

'কি আর বলব, নেই।'

দীর্ঘ একটা মুহূর্ত হ্যামারের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল কিশোর। আপাতত আর কোন প্রশ্ন নেই। 'ঠিক আছে, উঠি এখন।'

হ্যামারের ঘর থেকে বেরিয়ে এল তিন গোয়েন্দা।

রকি বীচে ফেরার সময় রবিন বলল, 'কেমন ঘোলাটে হয়ে উঠেছে কেসটা। আসলে যে কি খুঁজে বেড়াচ্ছে ওরা, বুঝতে পারছি না। কামানের সঙ্গে কাটলাস এসে যুক্ত হলো কিভাবে?'

'আমার মনে হয় খানিকটা আন্দাজ করতে পারছি,' কিশোর বলল।

'কি?'

'কামান, কাটলাস, জলদস্যুদের কাহিনী। সব কিছু একটা দিকেই নির্দেশ করছে…'

সামনের সীট থেকে সব শুনতে পাচ্ছে মুসা, বলে উঠল, 'গুপ্তধন!'

'হ্যাঁ, গুপ্তধন। অ্যানটিক-ফ্যানটিক বাজে কথা, আসলে গুপ্তধন খুঁজছে ওরা।'

'তাহলে কামান খুঁজছে কেন? কামানের মধ্যে ভরা আছে গুপ্তধনগুলো?'

'থাকতেও পারে।'

'হেই কিশোর, একটা কাজ কিন্তু করতে পারি,' মুসা বলল। 'আমার মেটাল ডিটেক্টরটা নিয়ে পাইরেটস হিলে গিয়ে খোঁজ করতে পারি।'

'তা পারি। তবে তাতে কতটুকু কাজ হবে কে জানে। পুরো পাহাড় খুঁজে দেখতে হবে।'

'যতটা পারি দেখব, দোষ কি? ওই ডিটেক্টর দিয়েই তো বলতে গেলে আরেকটা কেসের সমাধান করলাম আমরা,' ব্ল্যাকহোল কেভে গিয়ে গুপ্তচরদের ষড়যন্ত্র ফাঁস করার কথা মনে করিয়ে দিল মুসা। কেসটার ওরা নাম দিয়েছে 'গুপ্তচর শিকারি'।

ইয়ার্ডে ফিরে এল ওরা। গাড়ি রেখে ওঅর্কশপে ঢুকল। ঠিক হলো, দুপুরের খাওয়া খেয়ে মুসার মেটাল ডিটেক্টরটা নিয়ে পাইরেটস হিলে যাবে।

রবিন আর কিশোরকে রেখে বাড়ি যেতে তৈরি হলো মুসা, এই সময় বাজল টেলিফোন।

রিসিভার তুলল কিশোর।

হ্যারি বোগার্ট নামে একজন লোক দেখা করতে চায় তিন গোয়েন্দার সঙ্গে। চলে আসতে বলল কিশোর। কিন্তু লোকটা বলল, সে আসতে পারবে না, অসুবিধে আছে, দয়া করে যদি গোয়েন্দারা তার হোটেলে যায় তো খুশি হবে। গেলে গোয়েন্দাদেরও লাভ—কারণ কামানটার ব্যাপারে কথা বলতে আগ্রহী সে।

সুতরাং আর দ্বিরুক্তি করল না কিশোর। রাজি হয়ে গেল। মুসারও বাড়ি যাওয়া হলো না। আবার বেরোল তিনজনে। বেশিদূর যাওয়া লাগবে না। রকি বীচেরই একটা হোটেলের ঠিকানা দিয়েছে হ্যারি।

হোটেলটা খুঁজে বের করতে সময় লাগল না। কার পার্কে গাড়ি রেখে লিফটে করে তিন তলায় উঠে এল তিন গোয়েন্দা। ঘরের দরজায় কয়েকবার টোকা দেয়ার পর ভেতরে তালা খোলার শব্দ হলো। খুলে গেল পাল্লা। দরজায় দাঁড়ানো লোকটাকে দেখে চমকে গেল। আর যেই হোক, একে আশা করেনি।

হেগ ব্রাইটন!

'এসো,' একপাশে সরে ঘরে ঢোকার জায়গা করে দিল সে। 'আমিই ফোন করেছিলাম তোমাদের।'

'অন্য নাম বলার কি কারণ?' জানতে চাইল কিশোর।

'ভেতরে এসো, বলছি সব।'

রবিন আর মুসার দিকে তাকাল কিশোর। দ্বিধা করতে লাগল।

তিন গোয়েন্দা সোফায় বসলে কোটের পকেট থেকে ওয়ালেট বের করল সে। একটুকরো কাগজ আর একটা কার্ড বের করল তা থেকে। বাড়িয়ে দিল কিশোরের দিকে। 'এই কাগজটা আমার নেভি থেকে অবসর দেয়ার চিঠি, আর এটা নেভাল আইডেন্টিফিকেশন কার্ড।'

দেখার জন্যে ঝুঁকে এল রবিন আর মুসা। কার্ডটাতে ছোট একটা ফটোগ্রাফ

সাঁটানো, নেভির ইউনিফর্ম পরা একজন মানুষের ছবি, স্পষ্ট চেনা যাচ্ছে হেগকে। ভাল করে পরীক্ষা করল কিশোর। বোঝার চেষ্টা করল এর মধ্যে কোন জালিয়াতি আছে কিনা।

না, নেই। কার্ডটা হেগকে ফিরিয়ে দিয়ে চিঠিটা পড়ল কিশোর। দুবছর আগে আমেরিকান নেভি থেকে অনারেবল ডিসচার্জ করা হয়েছে হেগকে।

'আর কোন সন্দেহ আছে?' তিন গোয়েন্দার দিকে তাকাতে লাগল হেগ।

প্রশ্নটা এড়িয়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করল কিশোর, 'আপনার আসল নাম তো দেখা যাচ্ছে হেগ ব্রাইটনই, হ্যারি বোগার্ট বনলেন কেন?'

'রকি বীচে আমার কিছু শত্রু তৈরি হয়েছে, তারা আমার ক্ষতি করার চেষ্টায় আছে, সেজন্যে লুকিয়ে থাকার সুবিধে হবে ভেবে একটা ছদ্মনাম ব্যবহার করছি।'

'তাতে কোন লাভ হচ্ছে? শত্রুদের ফাঁকি দিতে পারছেন?'

'বুঝতে পারছি না। তোমাদের সঙ্গে ইয়ার্ডে দেখা করতে যাইনি ওদের চোখে পড়ে যাবার ভয়ে। যতটা সম্ভব লুকিয়ে থাকতে চাই।'

'বুঝলাম। জরুরী কথাটা এখন বলে ফেলুন। কি জন্যে ডেকেছেন?'

'সেদিন পাহাড়ে দেখা হওয়ার পর তোমাদের ব্যাপারে ভালমত খোঁজ নিয়েছি আমি। বুঝেছি তোমাদের ওপর নির্ভর করা যায়। আমার একটা কাজ করে দিতে হবে।'

'কিন্তু এখন তো পারব না। আমরা আরেকটা কেস নিয়ে ব্যস্ত।'

নিরাশ মনে হলো হেগকে। 'তোমাদের সাহায্য আমার বড় দরকার ছিল! পরিচয়টা আরও আগে হলে আরও আগেই সাহায্য চাইতাম।'

মুসা আর রবিনের দিকে তাকাল একবার কিশোর। চোখ দেখেই বোঝা গেল, হেগ যা বলতে চায় ওরাও শুনতে আগ্রহী। হেগের দিকে ফিরল সে, 'ঠিক আছে, বলুন আগে আপনার সমস্যার কথা, তারপর দেখা যাবে।'

ওরা ভেবেছিল, পাইরেটস হিলে কামান খোঁজার ব্যাপারে ওদের সাহায্য চাইবে হেগ, কিন্তু ওদেরকে অবাক করে দিয়ে বলল, 'কয়েকটা কাটলাস খুঁজছি আমি। আমাকে সেগুলো খুঁজে বের করে দিতে হবে।'

'কাটলাস!'

'হ্যাঁ, হিসটরিকাল সোসাইটি থেকে চুরি গেছে যেগুলো।'

'চোরাই মাল দিয়ে আপনি কি করবেন?'

'যাই করি না কেন, আগে ওগুলো খুঁজে বের করো, তারপরে বলব।'

'খুঁজে বের করলেও আপনাকে দেব কেন? ওগুলোর মালিক আপনি নন।'

'সবই বলব তোমাদের। আগে ওগুলো খুঁজে বের করে নিয়ে এসো, তারপর। এর জন্যে উপযুক্ত পারিশ্রমিক পাবে। কথা দিচ্ছি, মাত্র চব্বিশ ঘণ্টা আমার কাছে রাখব জিনিসগুলো, তারপর যার জিনিস তাকে, অর্থাৎ হিসটরিকাল সোসাইটিকে ফেরত দেব।'

'আশ্চর্য এক অনুরোধ করছেন আপনি!'

'এখন তাই মনে হচ্ছে বটে তোমাদের, তবে সব কথা শোনার পর আর সেরকম লাগবে না।…তাহলে কথা দিচ্ছ, জিনিসগুলো খুঁজবে তোমরা?'

'এখনই কিছু বলতে পারছি না, ভেবে দেখি। কোথায় পাওয়া যেতে পারে কোন সূত্র দিতে পারেন?'

'না। তাহলে তো আমিই বের করে আনতাম।'

'হুঁ,' মাথা দোলাল কিশোর। দুই সহকারীর দিকে তাকাল, 'চলো, যাই।'

নিচে নেমে গাড়িতে ওঠার আগে আর কোন কথা বলল না তিনজনের কেউ।

উঠেই বলল রবিন, 'কেমন মনে হলো লোকটাকে?'

কিশোর বলল, 'রহস্যময়। নেভি ডিপার্টমেন্টের সঙ্গে যোগাযোগ করে খোঁজ নিতে হবে ডিসচার্জের পর থেকে কি কাজ করছে হেগ।'

'আমার তো মনে হলো একটা ভণ্ড,' মুসা বলল।

'আমার সেরকম মনে হয়নি, তবে কোথায় যেন একটা গোলমাল আছে,' কিশোর বলল। 'হ্যামার, হেগ, দুজনেই রহস্যময় আচরণ করছে।'

'কোথায় যাব?' জিজ্ঞেস করল মুসা।

'যাও, বাড়িই যাও। একটা পাবলিক ফোন বুদের সামনে রেখো একটু।'

গাড়ি ছাড়ল মুসা।

কিশোরের দিকে তাকাল রবিন, 'নেভিকে ফোন করে কি আসলে কোন লাভ হবে?'

'দেখা যাক। তবে অতটা আশা করছি না আমি।'

নেভির অফিসে ফোন করল কিশোর। অ্যাটেনডেন্ট লোকটা খুব ভদ্রভাবে জবাব দিল বটে, তবে সব প্রশ্নের জবাবেরই একটা অর্থ, না। যেমন, 'কোন্ লোককে বরখাস্ত করা হয়েছে সেটা জানতে হলে অনেক সময় লাগবে আমাদের। কয়েক হপ্তা তো বটেই।'

তাকে ধন্যবাদ জানিয়ে ফোন রেখে দিল কিশোর। রবিনের দিকে ফিরে বলল, 'লাভ হলো না।'

চোদ্দ

পরদিন সকাল সাতটা না বাজতেই মেটাল ডিটেক্টর নিয়ে ইয়ার্ডে এসে হাজির হলো মুসা। আসার সময় বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে এসেছে রবিনকে।

কিশোর বসে আছে ওঅর্কশপে, দুজনের অপেক্ষায়।

একটা টুলে বসে পড়ল মুসা। 'কিশোর, একটা কথা ভাবছি, গাড়িতে করে গেলে পাহাড়ের গোড়ায় অনেক জায়গায় যেতে অসুবিধে, বিশেষ করে সাগরের দিকটায়। হেঁটে ঢোকা কঠিন ওসব জায়গায়। একটা বোট নিয়ে গেলে কেমন হয়? সাগরের দিক দিয়ে ঢোকা সহজ হবে।'

'মন্দ বলোনি,' মুসার সঙ্গে একমত হলো কিশোর, 'চলো, তাই করা যাক।'

জেটিতে এসে একটা বোট ভাড়া করল ওরা। পাইরেটস হিলে রওনা হলো। আকাশের অবস্থা ভাল না। কেমন মুখ গোমড়া করে আছে। সাগরে বড় বড় ঢেউ। তবে তাতে বোট চালাতে অসুবিধে হলো না।

পাইরেটস হিলে পৌঁছে দেখা গেল, বোট এনে ভালই করেছে। যে সব জায়গায় এর আগে শুকনো দেখে গেছে, হেঁটে ঢোকা যেত, সেখানে ঢেউ আছড়ে পড়ছে। ফেনায় সাদা হয়ে গেছে। পাহাড়ের গোড়ার পাথরগুলো বেশির ভাগই ডোবা, খাঁজে খাঁজে পানি ঢুকে গেছে।

একটা খাঁড়িতে বোট ঢুকিয়ে দিল মুসা। তিনদিকে পাহাড় থাকায় এখানে ঢেউয়ের দাপট কম। এক চিলতে বালির সৈকত আছে, তাতে পানি পৌঁছেনি এখনও। টেনেটুনে বোটটা ওখানে তুলে রেখে ঢাল বেয়ে পাহাড়ে উঠে পড়ল ওরা। পাহাড়ের ঢাল, শুকনো খানাখন্দ, সৈকত, পাথরের খাঁজে খুঁজতে শুরু করল।

দুপুর একটায় সঙ্গে করে নিয়ে আসা স্যাণ্ডউইচ খেতে বসল ওরা পাহাড়ের ছায়ায়। এলাকাটা একেবারে নির্জন। তা ছাড়া ভাটার সময়, পানিতে নামা বিপজ্জনক বলে কেউ আসছে না এখন। ভালই হলো ওদের জন্যে। মানুষ থাকলে বিরক্ত করত।

খাওয়ার পর আবার খোঁজা শুরু করল ওরা। অনেক জায়গার পানি নেমে গেছে ভাটার টানে। সেসব জায়গায়ও খুঁজল। মাঝে মাঝেই কড়কড় করে ওঠে মেটাল ডিটেক্টর। মাটি খুঁড়লে বেরিয়ে পড়ে কোন না কোন ধাতব জিনিস। সবই বাতিল, ফালতু। এই যেমন সস্তা আঙটি বা মেয়েদের অন্য কোন গহনা, তামাকের টিন, চাবির রিঙ। বড় জিনিস বলতে একটা মরচে পড়া ছোট নোঙর পাওয়া গেল—একটা মাথা ভাঙা, কোন জেলে নৌকার হবে।

'স্যালভিজ ইয়ার্ডে রাখারও যোগ্য না এগুলো,' বিরক্ত হয়ে বলল মুসা।

'সোনার মোহর আশা করেছিলে নাকি,' হেসে বলল রবিন।

'কামান না পাওয়া যাক, একটা কামানের আঙটা পেলেও তো হত।'

বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত খুঁজে বেড়াল ওরা। আরও হয়তো খুঁজত, কিন্তু খারাপ হয়ে গেল মেটাল ডিটেক্টর। মুসা বলল, কোথাও শর্ট সার্কিট হয়ে থাকতে পারে। মেরামত না করলে এটা দিয়ে আর কাজ হবে না। অতএব ফিরে যাওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই।

'এ ভাবে খুঁজে অবশ্য লাভও হবে না,' বালিতেই বসে পড়ল কিশোর। 'সারা বছর ধরে খুঁজলেও পুরো এলাকা দেখে শেষ করতে পারব না। সূত্র দরকার। ঠিক কোনখানে ছিল কামানটা, কোথায় পড়েছে জানা দরকার।'

'কে দিতে পারবে সেখবর?' মুসার প্রশ্ন।

'তা জানি না।'

আপাতত আর কিছু করার নেই। বাড়ি ফিরে চলল ওরা।

পরদিন সকালে ঘুম ভাঙতেই জানালায় বৃষ্টির আওয়াজ শুনতে পেল কিশোর। মুষলধারে বৃষ্টি হচ্ছে। নিচে নামতেই রবিনের ফোন পেল।

'সাগরের এত দাপাদাপি ছিল কাল এ জন্যেই,' বলল সে। 'ঝড় আসছে। তো, আজ কি কোথাও বেরোবে নাকি? নাহলে আমি লাইব্রেরিতে চললাম।'

'না, যেয়ো না, চলে এসো এখানে,' কিশোর বলল। 'মুসাকে একটা ফোন করো, ওকে নিয়ে আসো। পাইরেটস হিলে তো যেতে পারব না, ভাবছি চোরাই কাটলাসগুলোর ব্যাপারে খানিকটা খোঁজখবর করব। হেগ বেচারাকে একেবারে

হতাশ করতে চাই না।'

'হারানো কামানের সঙ্গে কোন যোগাযোগ আছে ভাবছ নাকি?'

'থাকতে পারে।'

নাস্তা না করেই চলে এল রবিন আর কিশোর। তিনজনে একসঙ্গে খাওয়া সেরে বেরোল।

'কিউরিও শপগুলোতে খোঁজ নেব,' কিশোর বলল। 'সাধারণ চোর হলে এতক্ষণে কোথাও বিক্রি করে দিয়েছে চোর মিয়া।'

প্রথম যে দোকানটা পড়ল, তার সামনেই গাড়ি রাখল মুসা। এখনও বেশি সকাল, কিংবা বৃষ্টিবাদলার দিন বলে দোকান খোলেনি দোকানি। বাস করে দোকানের পেছনে একটা দুই কামরার ঘর। দরজার সামনে দাঁড়িয়ে দুবার বেল পুশ টিপল কিশোর।

'কে?' বলে সাড়া পাওয়া গেল বটে ভেতর থেকে, দরজা খুলতে সময় লাগল। লোকটার চোয়ালে সাবানের ফেনা লেগে আছে, শেভ করছিল।

'এসো,' সরে জায়গা করে দিল সে। 'বেশি সকালে চলে এসেছ। এত সকালে তো খুলি না। এসো, এদিক দিয়ে দোকানে ঢুকতে পারবে।'

ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগল তিন গোয়েন্দা। দেয়ালে ঝোলানো একটা গাদা বন্দুকের সামনে দাঁড়িয়ে ফিসফিস করে কিশোর বলল, 'প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র আছে এখানে। তবে সবই মনে হচ্ছে নকল। আসলগুলোর আদলে বানানো।'

'চলো, কেটে পড়ি,' মুসা বলল, 'অহেতুক সময় নষ্ট করছি।'

আস্তেই কথা বলছে ওরা, তবু শুনে ফেলল দোকানি। দৌড়ে এল সে। বলতে লাগল, অনেক কিছুই দেখা বাকি আছে এখনও ওদের। সব না দেখে না বেরোতে অনুরোধ করল।

কিশোর বলল, 'অ্যানটিক কাটলাস খুঁজছি আমরা। আছে আপনার কাছে? পুরানো?'

'পুরানো বা নতুনে কি এসে যায়?' বোঝানোর চেষ্টা করল দোকানি। 'কাজ করা দিয়ে কথা। কাটলাস চাও তো? চাইলে আমি তোমাদেরকে তলোয়ারও দিতে পারি। ভাড়া চাও, নাকি কিনবে?'

মুসার হয়ে গেল রাগ। লোকটা ওদের ছাগল পেয়েছে নাকি, যা খুশি গছাতে চায়? বলে ফেলল, 'তলোয়ারের সঙ্গে একটা আরবী ঘোড়া দিতে পারেন না? বেদুইন সর্দার হয়ে যাব।'

থমকে গেল দোকানি। মুসার রাগের কারণ বুঝতে পারছে না যেন।

এই সকাল বেলা অহেতুক লোকটাকে দুঃখ দিতে চাইল না কিশোর, তাড়াতাড়ি বলল, 'তলোয়ার নয়, কাটলাসই দরকার আমাদের, এবং পুরানো। সোজা কথা, অ্যানটিক। নকল জিনিসে চলবে না।'

হতাশ ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল দোকানি। বলল, 'নামঠিকানা রেখে যাও। হাতে পড়লে খবর দেব।'

বেরিয়ে এল তিন গোয়েন্দা। আরেকটা দোকানে চলল।

গোটা তিনেক দোকান দেখার পর গাড়িতে উঠে রবিন বলল, 'এ সব জায়গায়

খুঁজে হবে না। আমার পরিচিত একটা দোকান আছে, মালিকের নাম ডেলামোর হেভেনফোর্থ। ওখানে চলো। তার নিজের কাছে না থাকলে অন্য কোন দোকানে থেকে থাকলেও খোঁজ দিতে পারবে। এখানে কোন অ্যানটিক শপে কি আছে না আছে সব ওর মুখস্থ।'

'কি নাম বললে?' জিজ্ঞেস করল মুসা।

'ডেলামোর হেভেনফোর্থ।'

'বাপরে, নাম কি! দিনে শ'খানেক বার কেউ ওই নাম আউড়ালে দম ফুরিয়ে ভিরমি খাবে। দোকানের নামটা কি?'

হেসে ফেলল রবিন, 'নাম মনে নেই। এগোও, আমি রাস্তা বলে দিচ্ছি।'

পনেরো

'হ্যাঁ, আমার কাছে কাটলাস আছে,' মিস্টার ডেলামোর হেভেনফোর্থ বলল। চশমার পুরু বাইফোকাল গ্লাসের ভেতর দিয়ে গোয়েন্দাদের দিকে তাকিয়ে আছে কৌতূহলী একজোড়া চোখ। 'কাটলাস কি দরকার পড়ল তোমাদের বুঝলাম না। মনে হচ্ছে ইদানীং এ সবের কদর বেড়েছে। ম্যাক ওয়াকার নামে একটা ছেলে সেদিন পাঁচটা কাটলাস বিক্রি করে গেল। বলল, ওদের পারিবারিক জিনিস। টাকার নাকি খুব দরকার, তাই বিক্রি করছে।'

'চেনেন ওকে? রকি বীচের কেউ?' জানতে চাইল রবিন।

'চিনি। রকি বীচেরই ছেলে। আমার এখানে বেশ কিছুদিন সেলসম্যানের কাজ করেছে। অ্যানটিক চেনে। পঞ্চাশ ডলার করে দাম চাইল একেকটা কাটলাসের। টাকার খুব ঠেকা বলল, তাই দিয়ে দিলাম। তবে জিনিসগুলো ভাল ছিল।'

'ছিল মানে, এখন নেই নাকি?' হৃৎপিণ্ডের গতি দ্রুত হয়ে গেল কিশোরের।

'না, বিক্রি হয়ে গেছে। ছেলেটা বিক্রি করে যাওয়ার খানিক পরেই একটা লোক এসে হাজির, গায়ে কালো জ্যাকেট ছিল লোকটার, সব কটা কাটলাস কিনে নিয়ে চলে গেল।'

একে অন্যের দিকে তাকাল তিন গোয়েন্দা। লোকটা কে অনুমান করতে পারল—নিশ্চয় বার্ড। সোসাইটি থেকে জিনিসগুলো চুরি করেছে ম্যাক, দোকানে এনে বিক্রি করে দিয়ে গেছে, কোনভাবে খোঁজ পেয়ে তড়িঘড়ি এসে সেগুলো কিনে নিয়ে গেছে বার্ড। কিন্তু কেন?

ওদের আগ্রহ আঁচ করতে পেরে হেভেনফোর্থ বলল, 'শুধু তাই না, কাল বিকেলে আমি যখন দোকান বন্ধ করছি, আরেক লোক এসে হাজির, বলে কাটলাস চাই। দোকানে যেগুলো আছে, দেখালাম, পছন্দ হলো না। যে রকম বর্ণনা দিল তাতে বুঝলাম ম্যাক যে জিনিস এনেছে সে-জিনিস চায়। তোমরাও ওকরমই চাও না তো?'

'হ্যাঁ, ওরকমই চাই,' জবাব দিল রবিন। 'আরও সহজ করে বলতে গেলে ঠিক ওই জিনিসগুলোই।'

'পরে যে লোকটা এসেছিল তার নাম জানেন?' জিজ্ঞেস করল কিশোর।

'না। চিনি না ওকে।'

ম্যাক কোথায় থাকে জেনে নিয়ে, হেভেনফোর্থকে ধন্যবাদ দিয়ে দোকান থেকে বেরিয়ে এল গোয়েন্দারা। প্রবল বৃষ্টির মধ্যে ওর বাড়ি খুঁজে বের করল। শহরতলিতে এক পুরানো বাড়িতে নানা-নানীর সঙ্গে থাকে। এতিম, বাবা-মা কেউ নেই, বহুদিন আগেই মরে গেছে। কাঁদো কাঁদো হয়ে তার নানী জানাল, এক হপ্তা ধরে আসে না ম্যাক। কোন খোঁজও নেই।

'টাকা রোজগারের জন্যে প্রচুর খাটাখাটনি করে ছেলেটা, বৃদ্ধা বলল। 'দিনরাত বাইরে বাইরেই কাটায়। কিন্তু এ ভাবে এতদিন খবর না দিয়ে আর থাকেনি কখনও।'

'পুলিশকে জানিয়েছেন?' জানতে চাইল কিশোর।

'না, পুলিশকে জানাব কেন, নিখোঁজ তো আর নয়। দিন সাতেক আগে ফোন করে জানিয়েছে, একটা চাকরি পেয়েছে সে, সেজন্যে আসতে পারছে না, আমরা যাতে চিন্তা না করি। বেতন পেয়েই চলে আসবে। অনেকদিন দেখি না তো, কষ্ট হচ্ছে,' হঠাৎ তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল বৃদ্ধার দৃষ্টি, 'কিন্তু তোমরা কে? এত প্রশ্ন করছ কেন? ম্যাক কোন বিপদে পড়েনি তো?'

'বলতে পারব না। আচ্ছা, কাটলাসগুলো যে বিক্রি করতে নিয়ে গেছে ম্যাক, আপনি জানেন কিছু?'

'কাটলাস! মানে তলোয়ার জাতীয় কিছু?'

'কেন, আপনি জানেন না? আপনাদের পারিবারিক জিনিস...'

ভয় ফুটল বৃদ্ধার চেহারায়। 'না না, আমাদের পারিবারিক জিনিস হতে যাবে কেন? ওসব ছুরি-তলোয়ার কোন কিছুই ছিল না আমাদের কোনকালে। তুমি ভুল করছ।'

'হয়তো,' কথা বাড়িয়ে বৃদ্ধাকে আর আতঙ্কিত করতে চাইল না কিশোর। 'ঠিক আছে, যাই। অনেক ধন্যবাদ আপনাকে।'

ঘর থেকে বেরিয়ে এল তিন গোয়েন্দা। অবাক হয়ে ভাবছে, কোথায় গেল ম্যাক ওয়াকার?

বৃষ্টির বেগ আরও বেড়েছে। মাথা নিচু করে একছুটে এসে পৌঁছল গাড়ির কাছে। সামান্য পথ। কিন্তু ওটুকু আসতেই ভিজে গেল মাথা, পিঠ। পেছনের সীটে ফেলে রাখা তোয়ালে দিয়ে মাথা মুছে নিল তিনজনেই।

মুসা জিজ্ঞেস করল, 'কোথায় যাব?'

'আর তো কোন জায়গা দেখছি না,' চিন্তিত ভঙ্গিতে বৃষ্টির দিকে তাকিয়ে আছে কিশোর। 'বাড়িই যাও। আজ আর কোন কাজ হবে বলে মনে হয় না।'

'যা অবস্থা, এ তো মনে হয় হারিকেন শুরু হবে,' রবিন বলল।

সাবধানে গাড়ি চালাল মুসা। চোখের সামনে সব অস্পষ্ট, কেমন বিকৃত আর ঘোলাটে রূপ নিয়েছে বৃষ্টির কারণে। কাঁচের পানি মুছে সারতে পারছে না উইণ্ডশীল্ড ওয়াইপার, সরতে না সরতে আবার ভিজে যাচ্ছে। সতর্ক থাকা সত্ত্বেও অঘটনটা তাই ঘটেই গেল।

মোড় পেরোচ্ছে মুসা, এই সময় উল্টো দিক থেকে ধেয়ে এল আরেকটা হলুদ রঙের গাড়ি। ধাক্কা বাঁচানোর আপ্রাণ চেষ্টা করল সে। ধাক্কাটা লাগল না বটে, তবে দুর্ঘটনা ঠেকাতে পারল না। ভয়ানক কাদায় পিছলে গিয়ে পাশের একটা খাঁদে পড়ল জেলপি।

প্রচণ্ড ঝাঁকুনি লাগল। দীর্ঘ একটা মুহূর্ত কোথায় আছে বুঝতে পারল না তিনজনের কেউ। পথের পাশের ছোট খাদ, পানি জমে আছে, কাদায় গুঁতো খেয়েছে গাড়ির নাক। বডির ক্ষতি হয়নি, কেবল ইঞ্জিন বন্ধ হয়ে গেছে। গোয়েন্দারাও ব্যথা পায়নি তেমন। ছাতে একটানা ঝমঝম আঘাত হানছে বৃষ্টির বড় বড় ফোঁটা।

ঝাঁকি দিয়ে মাথাটা পরিষ্কার করে নিল মুসা। কি অবস্থায় আছে গাড়িটা, দেখার জন্যে মাথা বের করল। মুহূর্তে ভিজে গেল মাথা, গলা সব। দেখল, সামনের দুটো চাকার একটা পুরোটাই গর্তে পড়েছে, আরেকটার অর্ধেক। অবস্থা খুব খারাপ নয়।

ইঞ্জিন স্টার্ট দিল সে। চাবিতে একবার মোচড় দিতেই গর্জে উঠল জেলপি।

খাদ থেকে গাড়িটাকে টেনে তোলার চেষ্টা শুরু করল মুসা। ইঞ্জিনের বিকট শব্দে মুষলধারে বৃষ্টির শব্দও ঢাকা পড়ে গেল। তবে শেষ পর্যন্ত নিরাশ করল না পুরানো গাড়িটা। ঠিকই নিজেকে টেনে তুলল কাদা থেকে।

রাস্তায় উঠে কয়েক সেকেণ্ড দম নেয়ার জন্যে থামল মুসা। 'উফ্, ভাবছিলাম মরে গেছি!'

'তারমানে বেঁচে আছি এখনও,' শুকনো গলায় বলল রবিন।

জোরে একটা নিঃশ্বাস ফেলল কিশোর। রাগত স্বরে বলল, 'ওই লোকটার লাইসেন্স বাতিল করা উচিত! এমন বেপরোয়া গাড়ি চালায়···মুসা, চাকাটাকাগুলো ঠিক আছে তো?'

'মনে তো হয় আছে।'

'ইচ্ছে করে অমন করল নাকি লোকটা?' সীটে হেলান দিল রবিন। 'হয়তো আমাদের খাদে ফেলে দিয়ে মারতে চেয়েছিল।'

'শত্রুদের কেউ বলছ? তা আরেকটু হলেই সফল হয়ে গিয়েছিল।'

ষোলো

বাড়ি ফিরে একটা মেসেজ পেল কিশোর। মেরিচাচী জানালেন, হেগ ব্রাইটন নামে একটা লোক ফোন করেছিল। ঠিক দুটোর সময় ওদের দেখা করতে অনুরোধ করেছে। সে হোটেলে থাকবে।

'একটার মধ্যে চলে এসো,' মুসাকে বলল কিশোর। 'যাব একবার হেগের কাছে। কাটলাসগুলো কার কাছে আছে বলে আসব। দেরি কোরো না।'

'আচ্ছা।'

রবিন রয়ে গেল। বাড়িতে কোন কাজ নেই, গেলে অহেতুক সময় নষ্ট, কিশোরদের বাড়িতেই খেয়ে নেবে। মুসাকেও ওদের ওখানেই খেতে বলেছিল

কিশোর, কিন্তু থাকতে পারল না সে। বাড়িতে যেতেই হবে। গাড়ির সামনের চাকার অবস্থা ভাল না। বদলাবে বদলাবে করেও বদলানো হয়নি। খাদে পড়ে যে ফাটেনি তখন এই বেশি। ফাটলে ভীষণ বিপদে পড়ে যেত। আর গাফিলতি করতে চায় না, বিশেষ করে এই খারাপ আবহাওয়ায় যখন আবার বেরোতে হবে। কোনখান থেকে কোনখানে যেতে হয়, ঠিক আছে কিছু। বাড়িতে ওদের গ্যারেজে বাড়তি চাকা আছে, বদলে নেবে।

খেয়েদেয়ে তৈরি হয়ে রইল কিশোররা, কিন্তু মুসা আর আসে না। বার বার ঘড়ি দেখতে লাগল ওরা। একটা বাজল···একটা পনেরো···একটা পঁচিশ···

কিশোর বলল, 'নিশ্চয় কিছু হয়েছে ওর।'

'আন্টি আটকে দিয়েছেন হয়তো,' রবিন বলল।

ফোনের দিকে হাত বাড়াল কিশোর। 'দেখি আগে ফোন করে। আটকে দিলে আর কি করা, ওকে রেখেই যেতে হবে আমাদের।' রিসিভার তুলে ডায়াল করতে যাবে এই সময় কানে এল মুসার জেলপির শব্দ। ওঅর্কশপ থেকে বেরিয়ে এল দুজনে। গেটের দিকে ছুটল।

ওদের সামনে এসে ব্রেক কষল মুসা।

দেরি করল কেন জিজ্ঞেস করতে যাচ্ছিল কিশোর, তার আগেই মুসা বলল, 'আর বোলো না, দুটো চাকা বের করলাম, দুটোই বসা। খুলে লিক সেরে লাগাতে লাগাতেই অনেক সময় লাগল। লাগিয়েই ছুট।'

'না খেয়ে এসেছ?'

'না, এক মিনিটে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গপগপ করে যা পেরেছি গিলে নিয়েছি। নাও, উঠে পড়ো, অনেক দেরি হয়ে গেছে।'

'যেতে যেতে দুটোর বেশি বেজে যাবে,' রবিন বলল। 'অতক্ষণ কি অপেক্ষা করবে হেগ?'

'দেখি গিয়ে।'

বৃষ্টি অনেকটা ধরেছে। তবে আকাশের রঙ এখনও কালচে ধূসর। মেঘের কমতি নেই। যে কোন সময় আবার নামবে ঝুপ ঝুপ করে।

বাদলার কারণে রাস্তায় যানবাহনের ভিড় কম। জোরে চালাতে অসুবিধে নেই। ট্রাফিক আইন মেনে যতটা সম্ভব জোরে গাড়ি ছোটাল মুসা।

হঠাৎ ঘ্যাচ করে ব্রেক কষল।

'কি হলো?' পেছন থেকে চিৎকার করে উঠল কিশোর।

দরজা খুলে ফেলেছে ততক্ষণে মুসা। হাত দিয়ে পাশের একটা খাবারের দোকান দেখিয়ে বলল, 'স্যাণ্ডউইচ নিয়ে আসি। আধ মিনিটের বেশি লাগবে না।'

কিন্তু দেড় মিনিট লাগিয়ে দিল সে। একহাতে স্যাণ্ডউইচের প্যাকেট আর আরেক হাতে তিনটে চকলেট বার নিয়ে ফিরল। গাড়িতে উঠে প্যাকেটটা ওর সীটের পাশে রেখে দুটো চকলেট দিল রবিন আর কিশোরকে। তৃতীয়টার মোড়ক খুলে এক কামড়ে প্রায় অর্ধেকটা মুখে পুরে ইঞ্জিন স্টার্ট দিল।

চকলেট কিনতে গিয়ে যে সময় নষ্ট করেছে সেটা পুষিয়ে নেয়ার জন্যেই যেন ঝড়ের গতিতে গাড়ি ছোটাল।

'দেখো, অ্যাক্সিডেন্ট কোরো না,' সাবধান করল কিশোর, 'রাস্তা যেরকম ভিজে আছে।'

দুটো বেজে সতেরো মিনিটে হোটেলে পৌঁছল ওরা। রিসেপশনে ঢুকতেই হাত নেড়ে ওদের ডাকল ক্লার্ক। কাছে গেলে বলল, 'তোমরা তিন গোয়েন্দা?'

মাথা ঝাঁকাল কিশোর, 'হ্যাঁ।'

'তোমাদের জন্যে মেসেজ রেখে গেছেন মিস্টার ব্রাইটন,' একটা খাম বের করে দিল সে।

খাম খুলে ভেতর থেকে একটুকরো কাগজ বের করল কিশোর। তাতে লেখা: তোমাদের দেরি দেখে চলে গেলাম। কাটলাসগুলোর খোঁজ পেয়েছি। আমি পাইরেটস হিলে যাচ্ছি। ওখানে সাগরের পাড়ে বালির ঢিবিতে যে পুরানো পোড়ো ছাউনিটা আছে সম্ভব হলে সেখানে দেখা কোরো আমার সঙ্গে।—হেগ।

রবিন আর মুসাও নোটটা পড়ল। ছাউনিটা ওরা চেনে। রিসেপশন থেকে বেরিয়ে জিজ্ঞেস করল মুসা, 'যাব নাকি?'

'অবশ্যই,' কিশোর বলল।

দ্রুত গাড়ি চালিয়ে পাইরেটস হিলের এমন একটা জায়গায় পৌঁছল ওরা, যেখানে মূল সড়ক থেকে একটা শাখাপথ নেমে গেছে ঢালুতে, ওই পথটা দিয়ে ছাউনিতে যেতে হয়। তাতে গাড়ি নামিয়ে আনল মুসা।

দুপাশের জানালা দিয়ে তাকিয়ে আছে রবিন আর কিশোর। কাঁচা রাস্তা। মাটির চেয়ে বালি বেশি বলে কাদা হয়নি তেমন। দুপাশে পাইনের জঙ্গল। বৃষ্টিতে ভিজে অদ্ভুত চেহারা হয়েছে গাছগুলোর, কেমন অপার্থিব মনে হয় দৃশ্যটা। মাঝে মাঝে রাস্তা এত সরু হয়ে যাচ্ছে, গাছের ডাল এসে বাড়ি লাগছে গাড়ির ছাতে, ভেজা ডাল থেকে পানি ঝুরঝুর করে এসে জানালা দিয়ে ভেতরে পড়ছে।

মাইল দুয়েক আসার পর সামনে একটা ছাউনি দেখা গেল। ডানপাশে, রাস্তা থেকে বেশ অনেকটা দূরে। উঁচুনিচু বালির ঢিবি, গাড়ি নেয়া যাবে না ওটার সামনে, হাঁটতে হবে।

গাড়ি থামাল মুসা।

বেরিয়ে এল তিনজনে। সরু একটা পায়েচলা পথ চলে গেছে ছাউনিটাতে। এগিয়ে চলল ওরা।

দুটো উঁচু বালির ঢিবির মাঝখানে কোনমতে দাঁড়িয়ে আছে অনেক পুরানো একটা ঘর। রোদ-বাতাসের সঙ্গে লড়াই করে বেড়া আর চাল কোনমতে এখনও টিকে থাকলেও একটা পাশ অনেকখানি বসে গেছে বালিতে। যা অবস্থা, ইঁটের বাড়ি হলে কবে ধসে পড়ে যেত।

ভেজা বালিতে জুতো দেবে যাচ্ছে, পরিশ্রম হচ্ছে হাঁটতে। ঝিরঝির করে বৃষ্টি পড়ছে, কণাগুলো ইলশেগুঁড়ির চেয়ে কিছুটা বড়, সাগরের দিক থেকে আসা প্রবল বাতাসের সঙ্গে মিশে এসে বাড়ি খাচ্ছে মুখে।

'এখানে কাটলাস পাবে কোথায় লোকটা?' মুসা বলল।

'হয়তো দেখা করতে বলেছে ওকে বার্ড,' রবিন বলল। 'অনেক দামে বিক্রি করতে চায় ওর কাছে।'

'আমাদের জন্যে ফাঁদ পাতেনি তো কেউ!'
'কি জানি!' ছাউনিটার দিকে চিন্তিত ভঙ্গিতে তাকিয়ে আছে কিশোর। 'হেগ এখানে এসেছে বলে তো মনে হচ্ছে না।'
'কি করে বুঝলে?'
'থাকলে সাড়াশব্দ নেই কেন?'
'ঢুকতে চাও না নাকি?'
'না, এসেছি যখন, না দেখে যাব না।'
আরও খানিকটা এগোতে ভেজা বালিতে জুতোর ছাপ চোখে পড়ল। একজন মানুষের। ঘরের দিকে এগিয়ে গেছে। ফেরার চিহ্ন নেই। তারমানে হেগ এসেছে। আছে এখনও ভেতরে। ঘরের সামনের দরজা খোলা। বাতাসে ক্যাঁচকোঁচ করছে পাল্লাটা।
ঘরের সামনে এসে দাঁড়াল তিন গোয়েন্দা।
চিৎকার করে ডাকল কিশোর, 'মিস্টার ব্রাইটন, আছেন নাকি ভেতরে?'
জবাবে একপাশ থেকে গালে আঘাত হেনে গেল যেন বৃষ্টিভেজা বাতাস, হেগের সাড়া নেই।
'কি ব্যাপার, সাড়া দেয় না কেন?' দরজার দিকে তাকিয়ে আছে রবিন।
'দেখো, কোন্ ফাঁদ প্লেতেছে!' মুসা বলল। 'কিশোর, আমার ভাল্লাগছে না! মনে হচ্ছে কোন একটা গোলমাল আছে এখানে!'
ঠিক এই সময় ভেতর থেকে চাপা গোঙানি শোনা গেল।
'খাইছে! বিপদে পড়েছে লোকটা!' বলেই সবার আগে দৌড় দিল মুসা। হুড়মুড় করে ঢুকে পড়ল খোলা দরজা দিয়ে।
রবিন আর কিশোর ঢুকল তার পেছনে।
সবার আগে মুসা ঢুকলেও সবার আগে বাড়িটা খেল রবিন, সবচেয়ে পেছনে ছিল সে। মাথায় বাড়ি খেয়ে অজ্ঞান হয়ে গেল।
শব্দ শুনে ফিরে তাকিয়ে মুসা দেখল, ঢলে পড়ে যাচ্ছে রবিন আর কিশোর। ওদের দুজনের পাশে দাঁড়িয়ে আছে দুটো লোক, মুখোশ পরা। দুজনের হাতে দুটো ডাণ্ডা।
আত্মরক্ষার জন্যে তৈরি হলো মুসা। কিন্তু পেরে উঠল না। ডাণ্ডার বাড়ি খেয়ে অবশ হয়ে গেল তার ডান কাঁধ।
বন্দি হলো সেও।

সতেরো

সবার আগে জ্ঞান ফিরল মুসার। কোথায় আছে বুঝতে পারল না প্রথমে। মুখে বৃষ্টি পড়ছে। ঠাণ্ডা লাগছে খুব। পিঠের নিচে ভেজা।
ঘাড় ফিরিয়ে দেখল ভেজা বালিতে চিত হয়ে পড়ে আছে সে। হাত-পা নড়ানোর চেষ্টা করল, পারল না, বেঁধে রেখেছে।

খানিক দূরে দেখতে পেল রবিনকে, তার মতই হাত-পা বাঁধা অবস্থায় পড়ে আছে। এখনও বেহুঁশ।

কিশোর কোথায়? ঘাড় ঘুরিয়ে আরেক দিকে তাকাল মুসা। ওই তো! একটা নালার ধারে পড়ে আছে কিশোর। বৃষ্টির পানি বইছে নালাটা দিয়ে। মুখের কাছে উঠে এসেছে পানি। আরেকটু উঠলে নাক ডুবে যাবে। দম বন্ধ হয়ে মরবে সে।

মরিয়া হয়ে হাতের বাঁধন খোলার জন্যে টানাটানি শুরু করল মুসা। পারল না। চামড়া ছিলে গেল, কব্জি কেটে বসে গেল দড়ি, ঢিল হলো না। আতঙ্কিত হয়ে দেখল, পানি বাড়ছে নালায়। কিশোরের হুঁশ ফেরেনি। ওকে বাঁচাতে হলে সরিয়ে আনতে হবে। জায়গাটা ঢালু। সবচেয়ে ওপরের অংশে রয়েছে রবিন, মাঝে মুসা, নিচে কিশোর।

আর কোন উপায় না দেখে কিশোরের কাছে যাওয়ার জন্যে গড়াতে শুরু করল মুসা। কিন্তু এ রকম করে এসে ভুল করল। তার শরীরের ধাক্কা লাগল কিশোরের গায়ে। পানির দিকে আরও সরে গেল সে। নাকেমুখে পানি ঢুকে গেল।

পানি ঢোকাতেই বোধহয় হাঁচি দিয়ে উঠল কিশোর, কাশতে শুরু করল। তাতে লাভ হলো এই, হুঁশ ফিরল ওর। নাকে পানি ঢুকছে দেখে ঝট করে মাথাটা সরিয়ে ফেলল পানির কাছ থেকে। কিন্তু এই অবস্থায় থেকে বেশিক্ষণ বাঁচতে পারবে না।

ওপরে গাড়ি চলাচলের শব্দ হচ্ছে। রাস্তার ধারে কোন খাদের মধ্যে ওদেরকে ফেলে যাওয়া হয়েছে বুঝতে পারল মুসা। 'বাঁচাও! বাঁচাও!' বলে গলা ফাটিয়ে চিৎকার শুরু করল সে।

পুরোপুরি জ্ঞান ফিরেছে কিশোরের। বিপদটা সেও বুঝতে পেরেছে। মুসার সঙ্গে গলা মেলাল সে।

ইতিমধ্যে রবিনেরও জ্ঞান ফিরল।

মাথা তুলে রাখতে রাখতে ঘাড় ব্যথা হয়ে গেল কিশোরের। রাখতে না পেরে ছেড়ে দিল ঘাড়টা। ঝপ করে পানিতে পড়ল মাথা, নাক দিয়ে পানি ঢুকে গেল। জ্বালা করে উঠল নাকের ভেতর। ঝট করে আবার মাথা তুলে হাঁচি দিতে শুরু করল।

চিৎকার করেই চলেছে মুসা।

ওপরে একটা গাড়ি চলে যাওয়ার শব্দ হলো। কিছুদূর গিয়ে থামল গাড়িটা। পিছিয়ে আসতে শুরু করল।

নতুন উদ্যমে চিৎকার শুরু করল তিনজনে।

ঠিক ওদের ওপরে এসে থামল গাড়িটা। ইঞ্জিন বন্ধ হলো। খাদের পাড়ে দেখা দিল একটা লম্বা মূর্তি। ক্যাপ পরা একজন মানুষ। পোশাক দেখেই বোঝা যায় ট্যাক্সি ড্রাইভার। অবাক হয়ে ওদের দিকে তাকিয়ে রইল লোকটা।

চিৎকার করে বলল মুসা, 'আমাদের তুলুন! পানি উঠছে! মারা পড়ব!'

নেমে এল লোকটা। প্রথমে কিশোরের বাঁধন খুলল। জিজ্ঞেস করল, 'এখানে কি করে এলে?'

'কোথায় আছি আমরা?' উঠে বসে জানতে চাইল কিশোর।

'রকি বীচের দশ মাইল দূরে, হাইওয়ের পাশে।'

'কয়েকটা গুণ্ডা পিটিয়ে বেহুঁশ করে ফেলে গেছে আমাদেরকে এখানে।'

'শত্রুতা ছিল?' মুসার বাঁধন খুলতে আরম্ভ করেছে ড্রাইভার।

'জানি না। মুখোশ পরা ছিল, চিনতে পারিনি।'

ড্রাইভারের সঙ্গে ওপরে উঠে এল তিন গোয়েন্দা।

'কোথায় যাবে এখন?' জিজ্ঞেস করল ড্রাইভার।

'আমাদের গাড়িটা রয়েছে পাইরেটস হিলের ভেতরে সৈকতের ধারে,' বলল কিশোর। 'আমাদের ওখানে পৌঁছে দেবেন? অবশ্য যদি কোন অসুবিধে না হয় আপনার।'

এই ঝড়বাদলার মধ্যে পাইরেটস হিলের মত জায়গায় গিয়েছিল শুনে আরও অবাক হলো ড্রাইভার। 'ওখানে গিয়েছিলে কেন?'

লোকটা ওদের বাঁচিয়েছে। তার কাছ থেকে আরও সাহায্য পেতে হলে সত্যি কথাই বলতে হবে। 'দেখুন, আমরা গোয়েন্দা,' বলল কিশোর। 'একটা তদন্তের কাজে গিয়েছিলাম ওখানে। মনে হচ্ছে কেউ একজন আমাদের ধোঁকা দিয়েছে। চালাকি করে ওখানে ডেকে নিয়ে গিয়ে পিটিয়ে বেহুঁশ করেছে। কেন এটা করল, এখনও জানি না। খুন করতে চায়নি, তাই এমন জায়গায় ফেলে গেছে যাতে আমরা বেঁচে যাই।'

'তাহলে তো পুলিশকে জানানো দরকার।'

'না, এখনও জানানোর সময় হয়নি। আপনি আমাদেরকে পাইরেটস হিলে পৌঁছে দিলেই হবে।'

এক মুহূর্ত দ্বিধা করল ড্রাইভার। কি করতে কোন বিপদে জড়ায় ভাবল বোধহয়। তারপর মাথা কাত করল, 'ঠিক আছে, গাড়িতে ওঠো।'

মুসা বসল ড্রাইভারের পাশে, রাস্তা দেখানোর জন্যে। কিশোর আর রবিন নেতিয়ে পড়ল পেছনের সীটে। আহত জায়গাগুলোতে ব্যথা করছে তিনজনেরই।

ফার্স্ট এইড বক্স আছে ট্যাক্সিতে। পেইন কিলার ট্যাবলেট বের করে দিল ড্রাইভার। তিনজনেই খেয়ে নিল সেগুলো।

পাইরেটস হিলে পৌঁছে শাখাপথে নামল গাড়ি। বাদলা দিনের সন্ধ্যা, তাড়াতাড়ি আসছে। পাইনের বনে ইতিমধ্যেই অন্ধকার নেমেছে। গাড়ির গায়ে ছপ ছপ করে বাড়ি মারছে ভেজা ডাল। আগের বার যখন এসেছিল তার চেয়ে এখন আরও বেশি ভূতুড়ে হয়ে উঠেছে পরিবেশ।

দূর থেকেই দেখতে পেল ওরা, জায়গামতই আছে জেলপি। কাছে এসে গাড়ি থামাল মুসা। নেমে গেল তিন গোয়েন্দা। ভাল করে দেখল মুসা, গাড়িটায় হাত দেয়া হয়নি, যেমন ছিল তেমনি আছে। তবু নিশ্চিত হবার জন্যে চাবি দিয়ে দরজা খুলে ভেতরটা দেখল সে। বুট খুলে দেখল। চাকা ও ইঞ্জিন মেরামতের কিছু প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি, একটা বাতিল চাকা, আর গোটা তিনেক পুরানো সাঁতারের পোশাক রেখে দিয়েছে সে—সাগরের পাড়ে এসে কখনও সাঁতার কাটতে ইচ্ছে করলেই যাতে নেমে পড়তে পারে। আছে সেগুলো।

সব ঠিকঠাক আছে।

ড্রাইভারের দিকে ফিরে কিশো[redacted]লল, 'অনেক ধন্যবাদ আপনাকে।'

'তোমরা যাবে না এখন?'

'না, আপনি যান, আমাদের একটু কাজ আছে।'

'আবার কাজ! যদি বিপদে পড়ো? এখনও ভেবে দেখো, পুলিশকে জানাবে কিনা। যাওয়ার পথে তাহলে খবর দিয়ে যেতে পারি আমি।'

'না, লাগবে না,' জবাব দিল কিশোর। 'দরকার হলে আমরাই জানাতে পারব।'

ভাড়া মিটিয়ে দিল সে।

ট্যাক্সি নিয়ে চলে গেল ড্রাইভার।

গাড়ির শব্দ মিলাতে না মিলাতেই শক্ত হয়ে গেল মুসা। কান পাতল। 'গোঙানি শুনলাম মনে হয়?'

'গোঙাবে কে?' রবিন বলল। 'বাতাসের শব্দ শুনেছ। বনের ভেতর বয়ে যাওয়ার সময় কত রকম শব্দ করে বাতাস।'

'তখনও কিন্তু শুনেছিলাম।'

'তখন হেগ গুঙিয়েছিল ইচ্ছে করে, আমাদের বোকা বানানোর জন্যে। ভেবেছে গোঙানি শুনলেই আমরা ছুটে যাব, বেকায়দায় পেয়ে আমাদের কাবু করা সহজ হবে। গাধার মত তার সেই ফাঁদে পা দিয়েছি আমরা।'

'এখনও তাই করতে পারে।'

'এত বোকা নয় ও, এক ফাঁদ দুবার পাতবে না।'

কিশোর কথা বলছে না। ছাউনিটার দিকে তাকিয়ে আছে চিন্তিত ভঙ্গিতে। নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটল একবার।

'কি ভাবছ?' জিজ্ঞেস করল মুসা।

'কে মারল তখন আমাদের?'

'আর কে? এখনও কোন সন্দেহ আছে নাকি? হেগ ব্যাটা আমাদের ছাগল পেয়েছিল। ওর সহজ ফাঁদটাকে গুরুত্ব না দিয়ে বোকার মত এসে বিপদে পড়েছি। ওকে আমি ছাড়ব না। ধরে নিয়ে গিয়ে চুবিয়ে ওই নালার পানি না খাইয়েছি তো আমার নাম মুসা আমান নয়।'

'চলো,' আচমকা বলল কিশোর।

অবাক হলো মুসা, 'কোথায়?'

'ছাউনিটা দেখে আসি।'

'পাগল হয়েছ! আবার কেন?'

'তখন তো কিছু দেখতেই পারলাম না। ভেতরে কি আছে অন্তত দেখা দরকার। দেখি, লোকগুলো কিছু ফেলে গেল কিনা, কোন সূত্র।'

'রাত হয়ে যাচ্ছে যে।'

'দশ মিনিটে কিছু হবে না,' ছাউনির দিকে হাঁটতে শুরু করল কিশোর। 'হয়তো এসবের জন্যে হেগ দায়ী নয়। সে নিজেও হয়তো আমাদের মতই আক্রান্ত হয়েছে।'

'এ কথা কেন মনে হচ্ছে তোমার?' পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে বলল রবিন।

'বরং অন্যভাবে ভাবা যায়—গুণ্ডা ঠিক করে রেখে আমাদের এখানে আসতে বলেছিল সে, এসে বসে ছিল আমাদের অপেক্ষায়।'

'আমাদের পিটিয়ে তার লাভটা কি?'

'ভয় দেখিয়ে আমাদের ঠেকাতে পারলে গুপ্তধন খুঁজতে আর বাধার সম্মুখীন হবে না।'

'কিন্তু সেই তো কাটলাস খুঁজতে আমাদের সাহায্য চেয়েছে।'

'ওটা ভান হতে পারে। ওসব কথা বলে আমাদের কাছ থেকে তথ্য আদায় করতে চেয়েছিল হয়তো।'

ছাউনির সামনে এসে কোমরে ঝোলানো টর্চ খুলে নিল কিশোর। অন্ধকার হয়ে গেছে। সাদা ঢিবির ওপরে কালো একটা বিরাট কয়লার টুকরোর মত লাগছে ঘরটাকে।

খুব সাবধানে পা টিপে টিপে দরজার কাছে এসে দাঁড়াল তিন গোয়েন্দা।

ফিসফিস করে বলল কিশোর, 'রবিন, তুমি সামনের দরজা দিয়ে ভেতরে ঢোকো। মুসা দরজার কাছে থাকো। আমি পেছন দিকে যাচ্ছি। কেউ আক্রান্ত হলেই সঙ্গে সঙ্গে চিৎকার করে জানান দেবে।'

দাঁড়িয়ে গেল মুসা। টর্চ বের করে ভেতরে পা রাখল রবিন। পাশ দিয়ে ঘুরে পেছনে চলে এল কিশোর।

কাউকে চোখে পড়ল না এবার। ঘরটা খালি। ভাল করে আলো ফেলে জানালা আর আশপাশটা দেখল কিশোর। নিশ্চিত হলো, কেউ নেই।

ঘর থেকে বেরিয়ে এল রবিন। মুসাকে নিয়ে চলে এল কিশোরের কাছে, সে কিছু দেখেছে কিনা জিজ্ঞেস করতে।

ভেজা বালিতে দেখতে গিয়ে স্থির হয়ে গেল কিশোরের টর্চ। আলোটা একই জায়গায় ধরে রেখে পায়ে পায়ে এগিয়ে গেল সেদিকে। দুটো ঢিবির একটা খাঁজের মাঝে বালি সামান্য দেবে আছে। আরও কাছে এসে ভাল করে দেখে বলল সে, 'মুখ নিচু করে কেউ পড়ে ছিল এখানে।'

'কে?' প্রশ্নটা একসঙ্গে বেরিয়ে এল মুসা আর রবিনের মুখ থেকে।

'যে পড়েছিল সে কমপক্ষে ছয় ফুট লম্বা। দাগগুলো দেখো ভাল করে, তাহলেই বুঝতে পারবে।'

মুখের কয়েক ইঞ্চি দূরে আরেকটা চিহ্ন আবিষ্কার করল রবিন, দেখে মনে হয় কোন ইংরেজি অক্ষরের মত। ভালমত ফোটেনি, অনেক কষ্ট করে লেখা হয়েছে। অক্ষরটা H না B, ঠিক বোঝা গেল না।

কিশোরের অনুমান, হাত-পা বাঁধা বন্দি লোকটা নাক দিয়ে ঘষে বালিতে লিখেছে অক্ষরটা। কিন্তু কোথায় গেল সে?

আরও খোঁজাখুঁজি করার পর জুতোর ছাপ আর টানাহেঁচড়ার দাগ দেখতে পেল ওরা। লোকগুলো কোন দিক দিয়ে এসেছিল, কোনদিক দিয়ে গেছে, ছাউনির সামনে জুতোর ছাপ নেই কেন, তারও জবাব মিলল। সাগরের দিক দিয়ে এসেছে ওরা, বোটে করে।

এখন প্রশ্ন হলো, বন্দি লোকটা কে?

কিশোরের ধারণা, হেগ ব্রাইটন।

শত্রুপক্ষ কারা?

সেটা অজানা।

রবিনকে ওখানে দাঁড়াতে বলে মুসাকে নিয়ে ছাউনির ভেতরে এসে ঢুকল কিশোর। একটা বাক্স দেখতে পেয়ে সেটা তুলে নিতে বলল মুসাকে। এটা দিয়ে কি হবে, জানতে চাইল মুসা। জবাব দিল না কিশোর। নিয়ে আসতে বলে রবিন যেখানে দাঁড়িয়ে রয়েছে সেদিকে রওনা হলো।

বাক্সটা নিয়ে এল মুসা।

লোকটার মুখ যেখানে ছিল, সেখানকার দাগ অনেক গভীর। মুসার হাত থেকে বাক্সটা নিয়ে দাগটা ভাল করে ঢেকে দিয়ে বলল কিশোর, 'যাক, বাতাস, বৃষ্টি, কোন কিছুতেই আর নষ্ট হবে না।'

অধৈর্য হয়ে গেল মুসা। 'তুমি কি করছ, কিশোর, কিছু বুঝতে পারছি না!'

'এখনও না?'

বিমূঢ়ের মত মাথা নাড়ল মুসা, 'না।'

'রবিন, তুমি?'

'গর্তটা বাঁচালে, বুঝলাম, কিন্তু...' বুঝে ফেলল হঠাৎ, 'অ্যাই, প্লাস্টার মউল্ড তৈরি করার ইচ্ছে নেই তো?'

'এই তো বুঝতে পেরেছ,' হাসল কিশোর। 'প্লাস্টিকের ছাঁচ তৈরি করা গেলে আদল দেখে বোঝা যাবে লোকটার চেহারা। আমাদের পরিচিত হলে চিনতে পারব, না হলে পুলিশকে দিলে তারা খুঁজে বের করতে পারবে। বন্দি লোকটা খুব চালাক। যতটা পেরেছে সূত্র রেখে গেছে। ইচ্ছে করে মুখ চেপে ধরে বালিতে ছাপ রেখে গেছে। তার পাশে নাক দিয়ে লিখে রেখে গেছে তার নামের আদ্যক্ষর।' দম নেয়ার জন্যে থামল কিশোর। 'চলো, যাওয়া যাক। কাল সকালে এসে ছাঁচ তুলে নিয়ে যাব।'

আঠারো

পরদিন সকালে ছ'টা বাজার আগেই রবিনকে নিয়ে এসে ইয়ার্ডে হাজির হলো মুসা। আগেই উঠে পড়েছে কিশোর। নাস্তা রেডি করে রেখেছে। আগের রাতে সিদ্ধান্ত নিয়েছে, খুব সকালে পাইরেটস হিলে যেতে হবে। বলা যায় না, জেলে বা অন্য কেউ ঘুরতে গিয়ে স্রেফ কৌতূহলের বশে বাক্স সরিয়ে ছাপটা নষ্ট করে ফেলতে পারে। কিংবা গুণ্ডারাও কোন কারণে ফিরে আসতে পারে। ওদেরকে ছাপ নষ্ট করার সুযোগ দিতে চায় না কিশোর। তার আগেই গিয়ে ছাঁচ তুলে আনবে।

নাস্তা খাওয়া শেষ করে মেরিচাচী আর রাশেদ চাচা ওঠার আগেই বেরিয়ে পড়ল তিন গোয়েন্দা। এত সকালে কিছু না জানিয়ে বেরিয়ে গেলে চাচী চিন্তা করতে পারেন, তাই একটা নোট লিখে রান্নাঘরের টেবিলে চাপা দিয়ে রেখে এসেছে কিশোর। বলেছে, জরুরী কাজে বেরোচ্ছে। দুপুরে খাওয়ার আগে ফিরে

আসবে।

মেঘ কেটে গেছে। আকাশ পরিষ্কার। বুক ভরে সকালের তাজা বাতাস টেনে নিল ওরা। পাইরেটস হিলের বালির ঢিবির কাছে যখন পৌঁছল, সূর্য তখন দিগন্ত ছাড়িয়ে বেশ অনেকটা উঠে পড়েছে।

আগের দিন যে জায়গায় গাড়ি রেখেছিল মুসা, আজও সেখানেই রাখল। ছাঁচ তোলার সরঞ্জাম একটা ব্যাগে ভরে নিয়ে এসেছে কিশোর। ব্যাগটা নিয়ে গাড়ি থেকে নামল। দ্রুত এগোল কেবিনের দিকে। তার একটাই দুশ্চিন্তা, ছাপটা নষ্ট হয়ে গেল কিনা।

অহেতুক দুশ্চিন্তা করেছে। ওরা যাওয়ার পর কেউ আসেনি এখানে। বাক্স সরিয়ে কাজে লেগে গেল সে।

স্প্রে-গান বের করে তরল প্লাস্টিক ঢেলে ভরে দিল গর্তটা কিশোর। শক্ত হওয়ার অপেক্ষায় রইল। কেমিকেল আর পাউডারের শিশি বের করল রবিন। গভীর মনোযোগে তাকিয়ে দেখছে মুসা।

কাজে এত মগ্ন হয়ে রয়েছে বলে রাস্তায় যে একটা গাড়ি থামল টের পেল না ওরা। আচমকা পেছনে শোনা গেল বাজখাঁই কণ্ঠ, 'কি করছ?'

চমকে ফিরে তাকাল তিনজনে।

ওদের দিকে কড়া দৃষ্টিতে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে একজন পুলিশ অফিসার।

ফাঁকি দেয়ার চেষ্টা বৃথা, সত্যি কথা বলল কিশোর, 'ছাঁচ তুলছি।'

'কিসের ছাঁচ?'

'মানুষের মুখের।'

ভুরু কুঁচকে গেল অফিসারের। কঠোর হয়ে গেল দৃষ্টি, 'মানুষের মানে?'

পকেট থেকে তিন গোয়েন্দার কার্ড বের করে দেখাল কিশোর। তারপর দেখাল ক্যাপ্টেন ইয়ান ফ্লেচারের প্রশংসা পত্র। দৃষ্টি অনেকটা নরম হলো অফিসারের। কিশোর তখন বলল, 'একটা তদন্তের কাজে কাল সন্ধ্যায় এসেছিলাম এখানে। একজন লোককে বন্দি করে ফেলে রাখা হয়েছিল, ছাপ দেখে সেটা ঢেকে রেখে গিয়েছিলাম বাক্স দিয়ে। আজ সেই ছাঁচ থেকে ছাপ তুলে নিতে এসেছি।'

'লোকটার চেহারা বোঝার জন্যে? হুঁম। কালই পুলিশকে জানালে না কেন?'

'ভাবলাম, একেবারে ছাঁচটা তুলে নিয়ে গিয়েই জানাব।'

আর কিছু বলল না অফিসার। আগ্রহের সঙ্গে তাকিয়ে দেখতে লাগল কিশোরের কাজ।

ছাঁচটা শক্ত হলে তুলে আনল কিশোর। চিত করল। নাহ্, একটুও ভাল হয়নি, চেহারার কিছুই বোঝা যাচ্ছে না কেবল ঠেলে থাকা চোয়াল বাদে।

'ভাল হলো না তো,' অফিসার বলল, 'এ দিয়ে চেনা যাবে না লোকটাকে। পানি শুকিয়ে শক্ত হয়ে গেছে বালি। রাতে পুলিশকে জানালে আর এ অবস্থা হত না।'

'তারপরেও একে চিনতে পারছি আমি,' গম্ভীর স্বরে কিশোর বলল, 'শুধু চোয়াল দেখেই। এর নাম হেগ ব্রাইটন। এই যে দেখুন, বালিতে নামের আদ্যক্ষরও লিখে রেখেছে। কাল ওকে গুণ্ডারা বেঁধে ফেলে রেখেছিল এখানে, যাওয়ার সময়

বোটে করে নিয়ে গেছে।'

ভুরু কুঁচকে কিশোরের দিকে তাকাল অফিসার, 'তোমরা জানলে কি করে?'

'বললামই তো, কাল এসেছিলাম।'

'সব কথা বলছ না আমাকে তোমরা...'

'চীফ ফ্লেচার ছাড়া আর কারও কাছে বলব না,' আরেক দিকে তাকিয়ে বলল কিশোর। প্লাস্টিকের ছাঁচটা হাতে নিয়ে উঠে দাঁড়াল। দুই সহকারীকে বলল, 'চলো, যাই, এখানকার কাজ শেষ।'

রেডিওফোন বের করে হেডকোয়ার্টারের সঙ্গে যোগাযোগ করতে আরম্ভ করেছে ততক্ষণে অফিসার। চীফকে পাওয়া গেল। বলল, 'আমি স্যার, হেরাল্ড, পাইরেটস হিল থেকে বলছি। এদিক দিয়ে যাচ্ছিলাম, দেখি তিনটে ছেলে বালির মধ্যে কি যেন করছে। এসে দেখি, একটা মানুষের মুখের ছাঁচ তুলছে। পরিচয় দিচ্ছে তিন গোয়েন্দা বলে।' কয়েক সেকেণ্ড চুপচাপ ওপাশের কথা শুনে ফিরে তাকাল কিশোরের দিকে, 'নাও, কথা বলো।'

'কি ব্যাপার, কিশোর?' ক্যাপ্টেন জানতে চাইলেন।

'অনেক কথা, স্যার, ফোনে সব বলা যাবে না। যদি সময় দিতে পারেন, তাহলে আমরা বরং একবার আসি।'

'চলে এসো। আমি আছি।' সেটটা অফিসারের হাতে ফিরিয়ে দিল কিশোর।

হতাশ হলো অফিসার হেরাল্ড, সব কথা শুনতে পারল না বলে। কিন্তু কিশোরের মুখ থেকে কথা আদায় করার আর কোন বুদ্ধিও বের করতে পারল না সে।

থানায় গিয়ে ক্যাপ্টেন ইয়ান ফ্লেচারের সঙ্গে কথা বলে দুপুরের আগেই স্যালভিজ ইয়ার্ডে ফিরে এল তিন গোয়েন্দা। মুসা আর রবিনকে বলল কিশোর, 'বাড়ি গিয়ে আর কি হবে, এখানেই খেয়ে যাও।'

'খাওয়ার পর কি করবে?' জানতে চাইল রবিন।

'বুঝতে পারছি না। কোন একটা সূত্র থাকলেও নাহয় কামানটা খুঁজতে যাওয়া যেত। কিছুই তো নেই হাতে।'

'এক কাজ করা যায়,' মুসা বলল, 'জ্যাক হুবার্টের বাড়ির কাছে সাগরে নেমে দেখতে পারি। ওখানেই তো গান পিকটা পেয়েছে সার্জেন্ট। আমরা আরেকটু খোঁজাখুঁজি করে দেখব। তাতে লস নেই। সময় কাটবে, ডাইভিং করা হবে, কামানটাও খোঁজা হবে।'

প্রস্তাবটা ভাল মনে হলো কিশোরের। রাজি হয়ে গেল।

খাবার টেবিলে মেরিচাচী জানতে চাইলেন ওদের তদন্তের কদ্দূর কি হলো।

কিশোর জবাব দিল, 'এগোচ্ছে।'

'আজ আর কোথাও বেরোবি নাকি তোরা?'

মুখ তুলল না কিশোর। 'কেন?'

'না, এমনি। বাগানের দক্ষিণ দিকটায় জঞ্জাল জমে পাহাড় হয়ে আছে। বোরিস আর রোভার একা সরিয়ে কুলাতে পারবে না। তোরা যদি একটু হাত লাগাস...'

জঞ্জাল সরানোর কথা শুনেই সতর্ক হয়ে গেল কিশোর, তাড়াতাড়ি বলল,

'এখন! জরুরী কাজ আছে আমাদের। মুসা আর রবিন তো বাড়িই গেল না সেজন্যে।'

আর কিছু বললেন না চাচী।

খাওয়ার পর তাঁর ভয়ে আর একটা মুহূর্ত দেরি করল না ওরা। কখন চাচী আবার বলে বসেন, না, কাজটা করতেই হবে, কে জানে।

আবার পাইরেটস হিলের উদ্দেশে রওনা হলো ওরা। পথে একটা স্টোর থেকে তিনটে ডুবুরির পোশাক ভাড়া নিল। পাইরেটস হিলে এসে জ্যাক হুবার্টের বাড়ির কাছ থেকে দূরে গাড়ি রেখে, গাড়ির বুট থেকে বের করল পোশাকগুলো। হেঁটে রওনা হলো কেবিনের দিকে।

দূর থেকে নির্জন মনে হলো কেবিনটা। দরজা-জানালা সব বন্ধ। দমে গেল তিনজনে, বিশেষ করে মুসা—হুবার্ট বাড়ি নেই নাকি? সে না থাকলে কোন জায়গায় পিকটা পাওয়া গেছে দেখাতে পারবে না, ওদেরও আর পানিতে নামা হবে না।

তবে না, বাড়িতেই পাওয়া গেল সার্জেন্টকে। দুপুরে খেয়েদেয়ে আর কোন কাজ না থাকায় ঘুম দিচ্ছিল। ওদের দেখে খুশি হলো।

কেন এসেছে জানাল কিশোর।

সঙ্গে সঙ্গে কাপড় পরে তৈরি হয়ে গেল জ্যাক। ওদেরকে জায়গাটা দেখিয়ে দিতে চলল।

কিন্তু সৈকতে এসে হতাশ হতে হলো। নৌকা নোঙর করে তীরে বসে উত্তেজিত হয়ে কথা বলছে কয়েকজন জেলে। জ্যাকের সঙ্গে ডাইভিং স্যুট পরা তিন কিশোরকে দেখে হাত নেড়ে ডাকল একজন।

জ্যাক ওদের পরিচিত। কাছে যেতে বলল লোকটা, 'এরা কারা, সার্জেন্ট?'

'আমার বন্ধু। রকি বীচে থাকে।'

'পানিতে নামবে নাকি?'

কথা থামিয়ে সব কজন জেলে তাকিয়ে আছে তিন গোয়েন্দার দিকে।

'হ্যাঁ, দিনটা সুন্দর দেখে ডুব দিতে এসেছে,' জ্যাক বলল।

'উচিত হবে না,' বলল আরেক জেলে, 'দেখো না, আমরা উঠে বসে আছি। কোত্থেকে এসে হাজির হয়েছে বিশাল এক স্টিং-রে, জালটাল ছিঁড়ে সর্বনাশ করেছে। রেগে আছে ওটা। ডুবুরি দেখলে কোন্ কাণ্ড করে কে জানে।'

এ কথা শোনার পর আর নামার সাহস হলো না কিশোর বা রবিনের। হতাশায় ফাটা বেলুনের মত চুপসে গেল মুসা। স্টিং-রে খুব ভাল করেই চেনে সে। দেখতে অনেকটা বাদুড়ের মত। আকারে বিশাল হয় এরা, বাদুড়ের মতই ডানা মেলে নিঃশব্দে ঘুরে বেড়ায় সাগর তলে। চাবুকের মত লম্বা লেজ, তাতে মারাত্মক কাঁটা থাকে। এমনিতে নিরীহ, কিন্তু আক্রান্ত হলে কিংবা কোন কারণে খেপে গেলে ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠে। জেলেরা পর্যন্ত তখন এদের এড়িয়ে চলে, পানিতে নামতে ভয় পায়।

খেপে গেল মুসা। এ ভাবে হতাশ হয়ে বাড়ি ফিরে যেতে পারবে না। গোঁয়ারের মত জেদ ধরল, 'স্টিং-রে থাক আর যাই থাক, আমি আজ নামবই।'

বাধা দিল কিশোর আর রবিন। নানা ভাবে বোঝাল। কিন্তু মুসার এক গোঁ,

সে নামবেই। তার যুক্তি, একজায়গায় বেশিক্ষণ থাকে না স্টিং-রে, হয়তো এতক্ষণে চলে গেছে।

কারও বাধাই মানল না সে, নেমে গেল পানিতে। তবে কিশোর আর রবিন সাহস করতে পারল না। ওরা তীরে বসে আলাপ জমাল জেলেদের সঙ্গে। নানা ভাবে খোঁজ নিতে শুরু করল পুরানো কামানটার। এই এলাকায় জলদস্যু নামার অনেক রোমাঞ্চকর গল্প শুনতে লাগল ওদের কাছে।

জেদ করে নামলেও একা একা সাঁতার কাটতে বেশিক্ষণ ভাল লাগল না মুসার। তা ছাড়া মুখে যতই বলুক মনের কোণে একটা আবছা ভয় সর্বক্ষণ রয়েই গেল। সাগরতলে কোন ছায়া দেখলেই চমকে মুখ ফিরিয়ে তাকায়, ভাবে, এই বুঝি আক্রমণ করতে এল স্টিং-রে। ফলে সাঁতারটা বিফলেই গেল। বিরক্ত হয়ে উঠে চলে এল সে।

ওদিকে কামান নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা করেও কারও কাছ থেকে নতুন কোন তথ্য বের করতে পারল না কিশোর আর রবিন। মুসা উঠে আসার অল্প কিছুক্ষণ পরই রকি বীচে রওনা হলো।

উনিশ

পাইরেটস হিল থেকে বিফল হয়ে ফিরলেও রকি বীচে এসে একটা দারুণ খবর পেয়ে গেল ওরা। কোন খবর আছে কিনা জানার জন্যে মুসাকে থানার সামনে থামতে বলেছিল কিশোর, ওরা তিনজনে গাড়ি থেকে নেমে ঢুকতেই দেখা ইয়ান ফ্লেচারের সঙ্গে।

হেসে বললেন ক্যাপ্টেন, 'এসো, এসো। খবরটা পেলে কি করে এত তাড়াতাড়ি?'

'খবর!' অবাক হলো কিশোর, 'কিসের খবর?'

'কাটলাসগুলো যে পাওয়া গেছে শোননি?'

'কার কাছে শুনব? আমরা তো এইমাত্র পাইরেটস হিল থেকে এলাম।'

'ও। বার্ড বম্বারও ধরা পড়েছে।'

'তাই নাকি! তাহলে তো সাংঘাতিক খবর! ওর সঙ্গে কথা বলা যাবে?'

'যাবে।'

কি করে পাওয়া গেল ওকে, জানালেন ক্যাপ্টেন। দুপুরে একটা মার্কেটের সামনে টহল দিচ্ছিল একজন পুলিশ অফিসার। একটা গাড়িতে ওঠার সময় বার্ড বম্বারকে দেখে ফেলে সে। ধরতে যায়। পুলিশ দেখে গাড়ি নিয়ে পালানোর চেষ্টা করে বার্ড। পিছু নেয় অফিসার। রাস্তা দিয়ে গেলে পালাতে পারবে না বুঝে কিছুদূর গিয়ে একটা বনের মধ্যে ঢুকে পড়ে বার্ড। গাড়ি রেখে পালিয়ে যায়। ওয়্যারলেসে তখন সাহায্য চায় অফিসার। আরও কয়েকটা পুলিশের গাড়ি এসে বন ঘিরে ফেলে খুঁজতে থাকে। ধরে ফেলে বার্ডকে। গাড়ির বুটে পাওয়া গেছে কাটলাসগুলো। সোসাইটির জিনিস সোসাইটিকে ফেরত দেয়া হয়েছে।

বার্ডের সঙ্গে দেখা করলেও ওর মুখ থেকে কোন কথাই আদায় করতে পারল না কিশোর। ওদের দিকে তাকালই না সে।

বাড়ি ফেরার পথে আলোচনা করতে করতে এল তিন গোয়েন্দা, কিভাবে কাটলাসগুলো দেখা যায়। কিশোরের ধারণা, ওগুলোর মধ্যেই রয়েছে জরুরী কোন সূত্র। নইলে এর পেছনে লাগত না বার্ড। হ্যামার আর হেগও এখন কাটলাসগুলো পেতে আগ্রহী।

কিন্তু কি করে পরীক্ষা করা যায় ওগুলো? আলাপ-আলোচনা করে একটাই উপায় পাওয়া গেল—মেরিচাচী। একমাত্র চাচীই দেখার ব্যবস্থা করে দিতে পারেন।

সুতরাং বাড়ি এসে চাচীকে তোয়াজ শুরু করল কিশোর।

কিছুক্ষণ চুপচাপ থাকার পর চাচী বললেন, 'ব্যবস্থা করে দিতে পারি, তবে আমার কাজটাও করে দিতে হবে তোদের।'

'কি কাজ?' প্রায় একসঙ্গে প্রশ্ন করল তিনজনে।

মুচকি হাসলেন চাচী, 'ওইযে বললাম তখন, বাগানের দক্ষিণের জঞ্জালগুলো সরিয়ে দিতে হবে।'

মুখ কালো করে মাথা নাড়তে নাড়তে কিশোর বলল, 'এ অন্যায়! ঘোরতর অন্যায়! সুযোগ পেয়ে তুমি আমাদের ব্ল্যাকমেল করছ, চাচী!'

আকাশ থেকে পড়লেন মেরিচাচী, 'ব্ল্যাকমেল করলাম কোথায়? আমি তো তোদের মুফতে খাটিয়ে নিচ্ছিনে, কিংবা প্যাঁচে ফেলে জোর করে করাচ্ছিনে। কাটলাসগুলো তোদের দেখা জরুরী, আমার জঞ্জাল সরানো জরুরী, একজন আরেকজনকে সাহায্য করব, ব্যস। এর মধ্যে আমি তো কোন অন্যায় দেখছি না। আচ্ছা যা, কিছু পয়সাও দেব সঙ্গে।'

কি আর করা, রাজি না হয়ে উপায় নেই। একটু উসখুস করে কিশোর বলল, 'ঠিক আছে, যাও, দেব সরিয়ে, তবে হাতের কেসটা শেষ না হওয়া পর্যন্ত কিছুই করতে পারব না।'

'বেশ, তাই করিস। তবে খুব বেশিদিন দেরি করলে চলবে না। দু'চার দিনের মধ্যেই সরাতে হবে।'

চাচী রান্নাঘরের দিকে চলে যেতেই মুসা বলে উঠল, 'রাজি হয়ে কি ঠিক করলে, কিশোর?'

'আর কি করতে পারতাম?'

'ছুরিগুলোতে যদি কিছু না পাওয়া যায়? অহেতুক খাটতে হবে আমাদের।'

'অন্যভাবে ভেবে দেখো বরং, লাভটা আমাদেরই। বোরিস আর রোভার কুলিয়ে উঠতে না পারলে জোর করে হলেও আমাদের দিয়ে কাজ করাত চাচী, বাঁচতে পারতাম না। এখন তো বরং আমাদের লাভ...'

মেরিচাচীকে ঢুকতে দেখে চুপ হয়ে গেল কিশোর। তাঁর হাতে একটা ট্রে। আতে বিশাল এক কেক। সেটা এনে টেবিলে নামিয়ে রেখে হেসে বললেন, 'মন খারাপ করিসনে, এই নে, ঘুষ দিলাম। যতক্ষণ না কাজটা শেষ হবে এরকম আরও পেতে থাকবি।'

বিন্দুমাত্র ক্ষোভ থাকল না আর তিনজনের কারও। মুসা বলল, 'মন খারাপ কে

করে! এ জিনিস পেতে থাকলে শুধু এক জায়গার জঞ্জাল কেন, পুরো ইয়ার্ড সাফ করে দিতে পারি দুদিনে।'

ঘণ্টা দুই পরেই হেডকোয়ার্টারে কাটলাসগুলো নিয়ে পরীক্ষা করতে বসল তিন গোয়েন্দা। প্রথমে মিস্টার কারম্যানকে ফোন করেছেন মেরিচাচী। একরাতের জন্যে কাটলাসগুলো দিতে অনুরোধ করেছেন। তারপর কিশোরদের হাতে নিজের সই করা একটা নোট দিয়ে দিয়েছেন প্রমাণ হিসেবে যে তিনিই ফোন করেছেন। সুতরাং জিনিসগুলো আনতে কোন অসুবিধে হয়নি ওদের।

ওঅর্ক ল্যাম্পের নিচে কড়া আলোতে কাটলাসগুলো এক এক করে দেখল কিশোর। একটা ছুরির ব্লেডের একপাশে খোদাই করা আছে প্রস্তুতকারীর নাম, মনটয়া।

'বাকিগুলোতেও থাকতে পারে,' বলে একটা শিশি থেকে কেমিকেল নিয়ে ছুরিগুলো ডলে পরিষ্কার করতে শুরু করল উত্তেজিত রবিন। ঝকঝক করতে লাগল দামেস্ক-ইস্পাতে তৈরি ফলাগুলো। প্রতিটি ফলা খুঁটিয়ে দেখা হলো। কিন্তু আর কোনটাতে কোন রকম লেখা পাওয়া গেল না।

মুগ্ধ দৃষ্টিতে ছুরিগুলোর দিকে তাকিয়ে মুসা বলল, 'এত সুন্দর ফলায় দাগ দিয়ে নষ্ট করতে বোধহয় মায়া লাগছিল যে বানিয়েছে, তাই একটাতে দিয়ে বাকিগুলো রেখে দিয়েছে।'

হাতলগুলোতে কিছু থাকতে পারে ভেবে ওগুলোও পরিষ্কার করে নেয়া হলো। হাতলে বসানো খুদে খুদে মুক্তা, সবগুলো রয়েছে জায়গামত, কোনটা খসে যায়নি। সোনার সরু পাত বসিয়ে আঁকা হয়েছে লতাপাতা। সেগুলোও ঠিক আছে।

ম্যাগনিফাইং গ্লাস বের করে হাতলগুলো পরীক্ষা করতে লাগল কিশোর। কোনটার ভেতরেই হীরা বা অন্য কোন মূল্যবান পাথর লুকানো আছে বলে মনে হলো না। দেখতে দেখতে মধ্যরাত পেরিয়ে গেল। হতাশ হয়ে পড়ল মুসা। রবিনও হেলান দিল চেয়ারে। কিন্তু কিশোর হাল ছাড়ল না। একটা ছুরি হাতে নিয়ে বলল, 'আমার বিশ্বাস, এটার হাতলের মধ্যেই লুকানো রয়েছে রহস্যের জবাব।' ড্রয়ার খুলে আরেকটা ম্যাগনিফাইং গ্লাস বের করল, আগেরটার চেয়ে অনেক বেশি শক্তিশালী এটা, কিশোরের এক জন্মদিনে উপহার দিয়েছিলেন রাশেদ পাশা। তিনিও উপহার পেয়েছিলেন এটা, বহুদিন আগে মধ্যপ্রাচ্যের এক জ্যোতিষীর কাছ থেকে।

অনেক সময় নিয়ে ছুরিটার হাতলের প্রতিটি ইঞ্চি দেখল কিশোর। উজ্জ্বল হয়ে উঠল তার মুখ। চিৎকার করে উঠল, 'দেখো দেখো, এই এখানটায় হাত দিয়ে দেখো!'

মুসা আর রবিন দুজনেই আঙুল বুলিয়ে দেখল। অতি সূক্ষ্ম একটা ফাটল, খুব চালাকি করে মিশিয়ে দেয়া হয়েছে সোনার লতার সঙ্গে।

'এদিক দিয়ে খোলা যাবে মনে হচ্ছে!' রবিন বলল।

'হ্যাঁ,' মাথা ঝাঁকাল কিশোর।

ছোট একটা ছুরির মাথা ঢুকিয়ে চাড় দিয়ে ফাটলটা বড় করার চেষ্টা করল কিশোর। কাজ হলো না। ঢোকাতেই পারল না ফলার মাথা। হবে না এ ভাবে। আবার ম্যাগনিফাইং গ্লাস তুলে নিয়ে দেখতে লাগল গোপন কোন সুইচ আছে

কিনা। সোনার তৈরি প্রতিটি পাতায় চাপ দিয়ে দেখল। তাতেও কিছু হলো না।

ছুরিটা টেবিলে নামিয়ে রেখে, চেয়ারে হেলান দিয়ে চোখ বুজে চুপ করে রইল। ঘন ঘন চিমটি কাটতে থাকল নিচের ঠোঁটে। আচমকা চোখ মেলে বলল, 'সুইচটা রয়েছে আসলে ফলার মধ্যে। কোনভাবে যুক্ত করে দেয়া হয়েছে গোপন কুঠুরির সঙ্গে। কিন্তু কিভাবে?'

জবাব দিতে পারল না তার দুই সহকারী।

আবার ছুরিটা টেনে নিল কিশোর।

মুসা বলল, 'এক কাজ করো, বাড়ি মেরে দেখো। এতদিন পড়ে থেকে থেকে স্প্রিংটায় মরচে পড়ে গেছে হয়তো, কাজ করছে না তাই।'

'ঠিক বলেছ!' চিৎকার করে উঠল কিশোর। 'স্প্রিংটাই জ্যাম হয়ে গেছে!' উঠে চলে এল দেয়ালের কাছে। ট্রেলারের ধাতব দেয়ালে ছুরির মাথা ঠেকিয়ে জোরে জোরে ঠেলতে লাগল। এই চাপ সহ্য করতে পারল না স্প্রিং। বসে গেল ভেতরের দিকে। সঙ্গে সঙ্গে মৃদু কট করে সরে গেল হাতলের এক বর্গইঞ্চি পরিমাণ পাত, যেখানে পাতলা ফাটলটা দেখা গেছে, বেরিয়ে পড়ল গোপন কুঠুরি।

ফোকরে আঙুল ঢুকিয়ে দিল কিশোর।

দেখার জন্যে ঝুঁকে এল রবিন আর মুসা।

'আছে কিছু?' জানতে চাইল রবিন।

মাথা ঝাঁকাল কিশোর। বের করে আনল তাবিজের মত করে গোটানো একটুকরো পুরানো পার্চমেন্ট পেপার। টেবিলে ফিরে এসে সাবধানে সেটা খুলল সে।

পেঁচানো অক্ষরে কি যেন লেখা রয়েছে কাগজটাতে।

'খাইছে! এ কোন ভাষা?' চোখের পাতা সরু করে কাগজটার দিকে তাকিয়ে আছে মুসা।

'স্প্যানিশ,' রবিন বলল।

কিছুক্ষণ পড়ার চেষ্টা করে হাল ছেড়ে দিল কিশোর, 'আমাদের বিদ্যেয় কুলাবে না। ভাষাবিদ কারও কাছে যেতে হবে।'

'মিস কোরি ভ্যালেন্ট,' সমাধান করে দিল রবিন।

'ঠিক,' তুড়ি বাজাল কিশোর, 'কোরি ভ্যালেন্ট। কাল সকালে উঠেই যাব তাঁর কাছে।'

মিস কোরি ভ্যালেন্ট ওদের স্কুলের টিচার, স্প্যানিশ ভাষা শেখান। সকালে সরাসরি বাসায় যাওয়ার আগে একবার ফোন করে দেখার সিদ্ধান্ত নিল কিশোর। করে ভালই করল। হাউজ মেইড বার্থা জানাল, ম্যাডাম বাইরে গেছেন। দুপুরের আগে ফিরবেন না। তিনটের দিকে আরেকবার ফোন করতে বলল কিশোরকে।

দমে গেল কিশোর। এতটা সময় কি করে কাটাবে? ভাবল, জঞ্জাল সরানো শুরু করে দেবে নাকি? যত তাড়াতাড়ি সম্ভব কাঁধ থেকে বোঝাটা নামানো দরকার। মুসা আর রবিনকে সেকথা বলতে যাবে এই সময় ফোন বাজল।

রিসিভার তুলল রবিন। ওপাশের কথা শুনে মাউথপিসে হাত চাপা দিয়ে কিশোরকে বলল, 'হ্যামার।'

হাত বাড়াল কিশোর, 'দাও।'

'কে; কিশোর,' হ্যামার বলল, 'একটা সুখবর আছে, সেজন্যেই করলাম, হেগ ধরা পড়েছে।'

'আপনি কি করে জানলেন?'

'স্যান ডিয়েগোতে ধরা পড়েছে ও। ওখানে পুলিশের এক অফিসার আমার বন্ধু। সে ফোন করে জানিয়েছে। আর কোন চিন্তা নেই তোমাদের, সে আর জ্বালাতে পারবে না, এবার নিশ্চিন্তে কামান খুঁজতে পারো।'

'তা আমরা খুঁজছি। ও ধরা না পড়লেও বাধা দিয়ে ঠেকাতে পারত না। থ্যাংক ইউ।'

ফোন রেখে দিতে যাবে কিশোর, এই সময় চিৎকার করে বলল মুসা, 'কাটলাসের মধ্যে যে নকশা পেয়েছি, এ কথা বললে না?'

না বলার জন্যে চোখ টিপল কিশোর, কিন্তু যা বলার বলে ফেলেছে ততক্ষণে মুসা।

ওপাশ থেকে খুশি হয়ে বলল হ্যামার, 'অনেক এগিয়েছ দেখা যাচ্ছে। ভেরি গুড। চালিয়ে যাও।' কিশোর কিছু বলার আগেই বলল, 'আমিও শুনেছি, কাটলাসে গুপ্তধনের নকশা আছে। কিন্তু ওরকম কত গুজবই তো থাকে, সেজন্যে গুরুত্ব দিইনি, তোমাদেরও কিছু বলিনি। এখন তো দেখি সত্যি সত্যি পাওয়া গেল। নাহ্, তোমরা আসলেই ভাল গোয়েন্দা, ভুল শুনিনি।'

রিসিভার রেখে মুসার দিকে তাকাল কিশোর, 'তোমার আর বুদ্ধিসুদ্ধি হবে না! দিলে তো ফাঁস করে!'

'ওর কাজই তো করছি আমরা, ও আমাদের মক্কেল, তাই না? শুনলে কি হবে?'

'মক্কেল হোক আর যাই হোক, ওকে বিশ্বাস করি না আমরা।' জোরে একটা নিঃশ্বাস ফেলে ধপ করে টুলে বসে পড়ল কিশোর। 'যাকগে, যা হবার হয়েছে। দুপুর পর্যন্ত কি করে কাটানো যায় সেটা ভাবো এখন।'

'আর যখন কিছু করার নেই,' মুসা বলল, 'জঞ্জালগুলো সরাতে থাকি, যতটা পারি; কাজ এগিয়ে থাকল।'

'ঠিক এই কথাটাই ভাবছিলাম আমি।' উঠে দাঁড়াল কিশোর, 'চলো।'

ওকর্অশপ থেকে বেরিয়ে এল তিন গোয়েন্দা। দক্ষিণের বাগানের দিকে চলল।

দুপুর পর্যন্ত একটানা কাজ করল ওরা। তারপর গোসল করে, খেয়েদেয়ে বেরোল কোরি ভ্যালেন্টের সঙ্গে দেখা করতে।

বিশ

রকি বীচ শহরের একধারে ছোট, সুন্দর একটা বাড়িতে বাস করেন কোরি ভ্যালেন্ট। মাঝবয়েসী মহিলা। হাসিখুশি স্বভাবের জন্যে ছাত্ররা খুব পছন্দ করে তাঁকে।

বাগানের ছায়ায় বসে বই পড়ছেন মিস কোরি, গাড়ির শব্দে মুখ তুলে তাকালেন। গাড়ি রেখে তিন গোয়েন্দাকে নেমে আসতে দেখে হেসে ডাকলেন, 'এসো, এসো, তোমাদের জন্যেই বসে আছি। বার্থা বলল তোমরা নাকি ফোন করেছিলে। তা কি ব্যাপার? নতুন কোন রহস্য নাকি?'

কেন এসেছে জানাল কিশোর। পুরানো কাগজটা বের করে দিল।

চশমার ভেতর দিয়ে ভাল করে লেখাগুলো দেখলেন মিস কোরি। 'পর্তুগীজ ভাষায় লেখা।'

'কি লিখেছে?' জানতে চাইল কিশোর।

'সরি, আমি এটা বুঝতে পারছি না,' কাগজটার দিকে তাকিয়ে থেকে বললেন মিস কোরি, 'পর্তুগীজ আমি জানি না তেমন। তা ছাড়া এটা পুরানো আমলের ভাষায় লেখা তো, কিছুই বুঝতে পারছি না।'

দমে গেল কিশোর। সেটা বুঝতে পেরে হাসলেন মিস কোরি, 'অত নিরাশ হওয়ার কিছু নেই। পর্তুগীজ জানে এরকম একজনকে চিনি আমি। মিসেস এডিথ অ্যাকোনা, তাঁর ছেলে একটা মাছধরা জাহাজের ক্যাপ্টেন। দুজনের যে কারও সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারো।'

'ক্যাপ্টেনকে নিশ্চয় সব সময় পাওয়া যাবে না। তাঁর মায়ের সঙ্গেই দেখা করতে চাই।'

'ঠিকানাটা লিখে নাও।'

নোটবুক আর পেন্সিল বের করল রবিন। ঠিকানা লিখে নিল।

মিস কোরির বাড়ি থেকে বেরিয়ে সোজা ডক এরিয়ার দিকে রওনা হলো গোয়েন্দারা। ওদিকেই থাকেন মিসেস এডিথ অ্যাকোনা।

বাড়িটা খুঁজে পাওয়া গেল সহজেই। দরজা খুলে দিল এক কিশোরী। মিসেস এডিথ এ বাড়িতেই থাকেন কিনা জিজ্ঞেস করাতে জবাব দিল, থাকে। নিজের পরিচয় দিল, সে মিসেস এডিথের নাতনী, অনি।

বসার ঘরে তিন গোয়েন্দাকে নিয়ে গেল মেয়েটা। সেখানে একটা রকিং চেয়ারে বসে সেলাই করছেন এক বৃদ্ধা। ছেলেদের দেখে সেলাই বন্ধ করে, চশমাটা নাকের ওপর আরেকটু ঠেলে দিয়ে তাকালেন। ইশারায় বসতে বললেন।

অনি বলল, 'দাদু ইংরেজি তেমন বোঝে না। অসুবিধে নেই। আমি দোভাষীর কাজ চালাব।'

নিজেদের পরিচয় দিল কিশোর। ওরা তিন গোয়েন্দা শুনে আরও আগ্রহী হলো মেয়েটা। ওখান থেকে আর নড়তেই চাইল না।

কাগজটা বের করে দিল কিশোর।

ওটার ওপর ঝুঁকে পড়লেন বৃদ্ধা। খানিক পর মুখ তুলে হড়হড় করে একগাদা কথা বললেন পর্তুগীজ ভাষায়।

বোকার মত হাঁ করে তাকিয়ে রইল তাঁর দিকে মুসা। কিছুই বুঝল না। অনিকে জিজ্ঞেস করল, 'কি বললেন?'

'দাদু বলল, কাগজটাতে দিক নির্দেশ রয়েছে।'

'কিসের দিক?' জানতে চাইল কিশোর।

বিজাতীয় সেই খটমটে ভাষায় বৃদ্ধাকে কি জিজ্ঞেস করল মেয়েটা। আবার পর্তুগীজ ভাষার তুবড়ি ছুটল। ফিরে তাকিয়ে গোয়েন্দাদের বলল অনি, 'একটা কামানের কথা বলছে। কোথায় আছে কামানটা, সেটা জানানো হয়েছে।'

'খাইছে! পাওয়া গেল তাহলে!' বলে উঠল মুসা।

শান্ত রইল কিশোর। রবিনকে বলল, 'যা বলে লিখে নাও।' অনির দিকে ফিরে বলল, 'কোনখানে আছে ওটা বলতে বলো তোমার দাদুকে।'

খড়বড় করে আবার কি বললেন বৃদ্ধা। মনোযোগ দিয়ে সেটা শুনে অনি বলল, 'অদ্ভুত কথা বলছে। মানে করলে দাঁড়ায়—পাইরেটস কোভের ওপরে থেকে পশ্চিমে দেখতে হবে। জুলাই মাসের বিকেলে সূর্য অস্ত যায় যার মাথায় তার নিচে ডাইনে বিশ কদম গেলে মিলবে। গুপ্তধনের কামান ডেমিকালভেরিনকে বেদিতে রেখে উত্তরে খুঁজতে হবে গুপ্তধন।'

দ্রুত লিখে নিল রবিন।

অনি জিজ্ঞেস করল, 'এর মানে কি, কিশোর? পাইরেটস হিলে কোন গুহা আছে, কিংবা খাঁড়িটাড়ি, যার ওপরে রয়েছে কামানটা? গুপ্তধনের কামানের মানে কি?'

'এখনও জানি না, তবে মনে হয় ওই কামানের সাহায্যে কোনভাবে গুপ্তধনের সন্ধান মিলবে। যাই হোক, অনি, অনেক ধন্যবাদ তোমাকে আর তোমার দাদুকে। একটা অনুরোধ করব। কারও কাছে এ কথাটা ফাঁস করবে না। অপরিচিত কেউ এসে যদি জিজ্ঞেস করে আমরা এসেছিলাম কিনা, কিছু জেনেছি কিনা, বলবে না।'

'ঠিক আছে, বলব না,' কথা দিল অনি। 'এমনকি আমার বন্ধুদের কাছেও বলব না। যদিও তিন গোয়েন্দা আমাদের বাড়িতে এসেছিল একটা কেসের কাজে একথাটা চেপে রাখা খুব কঠিন…'

হাসল কিশোর। 'বেশিদিন চেপে রাখার প্রয়োজন পড়বে না। আমাদের কাজটা শেষ হয়ে গেলেই ফোন করে জানাব তোমাকে। যত ইচ্ছে ঢাকঢোল পিটিও।'

অনিদের বাড়ি থেকে বেরিয়ে মুসা জিজ্ঞেস করল, 'কোনদিকে যাব?'

'অবশ্যই পাইরেটস হিলে,' জবাব দিল কিশোর। 'আগে জ্যাক হুবার্টের বাড়িতে যেতে হবে, তার কাছে জেনে নেব পাইরেটস কোভটা কোনখানে। জলদি যাও, সূর্য ডোবার আগেই। ভাগ্যিস এটা জুলাই মাস, আমাদের অপেক্ষা করতে হবে না। এ মাসের কথাই লেখা আছে মেসেজে।'

বাড়িতেই পাওয়া গেল জ্যাককে। মেসেজের কথা শুনে লাফিয়ে উঠল। বলল, সেও যাবে গোয়েন্দাদের সঙ্গে। যেহেতু তার সাহায্য দরকার, কি খুঁজতে যাচ্ছে সেব্যাপারে মোটামুটি একটা ধারণা তাকে দিতেই হলো গোয়েন্দাদের। তবে অসুবিধে নেই—মনে হলো কিশোরের—এই লোককে বিশ্বাস করা যায়।

একুশ

পাইরেটস কোভে ছোট একটা গুহা আছে, সামনে খাঁড়িও আছে। ওপরে দাঁড়াতে বলা হয়েছে মেসেজে। তারমানে গুহার ওপরের পাহাড় চূড়ায় দাঁড়াতে বলেছে। সেখানে এসে উঠল তিন গোয়েন্দা আর জ্যাক।

সঙ্গে করে কম্পাস আর দূরবীণ নিয়ে এসেছে কিশোর। পশ্চিমে তাকাল। হেলে পড়েছে সূর্য। দ্রুত নেমে যাচ্ছে পশ্চিম দিগন্তে। সেদিকে একটা টাওয়ার দেখা গেল শুধু, আর কিছু নেই। সূর্যটা নামতে নামতে এমন এক অবস্থানে চলে এল, মনে হলো টাওয়ারের চোখা মাথায় একটা লাল বল বসে আছে। কয়েক মুহূর্ত ওভাবে থাকার পর কেমন দুমড়ে যেতে থাকল বলের নিচের অংশ, সূর্য নিচে নেমে যাওয়ায় টাওয়ারের মাথার জন্যে ওরকম লাগছে।

'ওই টাওয়ারের নিচেই আছে কামান,' ঘোষণা করল কিশোর, 'কোন সন্দেহ নেই আমার।'

মাটি খোঁড়ার জন্যে শাবল-বেলচা নিয়েই আসা হয়েছে জ্যাকের বাড়ি থেকে, পাহাড়ের নিচে রেখে এসেছে ওগুলো। তাড়াতাড়ি পাহাড় থেকে নেমে সেসব নিয়ে টাওয়ারের দিকে ছুটল ওরা। টাওয়ারের গোড়া থেকে ডান পাশে বিশ কদম সরে খুঁড়তে আরম্ভ করল।

আধঘণ্টার মধ্যেই মুসার শাবলে ঠং করে বাড়ি লাগল কি যেন। ওখানকার মাটি সরাতেই দেখা গেল কালো একটা ধাতব বস্তুর একাংশ। একবার দেখেই রায় দিয়ে দিল জ্যাক, ওটা কামান।

বাড়ি থেকে গিয়ে লণ্ঠন নিয়ে এল সে। সেই আলোয় মাটি খোঁড়া চলল। বেরিয়ে পড়ল কামানের শরীরের আরও অনেকখানি।

ডেমিকালভেরিনটাই। কোন সন্দেহ রইল না আর।

জিরাতে বসল ওরা। সেই সঙ্গে চলল আলোচনা। একটা সমস্যা দেখা দিয়েছে—কামানটা খুঁড়ে বের করতে অসুবিধে হবে না, কিন্তু এত ভারি প্রায় তেরো-চোদ্দ মন ওজনের একটা জিনিস এখান থেকে তুলে নিয়ে যাবে কি করে? তার জন্যে ক্রেনওয়ালা ট্রাক দরকার। সেটা দিনের বেলা ছাড়া হবে না।

'মেসেজ পড়ে বোঝা যাচ্ছে,' রবিন বলল, 'কামানটাই দেবে গুপ্তধনের দিক নির্দেশনা। সেটা কিভাবে?'

'পরে ভাবব,' কিশোর বলল। 'পুরো কামানটা আগে খুঁড়ে বের করি, তারপর সে সমস্যারও সমাধান করা যাবে। আসল প্রশ্ন এখন, এটা এখানে রেখে যাওয়া ঠিক হবে কি হবে না?'

সমাধান করে দিল জ্যাক, 'রাতে তো আর সরানো যাবে না। সুতরাং আমাদেরই এখানে থাকতে হবে। থেকে পাহারা দিতে হবে। মুসা আর আমি বরং চলে যাই, তেরপল-টেরপল নিয়ে আসিগে। রাতে ক্যাম্প করে থাকব এখানে।'

প্রস্তাবটা পছন্দ হলো কিশোরের। মুসাকে বলল, 'বাড়িতে একটা ফোন করে

দিয়ে এসো। বলবে, রাতে বাড়ি যেতে পারব না।'

তাঁবু টানানোর জন্যে তেরপল, দড়ি, খুঁটি ও একগাদা খাবার নিয়ে ফিরে এল মুসা আর জ্যাক। আগুন জ্বেলে খাবার রান্না করতে বসল রবিন। তাকে সাহায্য করল অন্য তিনজন। আগুনের কুণ্ড ঘিরে বসে গল্প করতে লাগল। সৈনিক জীবনের অনেক রোমাঞ্চকর গল্প শোনাল জ্যাক। সকাল হলেই চলে আসবে বলে অনেক রাতে বাড়ি ফিরে গেল সে।

পালা করে পাহারা দেয়ার সিদ্ধান্ত নিল তিন গোয়েন্দা। প্রথমে বসল রবিন। মুসা আর কিশোর ঘুমাতে গেল।

চাঁদ নেই, মেঘও নেই আকাশে। এই সাগরের পাড়ে খোলা জায়গায় অনেক বড় আর উজ্জ্বল লাগছে তারাগুলোকে। মনে হয় হাত বাড়ালেই ধরা যায়। সেদিকে তাকিয়ে রইল রবিন। কানে আসছে ঢেউ আছড়ে পড়ার একটানা শব্দ।

মাঝরাতে মুসাকে জাগাতে যাবে এই সময় পাহাড়ের ওপর একটা পাথর গড়িয়ে পড়ার শব্দ হলো। সেদিকে তাকাল সে। মনে হলো, পাথরের আড়ালে চলে গেল যেন একটা ছায়ামূর্তি।

অনেকক্ষণ তাকিয়ে থেকেও ছায়াটা দেখতে পেল না আর। ব্যাপারটাকে চোখের ভুল মনে করে আর বিশেষ গুরুত্ব দিল না। তাঁবুতে এসে মুসাকে জাগিয়ে দিল।

সবশেষে পাহারা পড়ল কিশোরের। বাইরে এসে বসল সে। সময় কাটতে লাগল। ফর্সা হয়ে এল পুবের আকাশ। সাগরের দিক থেকে আসছে মোটর বোটের ইঞ্জিনের শব্দ আর সী-গালের চিৎকার। মাছ ধরতে বেরিয়েছিল যে সব জেলে, গভীর সাগরে চলে গিয়েছিল, তারা ফিরে আসছে। জেটির দিকে চলেছে। এদিকটা খুব নির্জন। কেউ বড় একটা আসে না এদিকে।

ভাল করে আলো ফোটার পর মুসা আর রবিনকে ডেকে তুলল কিশোর। তাড়াতাড়ি নাস্তা সেরে নিয়ে রওনা হলো কামানটা খুঁড়ে তোলার জন্যে।

ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই গভীর একটা গর্ত হয়ে গেল কামানের চারপাশে। পুরোপুরি বেরিয়ে পড়ল ওটা। গা থেকে মাটি সরিয়ে ফেলতে দেখা গেল, চমৎকার অবস্থায় আছে ওটা। মরচে তেমন পড়েনি।

কামানের গায়ে খোদাই করা লেখাগুলো পড়ল রবিন। কামানের জাত, কোম্পানির নাম, সব খোদাই করে লেখা রয়েছে। ওপরের দিকে আরেকটা লেখার দিকে চোখ পড়ল ওর। ভাল করে মুছে নিল জায়গাটা। ব্যারেলের গায়ে কয়েকটা নম্বর লেখা রয়েছে: ৮-৪-২০। কিশোর আর মুসাকে ডেকে দেখাল লেখাটা। 'কিশোর, মানে কি এর?'

'হবে হয়তো কোন তারিখ,' মুসা বলল, 'যেদিন বানানো হয়েছে সেদিনকার।'

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে কিছু বোঝার চেষ্টা করছে কিশোর। মাথা নাড়ল, 'আমার মনে হয় না। এই লেখা কোম্পানি লেখেনি। নিচের দিকের লেখার স্টাইলের সঙ্গে মিলিয়ে দেখো, তফাৎটা ধরতে পারবে। দুটো লেখা এক নয়।'

ভাল করে দেখে মুসা আর রবিনও কিশোরের সঙ্গে একমত হলো।

'তাহলে কি মানে এর?' মুসার প্রশ্ন।

জুতোর শব্দে ফিরে তাকাল তিনজনে।

চমকে গেল মুসা, 'খাইছে! জলদস্যু! এই দিনের বেলায় ভূত!'

আরেকটু কাছে আসার পর চেনা গেল, জ্যাক হুবার্ট। এমন করে জলদস্যু সেজেছে, চেনাই যায় না। কাছে এসে হেসে বলল, 'বাহ্, খুঁড়ে ফেলেছ! আমার একটু দেরি হয়ে গেল...'

'নিশ্চয় জলদস্যু সাজতে,' হেসে বলল কিশোর।

মাথা ঝাঁকাল জ্যাক, 'একসেট জলদস্যুর পোশাকও আছে আমার, সেটাই পরে এলাম।'

গভীর আগ্রহ নিয়ে কামানটা দেখতে লাগল সে। নম্বরগুলোর মানে বুঝতে পারল না। হঠাৎ বলল, 'আগেকার দিনে অনেক সময় কাগজে লিখে গোলন্দাজদের কাছে মেসেজ পাঠাত কমাণ্ডার। সাঙ্কেতিক ভাষায় বুঝিয়ে দিত কত ওজনের গোলা কতদূরে ফেলতে হবে।'

নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটছিল কিশোর, ঝট করে মুখ তুলে তাকাল কিশোর, 'এটার কি মানে হয় তাহলে?'

'মেসেজ হলে বলা যেত আট পাউণ্ড ওজনের গোলা চার পাউণ্ড পাউডার দিয়ে বিশ ডিগ্রি এলিভেশনে ফেলতে হবে।'

দীর্ঘ একটা মুহূর্ত জ্যাকের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল কিশোর। তারপর লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল। উত্তেজিত ভঙ্গিতে প্রায় চিৎকার করে উঠল, 'বুঝে গেছি! কোথায় আছে গুপ্তধন!'

'কোথায়?' সমস্বরে চিৎকার করে উঠল মুসা আর রবিন।

'কামানটা যেখানে গোলা ফেলবে ঠিক সেইখানে!'

কিছুই না বুঝে হাঁ করে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে রইল দুই সহকারী গোয়েন্দা।

'দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে মেসেজটাকে,' বুঝিয়ে বলল কিশোর। 'প্রথম ভাগে রয়েছে পার্চমেন্টে লেখা মেসেজটা। লিখে কাটলাসের মধ্যে ভরে দেয়া হয়েছে। বলা হয়েছে কিভাবে কামানটা খুঁজে বের করতে হবে। কামানে লেখা রয়েছে কোন্ অ্যাঙ্গেলে কত ওজনের গোলা ফেলতে হবে। মেসেজে আরও বলা হয়েছে, কোনখান থেকে গোলাটা ছুঁড়তে হবে।'

'কোনখান থেকে?' উত্তেজনায় প্রায় ফিসফিস করে বলল মুসা, যেন জোরে বলতে ভয় পাচ্ছে।

চারপাশে তাকাতে শুরু করল কিশোর। প্রায় পঞ্চাশ গজ দূরে একটা চ্যাপ্টা উঁচু পাথর চোখে পড়ল, বেদির মত দেখতে। 'এখানে বেদি বলতে তো ওই একটা দেখছি। আমার মনে হয় ওটাই। মেসেজে বলা হয়েছে ডেমিকালভেরিনকে বেদিতে রেখে উত্তরে খুঁজতে হবে।'

'উত্তরে তো সাগর!' রবিনও উত্তেজিত।

জ্যাক হুবার্ট চুপ। তবে গোয়েন্দাদের উত্তেজনা তার মধ্যেও সংক্রামিত হয়েছে।

'তাহলে সাগরেই আছে গুপ্তধন,' গলা কাঁপছে কিশোরের। 'পানির নিচে

লুকানো।'

'চার পাউণ্ড বারুদ দিয়ে আট পাউণ্ড ওজনের গোলা ছুঁড়লে পানিতে যেখানে গিয়ে পড়বে সেখানেই গুপ্তধন পাওয়া যাবে, একথা বলেনি তো?' অনেকক্ষণ পর কথা বলল জ্যাক।

'হ্যাঁ, সেকথাই বলেছে।'

'আট পাউণ্ড ওজনের সেই পুরানো গোলা এখন কোথায় পাওয়া যাবে?' খানিকটা দমে গেল যেন মুসা। 'গোলা ছুঁড়তে না পারলে তো জানাও যাবে না কোনখানে আছে গুপ্তধন।'

'যাবে,' মাথা দোলাল কিশোর। 'কয়েকটা অঙ্ক করলেই বেরিয়ে পড়বে জায়গাটা। মিস্টার হুবার্ট, আপনি আমাকে সাহায্য করবেন।' রবিনের দিকে হাত বাড়াল সে, 'দেখি, কাগজ আর পেন্সিল দাও।'

কাগজ-পেন্সিল নিয়ে তৈরি হয়ে জ্যাকের দিকে তাকাল কিশোর, 'প্রথমেই বলুন, কামানটার ক্ষমতা কতখানি। সঠিক করে বলতে হবে, একটু এদিক-ওদিক হলেই হিসেবে ভুল হয়ে যাবে।'

'এক্ষুণি বলে দিচ্ছি,' পকেট থেকে একটা দর্জির ফিতে বের করল জ্যাক। কামানটা পরীক্ষা করার জন্যে তৈরি হয়েই এসেছে। কিশোরের দিকে তাকিয়ে হেসে বলল, 'ভুল হবে না, নিশ্চিন্ত থাকতে পারো। এতগুলো প্রমোশন দিয়ে খামোকা আমাকে গোলন্দাজ বাহিনীর সার্জেন্ট বানায়নি আমেরিকান আর্মি।'

বাইশ

হিসেবে করে দেখা গেল, তীর থেকে দুই হাজার গজ দূরে গিয়ে পড়ে কামানের গোলা। যেদিকটাতে নির্দেশ করা হয়েছে সেদিকে তাকিয়ে বলল জ্যাক, 'অবাক কাণ্ড! ওখানটাতেই তো গান পিকটা পেয়েছি আমি!'

'আমি আগেই সন্দেহ করেছিলাম কিছু আছে ওখানে,' কিশোর বলল, 'সেজন্যেই সেদিন নামতে চেয়েছিলাম। স্টিং-রেটা সব গুবলেট করে দিল। আমার কি ধারণা জানেন, যে দুটো জাহাজকে আক্রমণ করে একটাকে ডুবিয়ে দিয়েছিল জলদস্যুরা, সেই জাহাজটা ওখানে আছে। আর ওর মধ্যেই রয়েছে গুপ্তধন। আমি এখন শিওর, ওখানকার পানিতে ডুব দিলে কিছু না কিছু পাওয়া যাবেই।'

একটা গাড়ি এসে থামার শব্দ হলো। মুখ তুলে তাকাল সবাই। কে আবার এল?

অবাক হয়ে দেখল তিন গোয়েন্দা, গাড়ি থেকে নামল হ্যামার রকবিল। এগিয়ে আসতে লাগল ওদের দিকে। কাছে এসে চোখ বড় বড় করে তাকিয়ে রইল কামানটার দিকে। বিশ্বাস করতে পারছে না যেন। 'পেয়েই গেলে তাহলে!'

'আপনি আমাদের খোঁজ পেলেন কি করে?' জিজ্ঞেস করল কিশোর।

'তোমাদের বাড়িতে ফোন করেছিলাম। মিসেস পাশা বললেন কাল বিকেলে নাকি বেরিয়েছ, পাইরেটস হিলে গেছ, রাতে বাড়ি ফেরেনি। ভাবলাম, নিশ্চয় কিছু

একটা ঘটেছে। থাকতে না পেরে চলে এলাম।'

'ভালই করেছেন। আপনাকে খবর দিতে যেতে হত আমাদের, তার আর প্রয়োজন পড়বে না।'

'কামানটা তাহলে পেয়েই গেলে!' কামানের পাশে এসে বসল হ্যামার। হাত বোলাতে লাগল ওটার গায়ে। 'বের করলে কি করে? ছুরির ভেতরেই মেসেজ ছিল?'

'ছিল। পেলাম তো ঠিকই,' প্রশ্ন তুলল রবিন, 'কিন্তু এটার মালিকানা তো আপনার নয়। সরকারের। কামানটা নেবেন কি করে? কোস্ট গার্ডের লোক খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এসে তুলে নিয়ে যাবে, জমা দিয়ে দেবে কোন জাদুঘরে।'

হ্যামার হাসল। 'এ কথাটা কি আর আমি ভাবিনি মনে করেছ?' কোটের পকেট থেকে একটা লম্বা খাম বের করল। সেটা থেকে বের করল কয়েকটা কাগজ। 'এই যে, দলিল। পাঁচ বছরের জন্যে এখানকার কয়েকশো একর জায়গা আমি লীজ নিয়েছি সরকারের কাছ থেকে। টাকাও বুঝিয়ে দিয়েছি। এখন এখানকার জায়গা আর এর সমস্ত জিনিস ভোগ করার অধিকার আমার। সুতরাং কামানটা এখন আইনত আমার দখলে।'

কিশোর জিজ্ঞেস করল, 'নেবেন কখন?'

'এত ভারি একটা জিনিস নেয়া তো আর চাট্টিখানি কথা নয়। ট্রাক আনতে হবে। তবে তার আগে আরেকটা কাজ করতে চাই আমি।' জ্যাকের দিকে তাকাল হ্যামার। 'সার্জেন্ট, একটা অনুরোধ করব আপনাকে। কামানটা ঠিক আছে কিনা, ঠিকমত কাজ করে কিনা একবার দেখে দেবেন?'

কিশোরের দিকে তাকাল জ্যাক।

নীরবে মাথা কাত করল কিশোর।

জ্যাক বলল, 'দেখতে হলে গোলা ছুঁড়তে হবে। তা নাহলে বোঝা যাবে না কিছু। এসব কামানের সর্বোচ্চ ক্ষমতা নির্ধারণ করা হয় বারোশো গোলা, অর্থাৎ কোন ঝুঁকি ছাড়া বারোশো গোলা ছোঁড়া যাবে। গোলা ছুঁড়তে ছুঁড়তে কামানের ব্যারেলের ভেতরটা ক্ষয় হয়ে যেতে থাকে, পাতলা হয়ে গিয়ে ফেটে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। এরপর ওটা থেকে গোলা ছুঁড়তে হলে মারাত্মক বিপদের ঝুঁকি নিয়ে ছুঁড়তে হয়। ব্যারেল ফাটলে আর রক্ষা নেই, ছিন্নভিন্ন করে দেবে কাছাকাছি দাঁড়ানো গোলন্দাজকে।'

'সেইটাই আপনাকে দেখে দিতে বলছি,' অনুরোধের সুরে বলল হ্যামার। 'গোলা জোগাড় করতেও অসুবিধে হবে না। কোস্ট গার্ডের সঙ্গে আমি কথা বলে রেখেছি। একটা গোলা ওদের কাছ থেকে আনতে পারব। আর বারুদ তো কোন সমস্যাই না।'

হাতের কাছে কামান পেয়েছে, গোলবারুদ পেয়েছে, ছুঁড়তে পারলেই বরং খুশি হয় জ্যাক। সানন্দে রাজি হয়ে গেল। 'নিয়ে আসুন আপনার গোলা-বারুদ। শুনলাম মেলায় শো করবেন কামানটা। দর্শকদেরকে গোলা ছুঁড়ে দেখানোর কথাও ভাবছেন নাকি?'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, তাই ভাবছি,' হ্যামার বলল। 'আইনগত কোন বাধা আছে?'

'আমার জানা নেই। তবে বাধা না থাকারই কথা। বড়জোর অনুমতি নিতে হবে।'

তিন গোয়েন্দার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করতে লাগল হ্যামার। একসময় কাটলাসের প্রসঙ্গ তুলল। 'কিশোর, কাটলাসের ভেতর যে মেসেজটা পেয়েছ, আছে সঙ্গে?'

পকেট থেকে বের করে দিল কিশোর।

প্রায় ছোঁ মেরে ওর হাত থেকে কাগজটা নিয়ে নিল হ্যামার। দেখে বলল, 'ভাষা তো কিছু বুঝি না। তোমরা বুঝলে কি করে?'

'এ ভাষা জানে এমন একজনকে দেখিয়ে এর মানে বের করে লিখে এনেছি।'

'দেখি তো লেখাটা?'

রবিনের কাছ থেকে নোটবুকটা চেয়ে নিয়ে এগিয়ে দিল কিশোর।

অবাক লাগছে মুসা আর রবিনের। কিশোরের উদ্দেশ্যটা কি? হ্যামার যা চাইছে, সেটাই বের করে দেখাচ্ছে, ব্যাপার কি?

দীর্ঘ সময় ধরে মেসেজটার দিকে চেয়ে রইল হ্যামার। মুখ তুলে তাকাল চারপাশে। বেদিটার ওপর দৃষ্টি নিবদ্ধ হলো। আস্তে করে মুখ ফিরিয়ে নোটবুকটা ফিরিয়ে দিল রবিনকে। 'যাক, তোমাদের কাজ শেষ। আমার কামান আমি বুঝে পেয়েছি। এবার তোমাদের পাওনাটা দিয়ে দেয়া দরকার, কি বলো?' পকেট থেকে আনকোরা নতুন একতাড়া নোট বের করে পাঁচ হাজার ডলার গুণে দিল সে।

টাকাটা নিয়ে পকেটে রেখে দিল কিশোর। 'থ্যাংক ইউ।'

জ্যাকের দিকে ফিরল হ্যামার, 'গোলা ছুঁড়ে পরীক্ষা করবেন কখন?'

'আপনি যখন এনে দেবেন।'

'কোনখান থেকে ছোঁড়া যায়, বলেন তো?' বেদিটার দিকে তাকাল আবার হ্যামার। 'ওই ওখানে তুলে সাগরের দিকে করে ছুঁড়লেই মনে হয় ভাল হয়। তাতে কোন ক্ষতির সম্ভাবনা থাকবে না।'

চট করে কিশোরের দিকে তাকাল জ্যাক।

চোখ টিপল কিশোর।

রাজি হয়ে গেল জ্যাক, 'আমারও তাই মনে হয়। যান, নিয়ে আসুনগে আপনার গোলাবারুদ।'

'হ্যাঁ, যাচ্ছি। কামানটা ওখানে তোলার জন্যে ক্রেনও আনা দরকার।'

'যান, আমরা এখানে আছি। পাহারা দিচ্ছি বসে। গোলা ছোঁড়া দেখারও লোভ হচ্ছে।'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, বসো বসো। আমার আসতে দেরি হবে না।'

তাড়াহুড়া করে উঠে চলে গেল হ্যামার।

গাড়িটা চলে যাওয়ার পর মুসা জিজ্ঞেস করল, 'মতলবটা কি তোমার, কিশোর? এত সহজেই তাকে মেসেজটা দেখিয়ে দিলে?'

মুচকি হাসল কিশোর। 'তুমি আর রবিন বসো। কামান পাহারা দাও। আমি কয়েকটা জরুরী ফোন সেরে আসি। মিস্টার হুবার্ট, আপনি কি বসবেন?'

'না, আমি বাড়ি যাব। তোমাদের জন্যে খাওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে না।'

ঘণ্টা তিনেকের মধ্যেই ফিরে এল হ্যামার। সঙ্গে ক্রেন নিয়ে এসেছে। কামানটা বেদিতে তুলে বসাতে আরও আধঘণ্টামত লাগল। কামানের ব্যারেল পরিষ্কার করল জ্যাক। তাতে গোলাবারুদ ভরে তৈরি হলো।

সাগরের দিকে মুখ করে বসানো হয়েছে কামানের নল।

মশালে আগুন ধরিয়ে গোলা ছোঁড়ার জন্যে তৈরি হলো জ্যাক। বেদির কাছ থেকে দূরে দাঁড়িয়ে আছে তিন গোয়েন্দা, হ্যামার, আর ক্রেনের ড্রাইভার। সবার দৃষ্টি জ্যাকের দিকে।

প্রচণ্ড কৌতূহল আর উত্তেজনায় কাঁপছে সার্জেন্ট। বেদিতে দাঁড়িয়ে চিৎকার করে নিজেই নিজেকে কমাণ্ড দিল: ওয়ান···টু··· থ্রি···ফায়ার!

বারুদে আগুন লাগাল সে।

বুম্‌ম্‌ করে বিকট গর্জন করে উঠল পুরানো কামান। একঝলক কমলা আগুন মেশানো কালো ধোঁয়া বেরোল নলের মুখ দিয়ে। দুই হাজার গজ দূরে সাগরের পানিতে গিয়ে পড়ল গোলা। পানি ছিটকে উঠল।

চট করে দুই সহকারীর দিকে তাকাল কিশোর। হাসল। চোখে চোখে কথা হয়ে গেল ওদের। কিশোরের হিসেব একেবারে সঠিক। যেখানটায় আন্দাজ করেছিল ঠিক সেখানেই গিয়ে পড়েছে কামানের গোলা। জ্যাকের দিকে তাকিয়ে দেখল সেও হাসছে।

হ্যামারের চোখেও হাসি ফুটেছে। কোন সন্দেহ রইল না আর গোয়েন্দাদের, গুপ্তধনের কথা জানা আছে তার। কামানটা খুঁজে বের করার জন্যে অস্থির হয়ে উঠেছিল সেজন্যেই। কিশোরের কাছ থেকে নিয়ে মেসেজটা দেখেছে। গোলা ছুঁড়ে নিশ্চিত হয়ে নিয়েছে গুপ্তধন লুকানো আছে কোনখানে।

অবাক হয়ে কামানটার দিকে তাকিয়ে আছে ক্রেন ড্রাইভার। বিশ্বাস করতে পারছে না মাটির নিচ থেকে খুঁড়ে তোলা এত পুরানো একটা কামান সত্যি সত্যি গোলা ছুঁড়তে পারে।

কামানটা ট্রাকে তোলার নির্দেশ দিল হ্যামার।

সেই দিনই সন্ধ্যার পর। পাইরেটস হিলের পাহাড়ে উঠে পাথরের আড়ালে লুকিয়ে আছে তিন গোয়েন্দা। ওদের সঙ্গে রয়েছে জ্যাক হুবার্ট, ক্যাপ্টেন ইয়ান ফ্লেচার, আর অফিসার মরিস ডুবয়। সাগরের দিকে চোখ সবার।

তিন ঘণ্টা ধরে বসে আছে ওরা।

আবার ঘড়ি দেখল মুসা, 'দশটা তো বাজে। আর কখন আসবে?'

'আসবে,' ফিসফিস করে বলল কিশোর, 'আজ রাতেই কাজটা সারবে ওরা। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব জিনিসগুলো তুলে নিয়ে কেটে পড়ার চেষ্টা করবে। কারণ জানাজানি হয়ে যাওয়ার ভয় আছে। তাহলে ঝাঁকে ঝাঁকে এসে হামলে পড়বে ওখানে গুপ্তধন শিকারিরা।'

একটা মোটর বোটের ইঞ্জিনের শব্দ শোনা গেল।

'ওই যে, আসছে,' বলল কিশোর।

পাহাড়ের বাঁক ঘুরে এগিয়ে এল বোটটা। আলো নিভিয়ে রেখেছে। কামানের গোলা যেখানটায় পড়েছিল ঠিক সেখানে এসে থামল। নোঙর ফেলল। ডাইভ দিয়ে পানিতে পড়ল দুজন ডাইভিং স্যুট পরা লোক, একজন বসে রইল বোটে।

আধঘণ্টা পর ভেসে উঠল দুজনে। ওপরের লোকটাকে কিছু করার নির্দেশ দিল বোধহয় একজন। কি যেন পানিতে ফেলল সে।

'আমার মনে হয় দড়িতে বেঁধে জালের থলি নামিয়েছে,' কিশোর বলল। 'গুপ্তধন তোলার জন্যে।'

'কি হতে পারে, বলো তো?' মুসার প্রশ্ন।

'জালের থলি যখন, যদ্দুর সম্ভব সোনার বার হবে। মোহর হলে জাল নিত না, ফাঁক দিয়ে পড়ে যাবে।'

'আমারও তাই মনে হয়,' ক্যাপ্টেন বললেন। 'যখনকার জিনিস তুলছে ওরা, তখন বাইরের দেশের সঙ্গে ব্যবসা করতে সোনার ইঁট ব্যবহারের নিয়ম ছিল।'

প্রায় দুই ঘণ্টা ধরে ডোবাডুবি করল ডুবুরিরা। তারপর বোটে উঠে বসল। আর কেউ নামল না পানিতে।

'সময় হয়েছে,' বললেন ক্যাপ্টেন। অয়্যারলেস বের করে মুখের কাছে ধরলেন। দ্রুত নির্দেশ দিতে লাগলেন।

বোটের ইঞ্জিন স্টার্ট নিল। সঙ্গে সঙ্গে পাইরেট কোভের ভেতর থেকে জ্বলে উঠল শক্তিশালী সার্চ লাইট। সোজা গিয়ে পড়ল বোটের ওপর। আরেকটা বড় বোটের ইঞ্জিন গর্জে উঠল। পাইরেটস কোভের ভেতর ঘাপটি মেরে ছিল এতক্ষণ। ক্যাপ্টেনের নির্দেশের অপেক্ষায় ছিল।

পাহাড়ের দেয়ালে আড়াল করা খাঁড়ি থেকে বেরিয়ে এল কোস্ট গার্ডের বোট। ডেকে দাঁড়ানো ক্যাপ্টেনের কণ্ঠ শোনা গেল, মুখের কাছে মেগাফোন তুলে বোটের লোকদের থামতে বলছেন তিনি। সাবধান করছেন, পালানোর চেষ্টা করলে গুলি করে ঝাঁঝরা করে দেয়া হবে বোট।

পালানোর চেষ্টা করল না বোটের লোকগুলো। ইঞ্জিন বন্ধ করে দিল।

উঠে দাঁড়ালেন ক্যাপ্টেন। 'চলো, আমরাও যাই। দেখে আসি কি জিনিস তুলল ওরা।'

তেইশ

'অনেকদিন পর দেখা হবে, তাই না?' মুসা বলল, 'আমার কেমন জানি লাগছে।'

'কেমন লাগছে, অস্বস্তি?' রবিনের প্রশ্ন।

'অনেকটা ওই রকমই।'

'অস্বস্তি লাগার কি হলো?' ঘড়ি দেখল কিশোর। 'হ্যানসনের আসার সময় হয়ে গেছে। চলো, গেটের কাছে গিয়ে দাঁড়াই।'

ইয়ার্ডের গেটে বেরিয়ে এল তিন গোয়েন্দা। আসতে দেখল গাড়িটাকে।

মসৃণ গতিতে সামনে এসে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে গেল রাজকীয় রোলস রয়েস।

ইঞ্জিনের শব্দ প্রায় শোনাই গেল না। ড্রাইভিং সীটের দরজা খুলে নামল ইংরেজ শোফার হ্যানসন। হ্যাট খুলে তিন গোয়েন্দাকে সালাম জানিয়ে পেছনের দরজা খুলে দিয়ে দাঁড়াল ওদের ওঠার জন্যে।

উঠে বসল তিন গোয়েন্দা।

'কোথায় যাব?' জিজ্ঞেস করল হ্যানসন।

'মিস্টার ক্রিস্টোফারের অফিসে,' বলল কিশোর।

আমেরিকার বাইরে একটা ছবির শুটিঙে গিয়েছিলেন বিখ্যাত পরিচালক ডেভিস ক্রিস্টোফার। কাজ শেষ করে ফিরে এসেছেন দুদিন আগে। এসেই ফোন করেছেন তিন গোয়েন্দাকে। ওদের খোঁজখবর নিয়েছেন, নতুন কোন কেস আছে কিনা জানতে চেয়েছেন। রবিন জানিয়েছে, একটা কেস সবেমাত্র শেষ করেছে ওরা—পুরানো কামান উদ্ধারের কাহিনী। ফাইল লেখা চলছে। পরিচালক অনুরোধ করেছেন, লেখা শেষ করেই যেন তাঁর সঙ্গে দেখা করে ওরা। ছবি করার জন্যে একটা নতুন কাহিনী দরকার তাঁর।

লেখা শেষ হলো। ভাঙা জেলপি গাড়িতে করে অতবড় পরিচালকের সঙ্গে দেখা করতে যেতে অস্বস্তি লাগছিল মুসার, চিন্তাভাবনা করে বলল, 'অ্যাই কিশোর, রোলস রয়েসটাতে করে গেলে কেমন হয়? বহুদিন চড়ি না।'

সঙ্গে সঙ্গে রাজি হয়ে গেছে কিশোর, 'খুব ভাল হয়।' রেন্ট-আ-রাইড অটো রেন্টাল কোম্পানির অফিসে ফোন করে হ্যানসনের সঙ্গে কথা বলেছে। বলে দিয়েছে কখন গাড়িটা ওদের দরকার। কথামত আজ এসে হাজির হয়েছে হ্যানসন। ওদের নিয়ে চলেছে ডেভিস ক্রিস্টোফারের অফিসে।

স্টুডিওর গেটে দারোয়ান বাধা দিল না। গাড়িটা চেনে। দেখামাত্র খটাশ করে স্যালুট ঠুকল।

চিত্রপরিচালকের অফিসে ঢুকল তিন গোয়েন্দা। বিশাল ডেস্কের ওপাশে বসে আছেন তিনি। হেসে স্বাগত জানালেন। হাত বাড়ালেন রবিনের দিকে, 'দেখি, ফাইলটা দাও আগে। পড়ি।'

টেবিলের ওপর দিয়ে ফাইল বাড়িয়ে দিল রবিন।

ফাইলে ডুবে গেলেন পরিচালক। অপেক্ষা করতে লাগল তিন গোয়েন্দা।

পড়া শেষ করে মুখ তুললেন তিনি, রবিনের দিকে তাকালেন, 'হুঁ, চমৎকার। এবার কয়েকটা প্রশ্নের জবাব দাও দেখি। প্রথম প্রশ্ন, পানির নিচে স্পীয়ার গান নিয়ে যে লোকটা তোমাদের আক্রমণ করেছিল, তার সঙ্গে এ কাহিনীর কি কোন সম্পর্ক আছে?'

'আছে, স্যার,' জবাব দিল রবিন, 'ওই লোক হ্যামার রকবিলের ভাড়াটে ডুবুরি। রকি বীচের উপকূলে যেসব জায়গায় জাহাজ ডুবেছে, সেসব জায়গায় কামান খুঁজতে ভাড়া করেছিল ওকে হ্যামার। আমাকে আর মুসাকে দেখে লোকটা ভাবে আমরাও বুঝি একই কাজে নেমেছি। ওর কাজে বাধা হয়ে দাঁড়াব ভেবে আমাদের ভয় দেখিয়ে তাড়ানোর জন্যে বর্শা ছুঁড়েছে।'

'তোমরা যখন খোঁজাখুঁজি করলে, ও লুকিয়েছিল কোথায়?'

'পাথরের আড়ালে।'

'এই গুপ্তধন উদ্ধারের সঙ্গে বার্ড আর হেগের কি সম্পর্ক?

'গোড়া থেকেই বলি,' কাশি দিয়ে গলা পরিষ্কার করে নিল রবিন। 'হ্যামার রকবিলের আসল নাম মিচি ল্যাংকার। জাল শেয়ার বিক্রির অপরাধে লস অ্যাঞ্জেলেসে ধরা পড়েছিল, জেল খাটে লণ্ডটন জেলখানায়। ওখানে পরিচয় হয় বার্ডের সঙ্গে। কথায় কথায় বার্ড কামানটার কথা বলেছিল ওকে। সে জেনেছিল হেগের কাছ থেকে। এক লাইব্রেরিতে হেগের সঙ্গে দেখা হয় ওর। দুজনেই পুরানো কামানের ব্যাপারে আগ্রহী হওয়ায় আলাপ-পরিচয় হতে দেরি হয়নি। হেগ তখন নেভি থেকে অবসর নিয়েছে, কামানটা খোঁজার কথা ভাবছে, সেজন্যেই লাইব্রেরিতে গিয়ে পুরানোর কামানের ওপর পড়াশোনা করছিল। ডেমিকাল-ভেরিনটার ব্যাপারে উৎসাহী হয়ে উঠল বার্ড, কিন্তু খুঁজতে বেরোনোর আগেই চুরির দায়ে ধরা পড়ে জেলে ঢুকল।

'জেলে বসে বার্ডের মুখে কামানের গল্প শুনে মনে মনে হ্যামারও উৎসাহী হয়ে উঠল। ঠিক করল, জেল থেকে বেরিয়েই কামানটা খোঁজা শুরু করবে। তবে সেকথা বলল না বার্ডকে।

'জেল থেকে আগে ছাড়া পেল হ্যামার। বেরিয়েই ডুবুরি লাগাল কামান খোঁজার জন্যে। নিজে অন্যভাবে খুঁজতে লাগল কামানটা। এ ভাবেই একদিন আমাদের কথা জানতে পারল সে, দেখা করল আমার আর মুসার সঙ্গে।

'ততদিনে বার্ডও ছাড়া পেয়েছে। রকি বীচে হ্যামারকে ঘোরাফেরা করতে দেখে সন্দেহ হলো তার, দু'চার দিন পেছনে লেগে থেকেই বুঝে গেল কি করছে সে। সেও তখন কামান খুঁজতে লেগে গেল। শুরু হলো প্রতিযোগিতা, কার আগে কে কামানটা খুঁজে বের করবে। একটা মোটর সাইকেল হলে ঘোরাফেরা করতে সুবিধে, তাই কেসেলরিংটা চুরি করল সে, আস্তানা গাড়ল বনের ভেতরের পোড়ো কেবিনটাতে।

'সে জানত, কামানটা খুঁজে বের করতে হলে কাটলাসগুলো খুঁজে বের করতে হবে আগে। জানতে পারল, হিসটরিকাল সোসাইটিতে আছে ওগুলো। দেখে এল গিয়ে একদিন। ঠিক করল, চুরি করতে হবে। নিজে দাগী হয়ে গেছে, চুরি করতে গেলে পুলিশের চোখে পড়ে যেতে পারে, আবার তাকে ধরে নিয়ে গিয়ে জেলে ভরে দিতে পারে, তাই ম্যাক ওয়াকারকে পাকড়াও করল।

'ম্যাকের সঙ্গে এক পার্কে দেখা হয়েছে বার্ডের। হিরোইন খেয়ে নেশা করেছে তখন ম্যাক। অনেক টাকার লোভ দেখিয়ে ওকে দিয়ে কাটলাসগুলো চুরি করাল বার্ড। কিন্তু কথামত টাকা দিতে পারল না, এক হাজার ডলার দেবে বলেছিল ম্যাককে। সবে জেল থেকে ছাড়া পেয়েছে বার্ড, এত টাকা একসঙ্গে পাবে কোথায়? জোগাড়ও করতে পারল না, দিতেও পারল না। নেশা করার টাকার জন্যে তখন কাটলাসগুলো হেভেনফোর্থের কাছে বিক্রি করে দিল ম্যাক। পুলিশের ভয়ে বাড়ি থেকে পালিয়ে গেল। গিয়ে উঠল এক বন্ধুর বাড়িতে। লুকিয়ে রইল।

'কামান খোঁজায় প্রতিযোগিতা বন্ধ করার জন্যে হুমকি দিয়ে চিঠি লিখে হ্যামারকে ভয় দেখাতে লাগল বার্ড, তাতে কর্ণপাত না করায় ঘরে ঢুকে বাড়ি মেরে তাকে বেহুঁশ করল; সেই সঙ্গে চিঠি দিয়ে, টেলিফোন করে আমাদেরও হুমকি দিতে

লাগল, যাতে কামানটা না খুঁজি। কিন্তু এত কিছু করেও কাউকে ঠেকাতে পারল না সে। ওদিকে আরেক প্রতিদ্বন্দ্বী উদয় হয়েছে তখন, হেগ ব্রাইটন। গন্ধ শুঁকে শুঁকে সেও এসে হাজির হয়েছে রকি বীচে, কামানটা খুঁজতে।'

একটানা কথা বলে গলা শুকিয়ে গেল রবিনের। বলল, 'পানি খাব।'

বেল বাজিয়ে বেয়ারাকে ডাকলেন পরিচালক। পানি আনতে বললেন। মুসার দিকে তাকিয়ে মিটিমিটি হাসলেন, 'তোমার কিছু চাই?'

'ইয়ে···না···এই একটা ছোটখাটো আইসক্রীম হলেই চলবে।'

'লজ্জা পাচ্ছ নাকি? বদলে গেছ তুমি, মুসা আমান, খাওয়ার কথা বলতে তোমার তো কোন লজ্জা ছিল না কখনও।'

'আসার সময় ও বলছিল,' কিশোর বলল, 'ওর নাকি অস্বস্তি লাগছে। অনেকদিন পর দেখা তো···'

'ওরকম হয়, আমারও হয়। অনেকদিন পর অতি পরিচিত কারও সঙ্গে দেখা করতে যেতে কেমন যেন লাগতে থাকে। কেমন একটা সঙ্কোচ···কিন্তু বেশিক্ষণ তো সেটা থাকার কথা নয়। অনেকক্ষণ হয়েছে এসেছে, এতক্ষণে কেটে যাওয়া উচিত। শোনো, একটা কথা বলে রাখি, অনেকদিন পর আমার অফিসে এসেছ, শুধু আইসক্রীম খাইয়ে আমি তোমাদের বিদেয় করতে পারব না।'

হাসল মুসা। ঝিক করে উঠল সাদা দাঁত, অস্বস্তি কেটে যাচ্ছে, 'কি খাওয়াবেন, স্যার?'

'মনে মনে ভাবতে থাকো, কি খেতে সবচেয়ে ভাল লাগবে তোমার, ততক্ষণ আমি কাহিনীটা শুনে নিই।' রবিনের পানি খাওয়া শেষ হলে তার দিকে তাকালেন পরিচালক, 'হ্যাঁ, হেগ ব্রাইটন এসে ঢুকল রকি বীচে। তারপর?'

'এসেই চোখে পড়ে গেল বার্ড আর হ্যামারের। দুজনেই লাগল তার পেছনে, বিশেষ করে হ্যামার, ওকে রকি বীচ থেকে বিদেয় করার জন্যে উঠেপড়ে লাগল। শেষ পর্যন্ত কাটলাস দেবার কথা বলে পাইরেটস হিলের ছাউনিতে টেনে নিয়ে গিয়ে বন্দি করল। ছাউনি থেকে সেদিন হ্যামারের ভাড়াটে গুণ্ডারাই ধরে নিয়ে গিয়েছিল হেগকে। আটকে রেখেছিল একটা বাড়িতে। হ্যামার ধরা পড়ার পর তার কাছ থেকে জেনে নিয়ে হেগকে উদ্ধার করে এনেছে পুলিশ।'

কিশোর বলল, 'হ্যামারের ভয় ছিল, হেগকে খুঁজতে পারি আমরা, সেজন্যে ফোন করে আমাদের জানিয়ে দিয়েছিল পুলিশের হাতে ধরা পড়েছে সে।'

'হেগ ব্রাইটন গুপ্তধনের কথা জানল কার কাছে?' জিজ্ঞেস করলেন পরিচালক।

রবিনের দিকে তাকাল কিশোর, 'তুমি বলো।'

'সতেরোশো ষাট সালে যে দুটো জাহাজের একটা জলদস্যুদের হামলার শিকার হয়েছিল, সেটাতে বাক্সবোঝাই সোনার বার ছিল অনেক। সেগুলো পেয়ে যাওয়াতেই আর দ্বিতীয় জাহাজটাকে তাড়া করেনি জলদস্যুদের সর্দার। জাহাজ তীরে ভেড়ানোর আদেশ দেয়। জলদস্যুদের দমন করার জন্যে তখন ওখানকার পাহাড়ে ওত পেতে ছিল আমেরিকান আর্মি। দস্যুরা তীরে নামতে না নামতেই আক্রমণ শুরু করে তারা। জলদস্যুদের বেশির ভাগই মারা পড়ে সেই আক্রমণে।

সর্দারও বাঁচতে পারেনি। গোলার আঘাতে ডাকাতের জাহাজের সঙ্গে সঙ্গে বাণিজ্য তরীটাও ডুবে যায়।

'বন্দি হওয়া এক ডাকাতের মুখে সোনার বারগুলোর কথা জানতে পারে আর্মিদের কমাণ্ডার হিরাম ব্রাইটন। কোনখানে জাহাজটা ডুবেছে সেটার নিশানা রাখার জন্যে অসাধারণ এক উপায় বের করে। একটা ডেমিকালভেরিন কামানের গায়ে মেসেজ লিখে সেটাকে পুঁতে রাখে মাটির নিচে।

'তবে সেই সোনা আর তুলে আনতে পারেনি সে কোনদিনই। যুদ্ধে আহত হয়ে মারা যায়। সোনাগুলো যাতে তার পরিবারের কেউ এসে তুলে নিয়ে যেতে পারে সে জন্যে আহত অবস্থায় আরেকটা মেসেজ লিখে কাটলাসে ভরে তার স্ত্রী মিরা ব্রাইটনের কাছে পাঠানোর ব্যবস্থা করে।

'কিন্তু সোনাগুলো আর উদ্ধার করতে যায়নি মিরা ব্রাইটন। জলদস্যুর লুট করা জিনিস ভোগ করার রুচি হয়নি মহিলার। তার লেখা একটা ডায়রি উত্তরাধিকার সূত্রে হাতে এসে পড়েছে হেগ ব্রাইটনের। সেটা থেকেই জানতে পেরেছে কাটলাস, কামান আর সোনার বারের কথা।' এক মুহূর্ত থামল রবিন। 'গুপ্তধন উদ্ধার করতে গিয়ে এই বিপদে পড়ত না সে, যদি কথায় কথায় বার্ডের কাছে কামানটার কথা বলে না ফেলত।'

'সেজন্যেই কথা যত কম বলা যায় তত ভাল,' পরিচালক বললেন। 'এবার বলো, সেই খেপা ড্রাইভারের কথা, ম্যাকের বাড়ি থেকে ফেরার পথে তোমাদের ধাক্কা দিতে চেয়েছিল যে। তাকে ধরা গেছে?'

'না, স্যার,' জবাবটা দিল কিশোর, 'তবে মনে হয় এ কেসের সঙ্গে এর কোন সম্পর্ক নেই। বৃষ্টির মধ্যে বেপরোয়া গাড়ি চালাচ্ছিল, অনেকেই তো চালায় ওরকম, দুর্ঘটনা ঘটিয়ে খুন করে।'

'হ্যাঁ, ওরকম কিছু নির্বোধ খারাপ লোক সব দেশেই থাকে, নিজেদের খামখেয়ালিপনার জন্যে অন্যের ক্ষতির কারণ হয়। এদের বিরুদ্ধে কিছু করার নেই। যাকগে, আর একটামাত্র প্রশ্ন,' এক আঙুল তুললেন পরিচালক, 'সেই কামানটার কথা বলো। পাহাড়ের ওপর থেকে যেটা ধসে পড়ে হারিয়ে গেছে, ওটা নিশ্চয় ডেমিকালভেরিনটা নয়?'

'না,' জবাব দিল কিশোর। 'সেটা অন্য কোন কামান।'

'হুঁ, তাই হবে।' মুসার দিকে তাকালেন পরিচালক, 'কি, কি খাবে ঠিক করলে?'

একগাল হাসল মুসা। গড়গড় করে ফিরিস্তি দিতে থাকল খাবারের।

মুচকি হাসলেন পরিচালক, 'নাহ্, ভুল বলেছি আমি, তুমি আগের সেই মুসাই আছো, একটুও বদলাওনি।'

রকি বীচে ফেরার পথে হঠাৎ বলল হ্যানসন, 'একটা গাড়ি অনেকক্ষণ থেকে আমাদের ফলো করছে।'

'তাই নাকি,' অবাক হলো কিশোর, 'কেস তো শেষ, এখন কে ফলো করবে?'

ফিরে তাকাল তিনজনেই।

মুসা বলে উঠল, 'আরি, সেই গাড়িটা মনে হচ্ছে! বৃষ্টির মধ্যে আমাদেরকে সেদিন ধাক্কা দিতে চেয়েছিল যেটা!'

তার কথা শুনে ভাল করে তাকাল কিশোর আর রবিন। হলুদ রঙের ঝকঝকে নতুন একটা স্পোর্টস কার।

'হ্যানসন,' কিশোর বলল, 'গতি বাড়ান তো, দেখি কি করে?'

নিঃশব্দে গতি বেড়ে গেল রোলস রয়েসের। পেছনের গাড়িটাও গতি বাড়িয়ে দিল। জোরাল ইঞ্জিন ওটারও। সমান তালে এগিয়ে আসছে। আর কোন সন্দেহ নেই, ওদেরকে অনুসরণ করছে ওটা।

'গতি কমান,' কিশোর বলল, 'পথের পাশে রাখুন। তারপর দেখি কি করে?'

গাড়ি থামাল হ্যানসন। ধরা পড়ে গেছে এটা বুঝেই বোধহয় গতি কমালেও থামল না পেছনের গাড়িটা। পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় ঘ্যাচ করে ব্রেক কষল। নোংরা দাঁত বের করে গোয়েন্দাদের দিকে তাকিয়ে হাসল ঢেঙ্গা একটা ছেলে, ওদের চেয়ে সামান্য বড় হবে, হাসি তো না, মনে হলো যেন ভেঙচি কাটল। হো হো করে হেসে উঠল ওর পাশে আর পেছনে বসা আরও কয়েকটা ছেলে।

'আরি, শুঁটকি!' চিৎকার করে উঠল মুসা।

'যাক, চিনতে তাহলে পেরেছ,' খিকখিক করে হাসল টেরিয়ার ডয়েল, 'এতদিন পরেও ভোলনি দেখে খুশি হলাম।'

'শুঁটকির দুর্গন্ধ কি আর সহজে ভোলা যায়,' তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলল কিশোর।

কিছুই মনে করল না টেরিয়ার, হাসিটা বাড়িয়ে দিয়ে বলল, 'রকি বীচে থাকব কিছুদিন, আবার দেখা হবে,' বলে শাঁ করে গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে গেল।

****

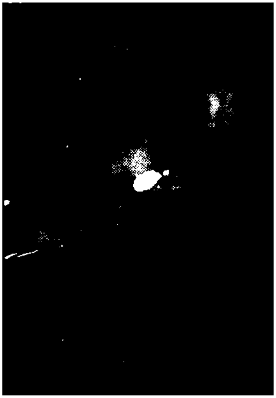

গেল কোথায়

প্রথম প্রকাশ: ১৯৯৭

ঘড়ি দেখল রবিন। এই নিয়ে অন্তত পঞ্চাশ বার হলো। এখনও আসছে না কেন মা আর বাবা?

বাড়িতে জন্মদিনের পার্টি দিচ্ছে সে। বেশি লোককে দাওয়াত করেনি। স্কুলের ঘনিষ্ঠ কয়েকজন বন্ধুকে শুধু। তালিকায় মুসা আর কিশোর অবশ্যই রয়েছে, তবে কিশোর আসতে পারেনি। হঠাৎ করে জ্বর হয়েছে ওর।

মাস দুয়েক হলো এই নতুন বাড়িতে উঠেছে রবিনরা। ভূমিকম্পে আগের বাড়িটার একপাশ ধসে পড়ায়, ওটাতে আর থাকা সম্ভব হয়নি। মেরামত করতে সময় লাগবে। তাড়াহুড়োয় কাছাকাছি কোন বাড়ি না পেয়ে রকি বীচের বাইরে ব্ল্যাক ফরেস্টের এই বাড়িটা কিনেছেন ওর বাবা মিস্টার মিলফোর্ড।

পুরানো বাড়ি। গলিটার নাম অদ্ভুত—গোস্ট লেন। পেছনে ঘন বন। নাম ব্ল্যাক ফরেস্ট। বনের নামেই নামকরণ হয়েছে ছোট্ট শহরটার। গোস্ট লেন এবং তার পেছনের এলাকার খুব বদনাম। লোকে বলে ভূত আছে। আশ্চর্য ভূতুড়ে সব ভয়ঙ্কর ঘটনা ঘটে। নিখোঁজ হয়ে যায় মানুষ। রাতের বেলা বন থেকে ভেসে আসে নেকড়ের ডাকের মত ডাক। রোম খাড়া করে দেয় সেই চিৎকার।

এ সব গল্প বিশ্বাস করে না রবিন। কিন্তু মুসা করে।

আবার ঘড়ি দেখল রবিন। রাত বাজে নয়টা। কি হয়েছে? এত দেরি করছে কেন? মা তো অন্তত চলে আসতে পারত? পার্টি দেয়ার কথা জানে। একটু আগেই অফিস থেকে চলে আসতে বলেছিল সে। আগে তো এলই না, বরং দেরি করছে।

রবিনের বাবা একটা বড় পত্রিকায় চাকরি করেন। কিছুদিন হলো, মিসেস মিলফোর্ডও একই অফিসে চাকরি নিয়েছেন। একসঙ্গে অফিসে যান দুজনে, একসঙ্গে ফেরেন। মাঝে মাঝে মিস্টার মিলফোর্ডের বেশি কাজ পড়ে গেলে অবশ্য একা ফেরেন রবিনের মা।

লিভিং রুমে হই-চই করছে সবাই। একটা বড় সোফায় হানির সঙ্গে লুডু খেলছে মুসা। এই মেয়েলি, পুরানো আমলের খেলায় যে কি মজা পায় সে, বোঝে না রবিন। তবে হানির সঙ্গে খেলছে বলেই বোধহয় মজা পাচ্ছে। কয়েক মিনিট পর পরই 'চোর! চোর!' বলে চেঁচিয়ে উঠছে হানি। মিনমিন করে প্রতিবাদ করছে মুসা। তবে চুরি করার পরও হারছে সে। জেতার জন্যে জেদ চেপে গেছে।

হানির ভাল নাম হানি পারকিনস। মুসার নতুন বন্ধু। মিষ্টি চেহারা। ব্ল্যাক ফরেস্টেই বাবা-মার সঙ্গে বাস করে। ওর সঙ্গে মুসার পরিচয়টা বেশ নাটকীয়। সিনেমার কাহিনীর মত। সেদিন রবিনদের বাড়িতে রাত কাটিয়েছিল মুসা। ভোর

বেলা হাঁটতে বেরিয়ে বনের মধ্যে মেয়েকণ্ঠের চিৎকার শুনে ছুটে যায়। দেখে তিনটে ছেলে একটা মেয়ের হাত ধরে টানাটানি করছে। মেয়েটা চিৎকার করছে আর ওরা খিকখিক করে হাসছে। তিন বখাটেকে ধরে এমন পিটান পিটিয়েছে মুসা, ব্ল্যাক ফরেস্টের অনেকের কাছেই সে এখন হিরো।

সবাই আনন্দ করছে। সিডি প্লেয়ারে ডিস্ক চাপিয়ে দিল কে যেন। টপ ভলিয়ুমে বাজাতে লাগল হেভি মেটাল গ্রুপ। বিডের বন্ধু ডন একটা ছেলের সঙ্গে সোডার ক্যান নিয়ে টানাটানি করছে। নাম টনি প্রিটো। রবিনের বন্ধু নয় ও। ডন নিয়ে এসেছে ওকে। কার্পেটে ছলকে পড়ল খানিকটা সোডা।

চেঁচামেচি শুনে ফিরে তাকাল রবিন। আবার ঝগড়া শুরু করেছে মুসা আর হানি।

দরজার ঘন্টা বাজল বলে মনে হলো রবিনের। এই হট্টগোলে স্পষ্ট শুনতে পেল না। এগিয়ে গেল জানালার কাছে। ড্রাইভওয়েতে ঢুকেছে একটা নীল রঙের শেভি ক্যাপ্রিস। বারান্দার আলোর নিচে দাঁড়িয়ে আছে একজন লম্বা লোক। গাঢ় রঙের শার্ট। প্যান্টটা কুঁচকানো।

দরজা খুলে দিল রবিন।

একটা ব্যাজ দেখাল লোকটা। পুলিশের ব্যাজ।

ধক করে উঠল রবিনের বুক। পুলিশ কেন? বাবা-মার কিছু হয়নি তো? অ্যাক্সিডেন্ট?

হাসল লোকটা। 'গুড ইভনিং।' রবিনের পা থেকে মাথা পর্যন্ত দেখল।

পেছনে বড় বেশি শব্দ। পাল্লাটা ভেজিয়ে দিল রবিন। ভাল করে তাকাল লোকটার মুখের দিকে।

বয়েস চল্লিশের কোঠায়। গোঁফের কোণ ধূসর হয়ে এসেছে। নীল চোখ। কারও চোখে এত শীতল দৃষ্টি আর কখনও দেখেনি রবিন। যেন শীতকালের লেকের বরফ।

'আমি ক্যাপ্টেন ফিল কোহেন।'

'ও, আমি রবিন। কি হয়েছে? বাবা-মার কোন খবর…'

'তাঁরা বাড়ি নেই নাকি?' ঝকঝকে সাদা দাঁত দেখিয়ে আবার হাসল লোকটা।

'না…'

'কোথায় গেছেন?'

'অফিসে।'

'এত দেরি?

'বোধহয় কাজের চাপ।'

পাল্লাটা পুরোপুরি বন্ধ হয়নি। ফাঁক দিয়ে ভেতরে তাকাল লোকটা।

'বাবার কাছে এসেছেন?'

'অ্যাঁ?…না ডাকাতি…একটা ডাকাতির তদন্ত করতে এসেছি।'

'ডাকাতি?'

'হ্যাঁ। তিন ব্লক দূরে একটা বাড়িতে। আশেপাশের সবার কাছে খোঁজ নিচ্ছি,

কেউ সন্দেহজনক কিছু দেখেছে কিনা। এই কোন গাড়ি, অপরিচিত কোন লোক...'

'আমি কিছু দেখিনি।'

ঘরের ভেতর অট্টহাসি শোনা গেল। ঝনঝন করে কাঁচ ভাঙল। কারও হাত থেকে গ্লাস পড়ে গেছে। আরও বেড়ে গেল হেভি মেটাল মিউজিকের শব্দ।

'কাউকে দেখোনি?' রবিনের চোখের দিকে তাকিয়ে আছে নীল চোখজোড়া।

চোখ সরিয়ে নিল রবিন। 'না। কাউকে দেখিনি। এই রাস্তায় লোকজন তেমন দেখা যায় না। আরেকটা কথা, এখানে আমরা নতুন এসেছি...'

'তোমার বাবা ফিরবেন কখন?'

'জানি না। মাঝে মাঝে রাত করে।'

পরস্পরের দিকে তাকিয়ে রইল দুজনে। শার্টের পকেট থেকে একটা সাদা কার্ড বের করে বাড়িয়ে দিল ক্যাপ্টেন, 'রাখো এটা। আমার নম্বর। সন্দেহজনক কিছু দেখলে ফোন কোরো।'

কার্ডের দিকে তাকাল রবিন। ধন্যবাদ দিল লোকটাকে।

'হাতের কাছে রেখো,' ক্যাপ্টেন বলল। 'বলা যায় না, কখন কি ঘটে। ডাকাতি যখন শুরু হয়েছে এই এলাকায়...তোমাদের বাড়িতেও ঢুকতে পারে।'

ঘুরে দাঁড়িয়ে বারান্দা থেকে নেমে গেল সে। খোয়া বিছানো ড্রাইভওয়ে ধরে হেঁটে গেল জুতোর মচমচ শব্দ তুলে। বিরাট পুরানো শেভি গাড়িটাতে উঠল।

তাকিয়ে আছে রবিন। অবাক লাগছে ওর। ডাকাতির তদন্ত করতে এসেছে কোহেন, পুলিশের গাড়ি আনেনি কেন? পরনেও সাদা পোশাক। ছদ্মবেশে এসেছে? হবে হয়তো।

কার্ডটা জিনসের পকেটে ঢুকিয়ে রেখে লিভিং রুমে ফিরে এল সে। নীরব হয়ে গেছে ঘর। সোফার দিকে তাকাল সে। বসে আছে মুসা আর হানি। ওর দিকে তাকিয়ে আছে। সিডি প্লেয়ারটা বন্ধ।

'সরি, রবিন,' বলল টনি।

'কেন?' বুঝতে পারছে না রবিন। কি এমন ঘটল, যার জন্যে 'সরি' বলা লাগল ওর?

'ডনের সঙ্গে হাতাহাতি করছিলাম,' ছেলেটা বলল, 'বোঁ করে চক্কর দিয়ে উঠল হঠাৎ মাথা। পেটে পাক। কিছুতেই রাখতে পারলাম না। নোংরা করে দিয়েছি।' হাত তুলে দেখাল।

দেখতে পেল রবিন। কফি টেবিলের একধারে খানিকটা হলদে-বাদামী নরম পদার্থ পড়ে আছে। কিনার বেয়ে গড়িয়ে পড়তে গিয়ে থেমে গেছে। বমি।

'তখনই মানা করেছিলাম, এত অরেঞ্জ জুস গিলো না, সহ্য করতে পারবে না...' ডন বলল।

ওয়াক ওয়াক করে বাথরুমের দিকে ছুটল একটা মেয়ে। আরেকজন মুখে হাত চাপা দিল।

'দাঁড়াও, অস্থির হয়ো না তোমরা,' অপরিচিত ছেলেটা বলল, 'মুছে ফেলছি।' রবিনের দিকে তাকাল, 'একটা ন্যাকড়া?'

স্থির দৃষ্টিতে বমির দিকে তাকিয়ে থেকে হেসে ফেলল রবিন। এগিয়ে গিয়ে

টেবিলের কিনার থেকে তুলে নিল জিনিসটা। প্লাস্টিকে তৈরি নকল বমি।

হেসে উঠল ডন। রবিনকে বোকা বানাতে না পেরে নিরাশ হয়েছে ওর বন্ধু।

কয়েক সেকেণ্ডের জন্যে সত্যি বোকা বনে গিয়েছিল রবিন। বলল না ছেলেটাকে। খুশি করার দরকার নেই। নিরাশই থাকুক।

ছেলেটার কাঁধে ঠেলা দিল বিড। 'এটা কোন্ ধরনের রসিকতা হলো?'

মুখ কাঁচুমাচু করে ছেলেটা বলল, 'আমার কোন দোষ নেই। ডন বলল...'

রসিকতাটা অনেকেই ভাল ভাবে নেয়নি, বোঝা গেল। বাথরুম থেকে বমি করে ফিরে এল মেয়েটা। মুখ ফ্যাকাসে হয়ে গেছে। ধপ করে বসে পড়ল সোফায়। 'আমি আর থাকতে পারছি না। বাড়ি যাব।'

আরও কয়েকজনের মুড অফ হয়ে গেছে। আর জমবে না। ভেঙে গেল পার্টি।

যারা আরও কিছু সময় থাকতে চেয়েছিল, তারা বিরক্ত হলো ছেলেটার ওপর। একে একে বিদায় নিতে শুরু করল। বেরিয়ে গেল সবাই, মুসা আর হানি বাদে।

কার্পেটের এক কোণে একটা দাগ চোখে পড়ল রবিনের। এটা নকল নয়, আসল।

হানিকে বলল মুসা, 'এবার আমি জিতব।'

হাসল হানি। 'সে তো প্রতিবারই বলো। এবারও হারবে।'

'জ্বী-না!'

'হারবে!'

'ঘুঁটি চালো।'

'রাত অনেক হয়েছে,' রবিন বলল। 'ও যাবে কি করে?'

'আমি দিয়ে আসব,' মুসা বলল।

'কিন্তু হানির আব্বা তোমার সঙ্গে দেখলে রেগে যাবেন।'

'যাক।'

'বখাটেদের হাত থেকে বাঁচিয়েছ ওকে, মিস্টার পারকিনসকে বলা উচিত ছিল। তোমার সম্পর্কে খারাপ ধারণাটা হয়তো থাকত না।'

'আমি বলেছিলাম, হানি মানা করে...'

'না না, বোলো না,' কেঁপে উঠল হানির গলা। 'অত সকালে বাড়ি থেকে একা বেরিয়েছিলাম শুনলে আমাকে আস্ত রাখবে না আব্বা। কি জানি কেন, বনের দিকে যেতে দেয় না আমাকে। সব সময় মানা করে। বনটাকে পছন্দ করে না।' উঠে দাঁড়াল সে। 'রাত অনেক হয়েছে। আমি যাই।'

'যাবে কি ভাবে?'

'হেঁটেই যেতে পারব।'

'সত্যি পারবে তো? নাহয় গেটের বাইরে রেখে চলে আসব তোমাকে, ভেতরে ঢুকব না...'

'লাগবে না। আমি যেতে পারব।'

দরজার বেল বাজল।

নিশ্চয় বাবা-মা! তাড়াতাড়ি এগিয়ে গেল রবিন। দরজা খুলে দিল।

দাঁড়িয়ে আছে টনি। 'আমার বমিটা ফেলে গেছি।'

রবিনের পাশ কাটিয়ে ভেতরে ঢুকল সে। টেবিল থেকে কুৎসিত জিনিসটা তুলে নিয়ে আবার দরজার দিকে এগোল।

হাত তুলল হানি, 'টনি, দাঁড়াও!'

দাঁড়িয়ে গেল ছেলেটা। ফিরে তাকাল। 'কি?'

'গাড়ি এনেছ?'

মাথা ঝাঁকাল টনি।

'আমি তোমার সঙ্গে যাব।'

অবাক হলো মুসা। 'চেনো নাকি ওকে?'

'হ্যাঁ,' জবাব দিল হানি, 'আমাদের দুটো বাড়ি পরেই থাকে।'

টনির পেছনে বেরিয়ে গেল হানি।

মনটা তেতো হয়ে গেল মুসার। তীব্র রাগ বিদ্যুতের মত ছড়িয়ে পড়ল মগজে। টনির সঙ্গে মেয়েকে দেখলে কিছু বলবেন না মিস্টার পারকিনস, অথচ ওর সঙ্গে দেখলে রেগে যাবেন। সে কি টনির চেয়ে খারাপ? সম্ভবত তার একটা জিনিসই পারকিনসের অপছন্দ, কালো চামড়া। ভয়ানক নিগ্রো বিদ্বেষীরা যেমন হয়, কালোদের সহ্য করতে পারে না···

ভাবনায় বাধা পড়ল রবিনের কথায়, 'মুসা, পুলিশ এসেছিল।'

মুখ ফিরিয়ে তাকাল মুসা। 'পুলিশ?'

দুই

'ইস্, একেবারে নোংরা করে দিয়ে গেছে,' ঘরের চারপাশে চোখ বুলাচ্ছে মুসা। 'এ জন্যেই এ সব পার্টি-টার্টিগুলো ভাল লাগে না আমার। অসভ্যতা মনে হয়।'

'অসভ্য মানুষকে দাওয়াত দিলে অসভ্যতাই করবে!' বিরক্তি চেপে বলল রবিন। 'পরিষ্কার করে ফেলা দরকার। মা এসে দেখলে বকাবকি করবে।'

'চলো, তোমাকে সাহায্য করি।'

'বাড়ি যাবে না?'

'আন্টিরা আসা পর্যন্ত থাকি। দেখেই যাই। তোমাকে একা ফেলে যাব না। ডাকাতগুলো আবার ফিরে আসতে পারে।'

পুলিশ কি বলে গেছে, মুসাকে জানিয়েছে রবিন।

সবুজ একটা প্লাস্টিকের ব্যাগ বের করে তাতে পটেটো চিপসের ছেঁড়া প্যাকেট, সোডা ও কোকাকোলার খালি ক্যান, আর অন্যান্য জঞ্জাল ভরতে শুরু করল মুসা। একটা ভেজা ন্যাকড়া এনে কার্পেটের দাগ ডলে তুলতে লাগল রবিন।

'আন্টিরা ফিরছেন না কেন? কিছু হলো না তো?'

'উঁ!' ফিরে তাকাল রবিন।

'অ্যাক্সিডেন্ট বা ওরকম কিছু?'

'অ্যাক্সিডেন্ট করলে খবর পেতাম,' নিজেকেই বোঝাল রবিন। উদ্বেগ দূর হলো না।

উসখুস করল মুসা। গাল চুলকাল। তারপর বলে ফেলল, 'ব্ল্যাক উডের ভেতর

দিয়ে আসার চেষ্টা করেননি তো? শর্টকাট? আসার সময় এঞ্জিন বন্ধ হয়ে গিয়ে থাকতে পারে। বনটা সম্পর্কে অনেক উদ্ভট গল্পই তো শোনা যায়। ইদানীং শুনছি বনের মধ্যে নিখোঁজ হয়ে যায় মানুষ। ফিরে আসে অন্য রকম হয়ে। আচার-আচরণ বদলে যায়। মনে হয় যেন কেউ ধরে ব্রেনওয়াশ করে দিয়েছে।'

ভুরু কোঁচকাল রবিন। 'কে বলল তোমাকে?'

'টনি প্রিটো। খবরের কাগজেও নাকি লিখেছে।'

'ধোঁকা দিয়েছে। ওর রবারের বমির মত। তুমি যে ভূতের ভয় পাও জেনে গেছে।'

চুপ হয়ে গেল মুসা। টেবিলের নিচে পড়ে থাকা একটা ক্যান তুলে ব্যাগে ভরে আবার ফিরে তাকাল। 'অফিসে ফোন করে দেখো না?'

'তাই তো! এতক্ষণ মনে পড়ল না কেন এ কথা?'

রান্নাঘরে রওনা হলো রবিন। পিছু নিল মুসা। রিসিভারের পাশে রাখা একটা প্যাডে নম্বর লেখা আছে। অফিসের ডাইরেক্ট লাইন। যে কোন সময় এই নম্বরে ফোন করা যায়।

প্যাডটা টেনে নিল রবিন। পাতা উল্টে বাবার অফিসের নম্বর বের করল। রিসিভার তুলে কানে ঠেকিয়ে ডায়াল করতে গিয়ে থমকে গেল।

'কি হলো?' জিজ্ঞেস করল মুসা।

'ডেড!'

হাঁ করে রিসিভারটার দিকে এমন ভঙ্গিতে তাকিয়ে রইল দুজনে, যেন টেলিফোন ডেড হয়ে যাওয়া একটা অস্বাভাবিক ঘটনা।

'অবাক কাণ্ড!' মুসা বলল। 'খারাপ হলো কেন? ঝড়টড় তো কিছু হয়নি।'

'এখন বোঝা গেল কেন ফোন করেনি। করতে পারছে না আসলে।'

রিসিভার নামিয়ে রাখল রবিন। হাসি ফুটল মুখে। দুশ্চিন্তা কেটেছে।

কিছু বলতে গিয়ে থেমে গেল মুসা। মাথার ওপরে পায়ের শব্দ। মচমচ করে উঠল কাঠের ছাদ।

ওপরতলায় হাঁটছে কেউ!

ভুরু কোঁচকাল মুসা। রবিনের দিকে তাকিয়ে নীরবে মাথা ঝাঁকাল। অর্থাৎ, 'কে?'

সিঁড়ি বেয়ে নেমে এল পদশব্দ। রান্নাঘরের দরজায় এসে দাঁড়াল। কেইন জেলিমেয়ার। রবিনের দূর সম্পর্কের ভাই। আগে কখনও দেখেনি রবিন। ওরা গোস্ট লেনে আসার কিছুদিন পর এসে হাজির হয়। চিলেকোঠার রুমটা দখল করে। অবাক লেগেছে রবিনের। থাকার জন্যে ওরকম একটা ঘর কারও পছন্দ হয় নাকি? খুবই ছোট।

ঘরটায় ঠিকমত জায়গা হয় না ওর। এত বেশি লম্বা, সোজা হয়ে দাঁড়াতে গেলে নিচু ছাদে মাথা ঠেকে যায়, ফলে ঘাড় কুঁজো করে দাঁড়াতে হয়। কোনমতে একটা বিছানা আর একটা টেবিল পেতেছে। থাকতে নিশ্চয় কষ্ট হয়, কিন্তু ভাবসাবে বোঝায় আরামে আছে।

এক বাড়িতে থাকলেও ওর দেখা খুব একটা পায় না রবিন। দেখলেই মনে হয়

যেন জেলখানার পলাতক আসামী, লুকিয়ে আছে চিলেকোঠায়। চুপচাপ থাকে। ভীষণ লাজুক। সুদর্শন। বাদামী চুল। কালো চোখ। মডেল হওয়ার উপযুক্ত। পাশের শহরের একটা জুনিয়র কলেজের ছাত্র। চিলেকোঠায় যতক্ষণ থাকে, ঘুমানো বাদ দিয়ে বাকি সময়টা লেখাপড়া করে কাটায়।

ওখানে কেন ওকে থাকতে দিয়েছে মা, বুঝতে পারে না রবিন। ভাড়ার জন্যে নয়। অত ছোট একটা চিলেকোঠার কিই বা ভাড়া হবে। টাকারও প্রয়োজন নেই ওদের। একটা কারণ হতে পারে, অসহায় একজন ছাত্রকে পড়ালেখায় সাহায্য করা হচ্ছে।

'এমন নিঃশব্দে হাঁটাচলা করো তুমি, কেইন,' হেসে বলল মুসা, 'ভয় পাইয়ে দাও।'

শঙ্কা ফুটল কেইনের সুন্দর মুখে, 'তাই নাকি? কই, আমি তো কিছু বুঝি না।'

লিভিং রুম পরিষ্কার করার জন্যে ফিরে এল মুসা আর রবিন। সঙ্গে এল কেইন।

'কখন এলে?' কার্পেটের দাগ ঘষতে ঘষতে জিজ্ঞেস করল রবিন।

'একটু আগে। এত শব্দ হচ্ছিল...'

'তুমি পার্টিতে এলে না কেন?'

'অত হই-চই ভাল লাগে না।'

সোফার পাশে টিপয়ে রাখা একটা প্লেটে এখনও কিছু পটেটো চিপস পড়ে আছে। একমুঠো তুলে নিল কেইন। 'আন্টি কোথায়? একটা কথা ছিল।'

'ফেরেনি।'

অবাক হলো কেইন। ঘড়ি দেখল।

মুখ তুলল রবিন। 'ফিরতে রাত হবে, তোমাকে বলেছিল নাকি?'

'নাহ্,' মাথা নাড়ল কেইন। গাল চুলকাল। 'কথাটা অবশ্য তাকে পরে বললেও চলবে। যাই।'

কিন্তু গেল না। কয়েকটা চিপস মুখে ফেলে কুড়মুড় করে চিবাল। 'তোমাদের কি হয়েছে? অমন চুপ করে আছ কেন?'

'কই, কিছু না তো!'

কয়েকটা পেপার প্লেট কুড়িয়ে নিয়ে মুসার ব্যাগে ফেলল কেইন।

'রবিনের কাছে শুনলাম,' মুসা বলল, 'আজকাল প্রায়ই নাকি রাত করে বাড়ি ফেরেন আন্টিরা।'

'ফোন করেছে?' আরেক মুঠো চিপস তুলে নিল কেইন।

'না। ফোন নষ্ট।'

'আশ্চর্য! কোন মেসেজ রেখে গেছে?'

'না,' জবাব দিল রবিন। 'অত অবাক হওয়ার কিছু নেই। খবরের কাগজের চাকরিই অমন। রাত করে বাড়ি ফেরা।'

'অনেক সময় তো দেখেছি, চব্বিশ ঘণ্টাই বাইরে থাকেন আঙ্কেল,' মুসা বলল। একটা সোডার ক্যান তুলে নিল। কেউ খুলেছিল, কিন্তু খায়নি, ফেলে গেছে। হাঁ করে মুখে ঢেলে ঢকঢক করে গিলতে শুরু করল সে।

'তারমানে কোন মেসেজও রেখে যায়নি?' অস্থির মনে হলো কেইনকে।

অবাক লাগল রবিনের। এত প্রশ্ন করছে কেন? ওর স্বভাবের বিপরীত। জরুরী কোন কাজ আছে নিশ্চয় মা'র কাছে। টাকা দরকার?

'ক্লাবে যাননি তো?' ক্যানটা হাতে চেপে দুমড়ে ফেলল মুসা। ব্যাগের মধ্যে ছুঁড়ে দিল।

'না,' রবিন বলল, 'তাহলে আগে বাড়ি ফিরত। ডিনার সেরে যেত। পারতপক্ষে বাইরে খেতে চায় না মা।'

'আন্টির বেডরুমে দেখেছ?' জিজ্ঞেস করল কেইন, 'কিছু আছে কিনা?'

'কি দেখব?' সন্দেহ বাড়ছে রবিনের। এমন আচরণ করছে কেন কেইন? ও কি খারাপ কিছু আঁচ করেছে নাকি?

'কোন মেসেজ তো রেখে যেতে পারে?'

'মেসেজ রাখার প্রয়োজন পড়লে ফ্রিজের ওপর কিংবা টেলিফোনের পাশে রেখে যায়, যাতে সহজেই আমার চোখে পড়ে। বেডরুমে লুকিয়ে রাখতে যাবে কেন?'

'তা বটে!' হাই তুলল কেইন। 'ঘুম পাচ্ছে। চলি। কথাটা নাহয় কালই বলব।' খাবলা দিয়ে আরেক মুঠো চিপস তুলে নিয়ে দরজার দিকে এগোল সে। বেরোনোর আগে ফিরে তাকিয়ে বলল, 'গুড নাইট।'

'নাইট,' জবাব দিল মুসা। কেইন বেরিয়ে গেলে রবিনের দিকে ফিরল। 'ওর আচরণটা কেমন লাগল না?'

'লাগল। নার্ভাস।'

'টাকা ধার চাইতে আসেনি তো?'

'আমারও তাই মনে হয়েছে,' ক্লান্ত লাগছে রবিনের। 'টাকা চাইতে এলে ওরকম নার্ভাস হয়ে যায় মানুষ।'

কিছু মনে পড়তে ঘড়ি দেখল মুসা। 'বারোটা! আরেকটু পরেই স্টার ট্রেক দেখাবে!'

'ও তো পুরানো। বহুবার দেখিয়েছে।'

'তাও মজা লাগে।'

'মা'র ঘরটা দেখা দরকার। অফিসে যাওয়ার সময় তাড়া থাকে। মেসেজ লিখে ভুলে হয়তো ওখানেই ফেলে গেছে।'

মুসার দৃষ্টি তীক্ষ্ণ হলো। 'দুশ্চিন্তা হচ্ছে?'

'হচ্ছে। কেন যেন স্বস্তি পাচ্ছি না।'

'ঠিক আছে, একটু দাঁড়াও। দেখে নিই কোন এপিসোডটা দেখাচ্ছে।' একটা চামড়ার কাউচে বসে রিমোট কন্ট্রোল তুলে নিয়ে সুইচ টিপল মুসা। অন হলো টেলিভিশন।

কাউচের হাতলে বসল রবিন। খুব ক্লান্ত লাগছে।

স্টার ট্রেক শুরু হলো।

'পুরানো হলেও ভাল,' মুসা বলল। 'কার্ক, উহুরা আর চেকভ বন্দি হয় এতে। যারা বন্দি করে তারা ওদের কুকুরের কলার পরিয়ে হাতাহাতি লড়াই শেখায়।'

'দেখেছই তো। আর দেখে কি করবে? চলো, ঘরটা চেক করে ফেলি।'

রিমোট টিপে টেলিভিশন বন্ধ করে উঠে দাঁড়াল মুসা। 'চলো। একটা বাজতে কয়েক মিনিট বাকি। এখন না ঘুমালে সকালে স্কুলে যেতে পারবে না।'

রবিনের পিছু পিছু সিঁড়ি বেয়ে উঠতে লাগল সে। কাঠের পুরানো সিঁড়িতে মচমচ শব্দ হচ্ছে। এই শব্দ ভাল লাগে না রবিনের। মা বলেছে, কার্পেট পেতে দেবে সিঁড়িতে। তখন হয়তো আর শব্দ হবে না।

রকি বীচে ওদের বাড়িটা ছিল নতুন। ওখান থেকে এসে এত পুরানো বাড়িতে থাকতে অসুবিধে হচ্ছে খুব। সহ্য করে নিতে সময় লাগবে।

ওপরতলায় উঠে এল ওরা। মায়ের ঘরের দরজার সামনে থামল। পাল্লা ভেজানো।

নব ঘুরিয়ে দরজা খুলল রবিন। বেড সাইড টেবিলের আলোটা জ্বলছে। অবাক লাগল। মা তো এ রকম ভুল করে না? বেরোনোর আগে সব কিছু গোছগাছ করে আলো নিভিয়ে তারপর বেরোয়।

দমকা বাতাস এসে ঝাপটা মারল জানালার শেডে। খচমচ শব্দ হলো। চমকে গেল রবিন। বিছানার দিকে তাকিয়ে অস্ফুট শব্দ করে উঠল। সন্দেহ রইল না আর, সাংঘাতিক কিছু ঘটেছে ওর বাবা-মায়ের।

তিন

রবিনকে বোঝানোর চেষ্টা করল মুসা, বিছানার চাদর অর্ধেক বিছানায় আর অর্ধেক বাইরে ঝুলে থাকলেই প্রমাণ হয় না যে সাংঘাতিক কিছু ঘটেছে। মিসেস মিলফোর্ড যত গোছানো স্বভাবের মহিলাই হোন, অফিসের তাড়া থাকলে না গুছিয়েও বেরিয়ে যেতে পারেন।

'যাই বলো, দেরিটা অস্বাভাবিক মনে হচ্ছে,' রবিন বলল।

'কেন? দেরি করে ফেরাটা যদি নতুন না হয়, অস্বাভাবিক হবে কেন?'

'কোন কারণে দেরি হলে ফোন করে আমাকে জানায়।'

'কিন্তু ফোন তো নষ্ট। চেষ্টা নিশ্চয় করেছেন। লাইন পাননি।'

বুকের ওপর হাত দুটো আড়াআড়ি রেখে দাঁড়াল রবিন। 'তাহলে পাশের বাড়ির মিসেস ডিকসনকে করতে পারত। আমাদের ফোন নষ্ট হলে তাই করে বাবা-মা।'

'এত রাতে পড়শীকে বিরক্ত করতে চাননি। অহেতুক দুশ্চিন্তা করছ তুমি...'

মুসার কথায় কান নেই রবিনের। জানালার দিকে তাকিয়ে আছে। 'মুসা...' ফিসফিস করে বলল সে। সামনে ঝুঁকে মুসার কাঁধ খামচে ধরল। 'কে যেন দাঁড়িয়ে আছে...'

এত আস্তে বলল রবিন, ভালমত বুঝতে পারল না মুসা।

ওকে ঠেলা মেরে জানালার দিকে ঘুরিয়ে দিল রবিন।

প্রথমে কিছু চোখে পড়ল না মুসার। বুঝল না কি দেখে ভয় পেয়েছে রবিন। জানালাটা অর্ধেক খোলা। বাইরে অন্ধকার। আকাশে বাঁকা একফালি ফ্যাকাসে

চাঁদ। জানালার ডোরাকাটা কাপড়ের পর্দাটার নিচটা মেঝে ছুঁই ছুঁই করছে। রাতের বাতাসে দুলে উঠল। এতক্ষণে চোখে পড়ল ওরও। পর্দার নিচে বেরিয়ে আছে একজোড়া জুতো।

কেউ আছে ওখানে!

জানালার দিকে রওনা হলো মুসা। একবারও ভাবল না পর্দার নিচে যে লুকিয়ে আছে, সে বিপজ্জনক লোক হতে পারে। ওর কাছে অস্ত্র থাকতে পারে।

ওকে হুঁশিয়ার করল রবিন।

থামল না মুসা।

পর্দার কাছে যাওয়ার আগেই বেরিয়ে এল কেইন। হাত নেড়ে বলল, 'আমি। ভয়ের কিছু নেই।'

'তুমি ওখানে কি করছিলে?' চিৎকার করে উঠল রবিন।

'জানালার বাইরে তাকিয়েছিলাম···মনে হলো বাইরে কেউ আছে···দেখলাম না। নিশ্চয় বেড়াল।'

'কিন্তু এখানে ঢুকেছিলে কেন?' রাগ চাপা দিতে পারল না রবিন।

'তোমাকে তো বোঝাতে পারলাম না, তাই নিজেই এসেছিলাম, আন্টি কোন মেসেজ রেখে গেছে কিনা দেখতে। এই সময় বাইরে শব্দ শুনে জানালায় গিয়ে উঁকি দিলাম। তোমরাও যে উঠে আসবে এখন, ভাবিনি।'

'লুকালে কেন?'

'দেখা দিতে চাইনি। চুরি করে তোমার মায়ের ঘরে ঢুকেছি, যদি কিছু ভেবে বসো? কিন্তু বিশ্বাস করো, কোন কুমতলব ছিল না আমার,' বাদামী চুলে আঙুল চালাল কেইন। ঘামছে। বদ্ধ ঘরটায় গরম ঠিকই, তবে এতটা নয় যে এ ভাবে ঘামতে হবে।

ওর কথা পুরোপুরি বিশ্বাস করতে পারল না রবিন। সন্দেহ গেল না।

মুসার দিকে চোখ ফেরাল কেইন। আবার তাকাল রবিনের দিকে। 'আসলে আন্টিদের জন্যে আমারও···'

বাধা দিল রবিন, 'তোমার হাতে ওটা কি?'

ছোট একটা কালো বাক্স দেখাল কেইন। 'এটা? ওয়াকম্যান।' দরজার দিকে রওনা হলো সে।

'হেডফোন নেই?'

'ওপরে ফেলে এসেছি,' প্যান্টের পকেটে যন্ত্রটা ভরে ফেলল কেইন।

হেডফোন ছাড়া ওয়াকম্যান নিয়ে ঘুরে বেড়ানোর কি অর্থ? সন্দেহ বাড়ল রবিনের।

বাতাসে দুলে উঠল জানালার পর্দা। নিচে গোস্ট লেনের পাশের বনে চিৎকার করে উঠল কি একটা জানোয়ার। মেরুদণ্ডে ঠাণ্ডা শিহরণ বয়ে গেল মুসার। ব্ল্যাক ফরেস্টে অনেক ছেলের সঙ্গে বন্ধুত্ব হয়ে গেছে ওর। ওরা বলেছে, নিশুতি রাতে ওই বনের মধ্যে ঘুরে বেড়ায় মায়া-নেকড়ে।

হাই তুলল কেইন, 'যাই।' বেরোনোর আগে ফিরে তাকাল রবিনের দিকে। 'চিন্তা কোরো না। ঘুম থেকে উঠে দেখবে আন্টিরা ফিরে এসেছে।'

'হয়তো,' শুকনো গলায় বলল রবিন।
'গুড নাইট।'
'নাইট।'
বেরিয়ে গেল কেইন। কান পেতে আছে দুই গোয়েন্দা। সিঁড়ি বেয়ে পায়ের শব্দ উঠে যাচ্ছে ওপরে চিলেকোঠার দিকে।
ক্লান্তিতে ভেঙে আসছে শরীর। বিছানায় বসে পড়ল রবিন।
জানালাটা বন্ধ করে দিতে গেল মুসা। নিচের চত্বরে বাতাসে গড়াগড়ি খাচ্ছে শুকনো ঝরাপাতা। রাস্তার দিকে তাকাতেই চোখ আটকে গেল। বাড়ির ঠিক সামনে দাঁড়িয়ে আছে একটা ধূসর রঙের ভ্যানগাড়ি। আগে কখনও দেখেছে বলে মনে পড়ল না। গায়ে কিছু লেখা নেই। অন্ধকারে কেউ ভেতরে আছে কিনা বোঝা গেল না।
এতরাতে ওখানে কেন গাড়িটা?
জানালা বন্ধ করে পর্দা টেনে ঘুরে দাঁড়াল সে। সরে এল।
'কেইনের কথা বিশ্বাস করেছ?' জিজ্ঞেস করল রবিন।
'করেছি।'
'ও সত্যি বলেছে?'
'মিথ্যে বলবে কেন?'
'তাহলে এমন নার্ভাস হয়ে গেল কেন? আজ ওর হলো কি! কথায় কথায় নার্ভাস!'
'বললই তো, চুরি করে আন্টির ঘরে ঢুকে ধরা পড়ে যাওয়ায়...'
বাধা দিয়ে বলল রবিন, 'ওর হাতের যন্ত্রটা ওয়াকম্যান নয়! ওয়্যারলেস!'
'কি যে বলো না! ওয়্যারলেস দিয়ে ও কি করবে?'
'পর্দার নিচে দাঁড়িয়ে কারও সঙ্গে কথা বলছিল হয়তো!'
'কার সঙ্গে?'
জবাব দিতে পারল না রবিন। এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে নিজেকেই যেন প্রশ্ন করল, 'এ ঘরে কি খুঁজতে এসেছিল ও?' একটা বালিশ টেনে নিয়ে কোলের ওপর ফেলে তাতে কনুই রাখল।
'মেসেজ, তা ছাড়া আর কি?' বিরাট বিছানাটার আরেক প্রান্তে বসল মুসা।
'মেসেজ খুঁজতে এলে পর্দার আড়ালে লুকাল কেন? জানালার বাইরে কি দেখছিল?'
'আবার শুরু করলে!' গুঙিয়ে উঠল মুসা। 'ও তো বললই কেন এসেছিল, কেন দাঁড়িয়েছিল! তোমার বিশ্বাস হচ্ছে না?'
জবাবটা এড়িয়ে গেল রবিন। চোখ বুজল। 'ঘুম পাচ্ছে।'
'এখানে ঘুমাবে?'
হাই তুলল রবিন। হাসল। 'উঠতে ইচ্ছে করছে না। তুমি এখানে শোবে?'
'না। গেস্ট রুমে চলে যাই। বড়দের বিছানায় শুতে আমার অস্বস্তি লাগে।'
লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ল রবিন। পরক্ষণে ঝটকা দিয়ে উঠে বসল।
ভুরু কোঁচকাল মুসা। 'কি হলো?'

হাসি মুছে গেছে রবিনের মুখ থেকে। 'চাদরের নিচে শক্ত কি যেন লাগল!'

বালিশ সরিয়ে চাদরের নিচ থেকে জিনিসটা বের করে আনল সে। ছোট, সাদা একটা খুলি।

ভাল করে দেখার জন্যে এগিয়ে এল মুসা। 'কিসের খুলি! মানুষের?'

'না,' টেবিল ল্যাম্পের আরও কাছে নিয়ে গেল জিনিসটা রবিন। 'মনে হচ্ছে···বানরের!'

'কি!'

হাতের তালুতে রেখে মুসার দিকে বাড়িয়ে দিল রবিন। পিং-পং বলের সমান একটা খুলি। অক্ষিকোটরে স্ফটিক পাথর বসানো। ল্যাম্পের আলোয় জ্বলছে।

কাঁপা হাতে রবিনের হাত থেকে নিল ওটা মুসা। 'খাইছে! এত ঠাণ্ডা কেন!' ফিরিয়ে দিল রবিনকে।

হাতের তালুতে নিয়ে খুলির মুখটা নিজের দিকে ফেরাল রবিন। আসল বানরের খুলি নয়। হাতির দাঁত কেটে তৈরি। সেজন্যেই ঠাণ্ডা আর এত মসৃণ। নাকের ফুটোয় কালো দুটো গর্ত। সমস্ত দাঁত বেরোনো, কুৎসিত হাসির মত। কৃত্রিম চোখ দুটো তাকিয়ে আছে ওর চোখের দিকে।

সম্মোহিতের মত খুলিটার দিকে তাকিয়ে রইল সে। মনে হলো হাতের চামড়া পোড়াচ্ছে। প্রায় ছুঁড়ে ফেলল বেডসাইড টেবিলে। বিড়বিড় করল, 'এল কোত্থেকে?'

জবাবটা মুসারও জানা নেই।

চার

রাতে হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল মুসার। ঘড়িতে দেখল, পৌনে দুটো। কেন ভাঙল ঘুমটা? শব্দ? বুঝতে পারল না। বিছানা থেকে উঠে জানালার কাছে এসে দাঁড়াল। তাকাল সামনের আঙিনার দিকে।

বারান্দার হলদে আলো পড়েছে লনে। কুয়াশায় ঘোলাটে। নানা রকম ছায়া। নীলচে-ধূসর কুয়াশার চাদরের আড়ালে রহস্যময় লাগছে কালো বনটাকে।

জানালার কাঁচে কপাল চেপে ধরল সে। ছ্যাঁৎ করে উঠল। ভীষণ ঠাণ্ডা। কপাল সরাল না তবু। খারাপ-ভালয় মিশিয়ে বিচিত্র একটা অনুভূতি। বনের মধ্যে চিৎকার করছে দুটো জানোয়ার। ডাকটা কুকুরের ডাকের মত। নেকড়ে আর কয়োটেরাও এ রকম করেই ডাকে, জানা আছে ওর। শুনতে শুনতে চোখ থেকে ঘুমের জড়তা কেটে গেল পুরোপুরি।

রাস্তার দিকে তাকাল সে। সেই ধূসর ভ্যানটা আছে এখনও। আগের জায়গায়।

বাড়ছে জানোয়ার দুটোর চিৎকার। এগিয়ে আসছে। রাস্তায় বেরিয়ে আসবে নাকি? এলে ভালই। কি জানোয়ার, দেখতে পাবে।

হঠাৎ দেখল, লন ধরে রাস্তার দিকে দৌড়ে যাচ্ছে একটা ছায়ামূর্তি।

চোখ মিটমিট করল সে। খুলল, বন্ধ করল। একবার···দুবার। চোখের ভুল না

তো? সদ্য ঘুম থেকে উঠে কুয়াশায় উল্টোপাল্টা দেখছে?

না। ঠিকই দেখছে। চিনতে পেরেছে লোকটাকে। কেইন। গ্যায়ে সাফারি জ্যাকেট। বাতাসে উড়ছে কোণ দুটো। বারান্দার আলোয় পাতা বিছিয়ে থাকা লনে অনেক লম্বা আর সরু দেখাচ্ছে ওর ছুটন্ত ছায়াটা।

সোজা এগিয়ে গেল সে। রাস্তা পেরোতেই খুলে গেল ভ্যানের দরজা। একটা হাত বেরিয়ে এল ওকে উঠতে সাহায্য করার জন্যে। ভেতরে অদৃশ্য হয়ে গেল সে। আবার বন্ধ হয়ে গেল দরজা।

তাকিয়ে আছে মুসা। দাঁড়িয়ে আছে গাড়িটা। অন্ধকার। নীরব। লনে বিচিত্র ছায়ার পরিবর্তন নেই। কুয়াশা ঘন হচ্ছে। আলোর সীমানার বাইরে অন্ধকারও বাড়ছে।

কাঁপুনি শুরু হলো মুসার। ঠাণ্ডায়, না উত্তেজনায়, বুঝতে পারল না।

রাত দুপুরে দৌড়ে গিয়ে একটা রহস্যময় ভ্যানে ঢুকল কেন কেইন? কার সঙ্গে দেখা করতে গেল?

দরজার দিকে ঘুরল মুসা। রবিনকে জাগাতে হবে। এই সময় বিছানার পাশে বেডসাইড টেবিলে রাখা একটা জিনিসের ওপর দৃষ্টি আটকে গেল ওর। মোলায়েম সাদা আভা।

পা বাড়াল। টেবিলের দিকে চোখ রেখে এগোতে গিয়ে খাটের পায়ায় বেধে গেল বুড়ো আঙুল। হোঁচট খেয়ে পড়তে পড়তে সামলে নিল। আঁউ করে উঠল ব্যথায়।

বিছানা ঘুরে এসে দাঁড়াল টেবিলের কাছে। হাত বাড়িয়ে সুইচ টিপে টেবিল ল্যাম্পটা জ্বেলে দিল।

হাতির দাঁতে তৈরি বানরের খুলি!

আলোর নিচে থাকায় অনেক বেশি জ্বলছে ওটার চোখে বসানো পাথর দুটো। দাঁত বের করা নীরব হাসিতে যেন ব্যঙ্গ করছে ওকে।

এটা এখানে এল কি করে? রবিনের ঘর থেকে আসার সময় ভুলে হাতে করে নিয়ে এসেছিল? মনে পড়ছে না। তবে এনেছিল নিশ্চয়, নইলে এল কিভাবে? এত বেশি ক্লান্ত আর উত্তেজিত ছিল···ব্যাপারটা নিয়ে ভাবল না বিশেষ। আরও জরুরী কাজ আছে। রবিনকে জাগাতে যাওয়ার আগে গাড়িটা আছে কিনা দেখার জন্যে আবার জানালার কাছে ফিরে এল সে।

আছে। একই জায়গায়। আগের মতই দরজা বন্ধ। নিশ্চয় এখনও ভেতরে রয়ে গেছে কেইন।

অদ্ভুত কিছু একটা ঘটছে এখানে। রহস্যময় আচরণ করছে কেইন। হঠাৎ মনে পড়ল ওর হাতের যন্ত্রটার কথা। সে বলেছে ওয়াকম্যান, রবিনের সন্দেহ ওয়্যারলেস। মনে হলো, তার কথাই ঠিক। জানালার পর্দার নিচে দাঁড়িয়ে তখন নিশ্চয় ভ্যানের লোকটার সঙ্গে ওয়্যারলেসে কথা বলছিল কেইন। এটাই ব্যাখ্যা, কোন সন্দেহ নেই।

কেইন এখন বাইরে। এই সুযোগে ওর ঘরটা দেখার সিদ্ধান্ত নিল মুসা। সূত্র পাওয়া যেতে পারে।

শার্ট গায়ে দিতে দিতে ভাবল সে। কেইনের এই অস্বাভাবিক আচরণের কারণ কি? ড্রাগ ধরেছে? ভ্যান থেকে ড্রাগ কিনতে গেছে?

না। ড্রাগ নয়। ওকে কখনও সিগারেট খেতেও দেখেনি মুসা।

তাহলে কি? মেয়েঘটিত ব্যাপার? গার্লফ্রেণ্ডের চক্কর?

হ্যাঁ, এইটা হতে পারে। গোপনে কোন মেয়ের সঙ্গে দেখা করতে গেছে হয়তো।

কিন্তু সেটাও ধোপে টিকল না। এত গোপনীয়তার কি আছে? মেয়েটাকে ডেকে নিয়ে আসতে পারত বাড়িতে। কয়েক ঘণ্টা ধরে ভ্যানটা দাঁড়িয়ে আছে রাস্তায়। কোন মেয়ে যদি ওর সঙ্গে দেখা করতে এসেই থাকে, ওকে এতক্ষণ অপেক্ষা করিয়ে রাখার কি মানে? আর মেয়ের সঙ্গে ওয়্যারলেসের কি সম্পর্ক?

একটা জিনিস বোঝা যাচ্ছে, ওর আর রবিনের ঘুমানোর অপেক্ষা করছিল কেইন। ওরা ঘুমিয়ে পড়লে দেখা করতে গেছে ভ্যানের আরোহীর সঙ্গে। যেটাই করছে, সে চায় না ব্যাপারটা রবিন আর মুসা জেনে ফেলুক।

কিন্তু কি করছে?

হলঘরে ঢুকল সে। চিলেকোঠার সিঁড়ির দিকে এগোল। হাঁটার সময় পায়ের চাপে কাঠের মেঝেতে শব্দ হচ্ছে। রবিনকে ডাকতে যাবে কিনা ভেবে দ্বিধা করল একবার।

থাক, ডাকার দরকার নেই। ও ঘুমাক। চট করে কেইনের ঘরের ভেতরটা একবার দেখেই ফিরে আসবে ঠিক করল মুসা। সন্দেহজনক কিছু দেখলে সেকথা সকালেও রবিনকে জানাতে পারবে।

সবে চিলেকোঠার সিঁড়িতে পা রেখেছে মুসা, পেছন থেকে বলে উঠল কেইন, 'আরি, মুসা, কোথায় যাচ্ছ?'

চরকির মত পাক খেয়ে ঘুরে দাঁড়াল মুসা।

একটা ডিম লাইট জ্বলছে হলঘরে। সামান্য ওই আলোতেও দেখা গেল ঘামছে কেইন। মুখটা লাল।

'উফ্, একেবারে চমকে দিয়েছ!' কোনমতে বলল মুসা।

'আজ যে কি হলো আমার! বার বার ভয় দেখাচ্ছি তোমাদের। সরি।' হাসল না কেইন। 'তুমি কোথায় যাচ্ছিলে?'

'বা-বা-বাথরুমে!'

'বাথরুমটা ওদিকে,' হাত তুলে হলের একপ্রান্ত দেখাল কেইন।

'জানি। আমি···' থেমে গেল মুসা। জবাব নেই। 'তুমি কোথায় গিয়েছিলে?'

'ঘুম আসছিল না,' হাত দিয়ে কপালের ঘাম মুছল কেইন। 'পড়ালেখার চাপ। অনেক বেশি পরিশ্রম হয়ে যাচ্ছে বোধহয়। মাথাটা পরিষ্কার করার জন্যে হাঁটতে গিয়েছিলাম।'

মিথ্যে কথা বলছে ও। ভ্যানটার কথা উল্লেখই করল না।

'বাইরে শীত নেই,' আবার বলল কেইন। 'এটা যে নভেম্বর, বোঝাই যায় না।' মুসাকে সরিয়ে ওর পাশ দিয়ে সিঁড়ি বেয়ে উঠতে শুরু করল।

ভ্যানে উঠতে দেখেছে ওকে, বলল না মুসা। মিথ্যেটা ধরিয়ে দিল না। দ্বিধায়

পড়ে গেছে। কি করবে? সকালে উঠে রবিনকে বলবে সব। দুজনে মিলে আলোচনা করে ঠিক করবে কি করা যায়।

তাড়াহুড়ো করে ওপরে উঠে গেল কেইন। মনে হলো যেন মুসার বেফাঁস প্রশ্নের ভয়ে পালাচ্ছে।

অনেক প্রশ্ন ভিড় করে এল মুসার মনে। ওয়াশিং মেশিনে ফেলা কাপড়ের মত যেন ঘুরপাক খেতে লাগল। স্থির হচ্ছে না কোনমতে।

ভারি পা ফেলে ফিরে এল নিজের ঘরে। শার্ট খুলতেও ইচ্ছে করল না। গড়িয়ে পড়ল বিছানায়।

পাঁচ

দুঃস্বপ্ন দেখছে মুসা।

বিশাল এক পার্কিং লটে ছেড়ে দেয়া হয়েছে তাকে। যেদিকে তাকায় শুধুই গাড়ি। সব ধূসর ভ্যান। সীমানা দেখতে পাচ্ছে না। কোন্ দিকে গেলে বেরোতে পারবে, বুঝতে পারছে না। ওর গাড়িটাও খুঁজে পাচ্ছে না। পথ নেই। গেট নেই। সীমাহীন এই গাড়ির সমুদ্রে আটকা পড়েছে সে।

ঘড়ির অ্যালার্ম শুনে ঘুম ভেঙে গেল তার। ঘড়িটা টু-ইন-ওয়ান। রেডিও বসানো আছে। সাতটা বাজে। চোখ মেলল জোর করে। সারা গায়ে ব্যথা। মাথাটা ভারি লাগছে। স্বপ্নের রেশ এখনও মোছেনি মন থেকে।

শরীর টানটান করে পাশ ফিরে শুলো। ঘড়ির পাশে সাদা বানরের খুলিটা দেখে চমকে গেল।

ওর দিকে তাকিয়ে আছে। মুখে চিরস্থায়ী কুৎসিত হাসি। ঘরে আলো প্রায় নেই বললেই চলে। অতি সামান্য আলোতেও পাথর দুটো জ্বলছে।

রাগ হলো ওর। হাত বাড়িয়ে তুলে নিয়ে ছুঁড়ে মারল। দেয়ালে বাড়ি খেয়ে কার্পেটে গড়িয়ে পড়ল ওটা। কোথায় গেল দেখারও প্রয়োজন মনে করল না সে। চেঁচিয়ে বলল, 'যত পারিস হাস এবার! শয়তান!'

হঠাৎ মনে পড়ল রবিনের বাবা-মায়ের কথা। নিশ্চয় এতক্ষণে ফিরেছেন। বিছানা ছাড়ল সে। বেরিয়ে এল ঘর থেকে। সিঁড়ির দিকে এগোল।

দরজা খুলে বেরিয়ে এল রবিন। মুসাকে দেখে জিজ্ঞেস করল, 'বাবা-মা এসেছে নাকি?'

'দেখতে যাচ্ছি।'

নিচে নেমে দেখা গেল, নেই, আসেননি তাঁরা। রান্নাঘর, বাথরুম, সব জায়গায় খুঁজল রবিন। হতাশ ভঙ্গিতে রান্নাঘরে ফিরে এসে জানাল, 'আসেনি।'

পেটের মধ্যে গুড়গুড় করে উঠল মুসার। খিদে টের পেল। খাবার কিছু আছে কিনা রবিনকে জিজ্ঞেস করতে গিয়ে থেমে গেল। মা-বাবা বাড়ি ফেরেনি। দুশ্চিন্তায় অস্থির হয়ে আছে বেচারা। এ সময় খাবারের কথা জিজ্ঞেস করতে বাধল।

কিন্তু রবিনই বলল, 'কিছু খাওয়া দরকার।'

ফ্রিজে কিছু নেই। আগের দিন পার্টি দিতে গিয়ে সব শেষ করে ফেলেছে। এক

প্যাকেট কর্নফ্লেক পাওয়া গেল। কিন্তু দুধ নেই। খাবে কি দিয়ে? এক বোতল কোকাকোলা বের করল রবিন। একটা বাটিতে কর্নফ্লেক নিয়ে কোক ঢালতে ঢালতে বলল, 'খাবার বটে। রোজ সকালে এ জিনিস দিয়ে নাস্তা করলে কোনদিন আর মোটা হওয়ার ভয় থাকবে না।'

খেতে অবশ্য অতটা খারাপ লাগল না।

খাওয়া প্রায় শেষ করে এনেছে, এই সময় ভ্যানটার কথা মনে পড়ল মুসার। লাফিয়ে উঠে দৌড় দিল।

'আরে! কোথায় যাচ্ছ?' চিৎকার করে জিজ্ঞেস করল রবিন।

জবাব দিল না মুসা। লিভিং রুমে ঢুকে জানালার কাছে এসে দাঁড়াল। বাইরে তখনও অন্ধকার। ভারি মেঘের আড়াল থেকে বেরোনোর জন্যে উঁকিঝুঁকি মারছে সূর্য। ভ্যানটা নেই।

ওর পাশে এসে দাঁড়াল রবিন। 'কি দেখছ?'

সরে এসে সোফায় বসল মুসা। সব কথা খুলে বলল রবিনকে।

'সত্যি দেখেছ?' বিশ্বাস করতে পারছে না রবিন। 'ঘুমের ঘোরে ভুল হয়নি তো?'

'না, হয়নি।'

'ভ্যানে ঢুকেছে? নাকি পাশ কাটিয়ে চলে গেছে? অন্ধকারে ঠিকমত দেখোনি হয়তো।'

'না, ঠিকমতই দেখেছি। ভ্যানে ঢুকেছিল।'

'তারমানে হাঁটতে যায়নি, মিথ্যে বলেছে?'

'বলেছে।'

'হুঁ,' গম্ভীর হয়ে মাথা দোলাল রবিন। 'জিজ্ঞেস করতে হবে ওকে।'

'কি জিজ্ঞেস করবে?'

'জিজ্ঞেস করব, কুয়াশার মধ্যে এত রাতে কেন বেরিয়েছিল সে? কেন ওই ভ্যানে উঠেছিল?' উঠে দাঁড়াল রবিন। হাত ধরে টানল মুসাকে। 'চলো, এখুনি যাব।'

'কিন্তু কারও ব্যক্তিগত ব্যাপারে নাক গলানোটা কি ঠিক হবে?'

'কাল থেকে রহস্যময় আচরণ করছে কেইন।'

'তা করছে।'

'জিজ্ঞেস করব, কেন করছে এ রকম।'

এক মুহূর্ত ভাবল মুসা। তারপর উঠে দাঁড়াল। 'বেশ। চলো।'

সরু সিঁড়ি বেয়ে ওপরে সিঁড়ির মাথায় এসে দাঁড়াল ওরা। নিচের চেয়ে গরম বেশি এখানে। চিলেকোঠার দরজাটা বন্ধ।

'ধাক্কা দেব?' ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করল মুসা। 'নাকি অপেক্ষা করব?'

কড়া চোখে মুসার দিকে তাকাল রবিন, 'অপেক্ষা কেন? কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকব! আজ স্কুলে যাওয়ার ইচ্ছে নেই নাকি তোমার? ওকে ডেকে তুলতে হবে।'

আস্তে টোকা দিল মুসা। সাড়া না পেয়ে জোরে থাবা দিল।

জবাব নেই।

অস্বস্তি বোধ করতে লাগল মুসা। কোন দুর্ঘটনা ঘটেনি তো? ভাবনাটা দূর করে দেয়ার জন্যে যেন ধীরে ধীরে মাথা নাড়ল এপাশ ওপাশ।

আবার থাবা দিল সে।

এবারও জবাব নেই।

ঠেলা দিল তখন। ভেজানো পাল্লা। খুলে গেল। ভেতরে ঢুকল মুসা।

ধুলো লেগে থাকা একটা ছোট স্কাইলাইট দিয়ে ধূসর আলো আসছে। কেইনের ছোট বিছানাটা গোছানো। খালি ঘর। বেরিয়ে গেছে সে।

হতাশ হলো রবিন। 'আমাদের মুখোমুখি হওয়ার ভয়ে পালিয়েছে।'

'মর্নিং ক্লাস আছে হয়তো,' সরে রবিনের ঢোকার জায়গা করে দিল মুসা।

'এত সকালে থাকে না,' রুড়ে আঙুল কামড়াল রবিন। 'যাকগে, ভালই হয়েছে। ঘরটা দেখা যাবে।'

'যা ঘরের ঘর,' ছাদে ঠেকে যায় বলে মাথা নিচু করে রেখেছে মুসা, 'কয় মিনিট আর লাগবে।'

কেইনের ডেস্কে রাখা জিনিসপত্র ঘাঁটতে শুরু করল সে। তেমন কিছু নেই। অনেকগুলো নোটবুক আর গাদাখানেক কাগজ। চার হাতপায়ে ভর দিয়ে উবু হয়ে বিছানার নিচে তাকাল রবিন।

'কিছু আছে?' জিজ্ঞেস করল মুসা।

'আছে,' উঠে দাঁড়াল রবিন, 'ধুলো।'

বিছানার পাশের বুকশেলফটা প্রায় খালি। মাঝের তাকে অযত্নে ফেলে রাখা হয়েছে কয়েকটা বই আর ম্যাগাজিন। তার নিচের তাকে একটা কার্ডবোর্ডের কাপে রাখা তিন-চারটা মার্কিং পেন ও পেন্সিল।

'থাকে কি করে এখানে!' মুসা বলল।

'ভালই তো। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। কলেজের ছাত্র হলেই কি নায়িকাদের পোস্টার লাগিয়ে রাখতে হবে নাকি?'

ধূসর দেয়ালগুলোর দিকে তাকিয়ে আছে মুসা। ওর কাছে ভাল লাগল না। ঘর তো নয়, জেলখানা।

ডেস্কের ওপর রাখা জিনিসগুলো ঘাঁটতে শুরু করল রবিন।

'দেখেছি আমি,' অধৈর্য ভঙ্গিতে হাত নাড়ল মুসা। জায়গাটা স্নায়ুর ওপর চাপ দিতে আরম্ভ করেছে ওর। বেরিয়ে যেতে চায়। কেইন ফিরে এসে যদি ওদের খোঁজাখুঁজি করতে দেখে, কি ভাববে?

'আই! দেখো?' রবিনের হাতে একটা নোটবুক।

'কি?'

'লেখাটেখা কিছু নেই,' আরেকটা নোটবুক তুলে নিল রবিন। 'দেখো, এটাও খালি।' এক এক করে সবগুলো নোটবুক দেখল সে। সব খালি। একটা শব্দও লেখা নেই। 'কোনটাই ব্যবহার করেনি। এর মানে কি?'

কেইনের টেক্সটবুকগুলো ওল্টাতে লাগল সে। 'দেখো। কোন দাগ নেই, চিহ্ন নেই। কি ধরনের পড়ুয়া?'

'বই দাগানো বোধহয় পছন্দ করে না,' মুসা বলল।

'কিন্তু কোথাও একটা নোট নেই কেন? কিছুই লেখেনি। আর এ বইগুলো দেখো, খুলেও দেখেনি মনে হয় একবার। পড়েটা কি?'

নিচের হলঘরে মচমচ শব্দ হলো। ঝট করে রবিনের দিকে তাকাল মুসা। রবিনও শুনেছে শব্দটা।

স্তব্ধ হয়ে গেল দুজনে। কান পেতে আছে।

আর কোন শব্দ নেই।

দরজায় গিয়ে উঁকি দিল মুসা। কেউ নেই। পা টিপে টিপে কয়েক ধাপ সিঁড়ি নেমে নিচে তাকাল। কাউকে দেখল না। পুরানো বাড়িটা শব্দ করে মাঝে মাঝে।

কেইনের ঘরে ফিরে এসে দেখল ডেস্কের ড্রয়ার খুঁজছে রবিন। ঘরে কাপড় রাখার আর কোন জায়গা না থাকায় ড্রয়ারেই রাখে কেইন। একটা ডেস্ক বোঝাই নীল রঙের মোজা।

'রবিন, চলো বেরিয়ে যাই। এখানে কিছু নেই। কেইনের মনে হয় না লাইফ বলে কিছু আছে।'

মুসার দিকে তাকাল রবিন। 'এটাই তো খটকা লাগছে আমার। ও এমন কেন? অদ্ভুত লাগছে না তোমার?'

'না।'

শেষ ড্রয়ারটা টান দিল রবিন। ওপরে বেশ কয়েকটা আণ্ডারওয়্যার ফেলে রাখা হয়েছে দলা পাকিয়ে।

'চলো,' আবার বলল মুসা। 'কিচ্ছু নেই এখানে।' দরজার দিকে রওনা হলো সে।

'মুসা! দাঁড়াও! দেখো!'

ফিরে তাকাল মুসা, 'কি?'

ওপরের কয়েকটা আণ্ডারওয়্যার সরিয়ে ফেলেছে রবিন। নিচে দেখা যাচ্ছে একটা কালো পিস্তলের চকচকে নল।

ছয়

'মুসা, কি করছ! ধোরো না, ধোরো না!' চিৎকার করে উঠল রবিন।

কিন্তু ধরে ফেলেছে মুসা। আঙুলের ছাপ যা লাগার লেগে গেছে। ড্রয়ার থেকে বের করে দেখতে লাগল সে। 'গুলি ভরা।'

'আমার দিকে কেন? সরাও!'

আগের জায়গায় পিস্তলটা রেখে দিল মুসা।

আণ্ডারওয়্যারগুলো আগের মত করে রেখে ঢেকে দিল রবিন। ড্রয়ারটা ঠেলে ঢোকাল।

'গুলি ভরা পিস্তল দিয়ে কি করে কেইন?' রবিনের দিকে তাকিয়ে চোখ মিটমিট করল মুসা।

'আমি কি করে বলব? হয়তো তেলাপোকা মারে!'

ওর দিকে তাকিয়ে আছে মুসা। রসিকতাটা বুঝতে পারেনি।

'চলো, বেরোও,' মুসার পিঠে ঠেলা দিল রবিন।

রান্নাঘরে ফিরে এল দুজনে। পায়চারি শুরু করল মুসা। ফর্মাইকার কাউন্টারের সামনে একটা টুলে বসল রবিন। 'কি করি, বলো তো?'

সিঙ্কের ওপরে দেয়ালে ঝোলানো ঘড়ির দিকে তাকাল মুসা। সাতটা বেজে চল্লিশ মিনিট। স্কুলে যেতে হলে এখনই রওনা হতে হবে।

ফোনের দিকে চোখ পড়ল রবিনের। উঠে গিয়ে তুলে নিল রিসিভার। মুসার দিকে তাকাল, 'ডেড।'

'ফোন কোম্পানিকে কল দেয়া দরকার। সারারাতই হয়তো চেষ্টা করেছেন আঙ্কেল আর আন্টি। তাঁরাও নিশ্চয় দুশ্চিন্তায় আছেন।'

'ঠিকই বলেছ। মিসেস ডিকসনের বাড়িতে গিয়ে দেখি,' মায়ের ছোট ফোন বুকটা তুলে নিল রবিন। 'আগে মা'র সঙ্গে কথা বলব। তারপর ফোন কোম্পানি।'

'আমি থাকি,' মুসা বলল। 'মিসেস ডিকসন মনে হয় আমাকে পছন্দ করবে না। কেন জানো? কাল তোমাদের বাড়ির পেছনে তীর ছোঁড়া প্র্যাকটিস করছিলাম। রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলেন তিনি। একটা তীর ফসকে গেল। আরেকটু হলেই তাঁর পেটে লাগত। সরি বলেছি। তবু এমন করে আমার মুখের দিকে তাকালেন, যেন আমি একটা জল্লাদ।ইচ্ছে করে তাঁর পেট ফুটো করতে চেয়েছি।'

'মিসেস ডিকসনও হয়তো কালো চামড়া পছন্দ করেন না,' ভাবল রবিন। মুসা দুঃখ পেতে পারে ভেবে বলল না সেকথা।

ইদানীং নতুন বাতিকে ধরেছে মুসাকে, তীর ছোঁড়া শেখা। বাড়িতে যতক্ষণ থাকে, কাজকর্ম না থাকলে প্র্যাকটিস করে। পার্টির দিন রবিনদের বাড়িতে অনেকক্ষণ থাকতে হবে বুঝে সঙ্গে করে তীর-ধনুক নিয়ে এসেছিল। তখন ভাবতেও পারেনি, অনির্দিষ্টকালের জন্যেই থাকতে হবে ওকে।

'থাকো তুমি,' বলে পেছনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে এল রবিন।

বাতাস এখনও ঠাণ্ডা। আকাশের নিচের দিকে ঝুলে থাকা মেঘের দঙ্গলকে পুড়িয়ে যেন কোনমতে বেরিয়ে এসেছে সূর্য। শীত লাগছে। সোয়েটার পরে এলে ভাল হত। বেশি দূরে হলে ফিরে গিয়ে পরে আসত। কিন্তু মিসেস ডিকসনের বাড়ি কাছেই, মাত্র আধব্লক দূরে।

রাস্তার একধার দিয়ে দ্রুত হেঁটে চলল সে। পাতা ঝরে গেছে বনের ম্যাপল আর সিকামোর গাছগুলোর। এসে গেছে শীত। তেমন ঠাণ্ডা অবশ্য পড়েনি এখনও। মিসেস ডিকসনের পুরানো, কাঠের বাড়িটা নজরে আসতেই চলার গতি বাড়িয়ে দিল সে। শেষ কয়েক গজ প্রায় ছুটতে ছুটতে পেরোল।

সামনের বেলটা মনে হলো কাজ করছে না। দরজার মাঝখানে বসানো ব্রাস নকারটায় শব্দ করল রবিন। দ্বিতীয়বার নক করতে দরজা খুলে দিলেন মিসেস ডিকসন। বয়েস পঞ্চাশের কাছাকাছি। একসময় সুন্দরী ছিলেন। পরনে হলুদ নরম কাপড়ের প্যান্ট। গায়ে পুরুষের শার্ট। কুচকুচে কালো চুল মাথার পেছনে টেনে নিয়ে গিয়ে নীল রবারের ব্যাণ্ড দিয়ে বাঁধা।

রবিনের দিকে তাকিয়ে রইলেন মহিলা। এত সকালে ওকে দেখে অবাক হয়েছেন। 'রবিন?'

'গুড মর্নিং, মিসেস ডিকসন। বিরক্ত করলাম না তো?'

পাল্লাটা পুরো খুলে দিলেন মিসেস ডিকসন। 'না না, বিরক্ত কিসের। এসো। আমি ছ'টার সময়ই উঠে পড়ি।' ঘরে কফি আর সিগারেটের গন্ধ। 'তো কি মনে করে?'

আরেক দিকে তাকিয়ে প্রশ্নটা করলেন তিনি। ভাবভঙ্গিতে সন্দেহ হলো রবিনের। কিছু লুকোতে চাইছেন নাকি? মনে মনে নিজেকে ধমক লাগাল সে। কাল থেকে বড় বেশি সন্দেহপ্রবণ হয়ে উঠেছে।

'আপনার ফোনটা ঠিক আছে? আমাদেরটা নষ্ট।'

'আছে। এই তো কয়েক মিনিট আগে আমার বোনের সঙ্গে কথা বললাম। তোমাদেরটা গেল কেন? এদিকে তো ফোন সহজে খারাপ হয় না।'

'বুঝতে পারছি না। ফোন করব।'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, করো না।'

মিসেস ডিকসনের পেছন পেছন লিভিং রুমে ঢুকল রবিন। ভারি, পুরানো আমলের কাঠের আসবাব। রান্নাঘরেও তাই। দরজা দিয়ে দেখা যাচ্ছে।

'প্রথমে মাকে ফোন করব,' ফোন বুকের পাতা ওল্টাল রবিন।

'মাকে?'

মুখ তুলে তাকাল রবিন। মিসেস ডিকসনের চেহারায় বিচিত্র অভিব্যক্তি। অবাক হয়েছেন। চমকে গেছেন। চোখে চোখ পড়তেই মুখ ফিরিয়ে নিলেন। অভিব্যক্তিটা দূর হয়ে গেল চেহারা থেকে। সিগারেটের প্যাকেট তুলে নিলেন। ঠোঁটে লাগিয়ে ধরালেন একটা। হাত কাঁপছে।

'হ্যাঁ,' জবাব দিল রবিন। 'রাতে বাড়ি ফেরেনি। মা, বাবা, দুজনেই। কাজের চাপ বোধহয়। সারারাত কাজ করেছে।' মহিলাকে বলল বটে, কিন্তু নিজের কানেই অবিশ্বাস্য শোনাল কথাটা।

সিগারেট ঠোঁটে ঝুলিয়ে ঘুরে দাঁড়ালেন মিসেস ডিকসন। সিঙ্কের সামনে গিয়ে কয়েকটা অধোয়া প্লেট ধুতে আরম্ভ করলেন। জিজ্ঞেস করলেন, 'রাতে ফোন করেননি?'

'করবে কিভাবে? ফোন নষ্ট।'

'ও। কোথায় কাজ করেন ওঁরা?' পেছন ফিরে থেকেই কথা বলছেন মিসেস ডিকসন।

প্লেটগুলো পরিষ্কারই লাগল রবিনের কাছে। আর কি ধুচ্ছেন বুঝতে পারল না। 'পত্রিকায়। মর্নিং স্টার।'

'ভাল পত্রিকা। আমিও পড়ি। শুনেছি মালিক খুব বড়লোক। অনেকগুলো ইণ্ডাস্ট্রি আছে। প্লেনের পার্টস বানানোর কারখানা আছে একটা। আরও কি কি সব প্রতিষ্ঠান আছে। ফেডারেল গভর্নমেন্টের কাজ করে।'

'কোথায় জানলেন?'

'পত্রিকায়।'

তোয়ালেতে হাত মুছে ঘুরে দাঁড়ালেন মিসেস ডিকসন। সিঙ্কের কিনারে নামিয়ে রাখলেন সিগারেটটা। আবার তুলে নিলেন নার্ভাস ভঙ্গিতে। 'অনেক দূরে

তো পত্রিকার অফিসটা। এখান থেকে দুটো শহর পার হয়ে যেতে হয়। ওখানে কি বাড়ি পাওয়া যাচ্ছিল না? এতদূরে থাকতে এলেন কেন তোমার বাবা-মা?'

'জানি না। ভাবিনি কখনও। এখানকার স্কুলটা আমার জন্যে ভাল, সেজন্যেই হয়তো।'

'রবিন···' কিছু বলতে গিয়ে থেমে গেলেন মিসেস ডিকসন।

'কি?'

'না, কিছু না। কি যেন বলতে যাচ্ছিলাম, ভুলে গেছি।' তোয়ালেটা কাউন্টারে ছুঁড়ে ফেললেন মিসেস ডিকসন। 'দেখো তো, বকর বকর করেই যাচ্ছি। তোমাকে ফোন করতে দিচ্ছি না।'

তাড়াহুড়ো করে বেরিয়ে গেলেন তিনি। সিগারেটটা ফেলে গেলেন সিঙ্কের কিনারে রাখা অ্যাশট্রেতে।

সমস্যাটা কি মহিলার?—নিজেকে প্রশ্ন করল রবিন। ওদের বাড়িতে কয়েকবার গিয়েছেন তিনি। তখন খুব শান্ত, স্বাভাবিক মনে হয়েছে তাঁকে। এই এলাকার পড়শীরা মোটেও মিশুক নয়। মিসেস ডিকসনও তেমন মিশুক নন, তবে অন্যদের চেয়ে কিছুটা আলাদা। গোস্ট লেনে যারা বাস করে, তাদের কিনার দিয়ে হেঁটে গেলেও কেউ মুখ তুলে তাকায় না, হাত নাড়া তো দূরের কথা। ব্যাপারটা সেই প্রথম দিন থেকেই লক্ষ করেছে রবিন।

ডায়াল করল রবিন। রিঙ হচ্ছে অন্যপাশে। ছয়বার··· সাতবার···আট। জবাব নেই। সুইচবোর্ড মেসেজ সেন্টার থেকেও ধরল না কেউ। বেশি সকাল বলেই বোধহয়। কেউ আসেনি এখনও।

কাউন্টারে ঠেস দিয়ে দাঁড়াল রবিন। অসুস্থ বোধ করছে। হতাশ। ও ভেবেছিল অফিসে ফোন করলেই মায়ের গলা শুনতে পাবে।

কি করবে এখন?

কাকে ফোন করবে?

ব্ল্যাক ফরেস্টে কোন আত্মীয় নেই ওদের। কারও সঙ্গে বন্ধুত্বও হয়নি এখনও।

কি করবে? মা-বাবা কোথায় আছে, তাদের কি হয়েছে, না জেনে স্কুলে যেতেও ইচ্ছে করছে না। কিশোরকে খবর দেবে? ওরও জ্বর; বিছানায় পড়ে আছে। অতিরিক্ত জ্বর। এত অসুস্থতা নিয়ে কোন সাহায্য করতে পারবে না। তবে বুদ্ধি দিতে পারবে।

পাশা স্যালভিজ ইয়ার্ডের নম্বরে ফোন করল সে।

মেরিচাচী ধরলেন। কিশোরকে চাইল রবিন।

ভেসে এল কিশোরের খসখসে গলা। বার দুই কাশল। 'রবিন, বলো?'

'তোমার শরীর এখন কেমন?'

'একশো দুই ডিগ্রি জ্বর। অ্যান্টিবায়োটিক ছাড়া হবে না মনে হচ্ছে।'

'কিশোর, একটা সমস্যায় পড়েছি।'

সব কথা খুলে বলল রবিন।

'মর্নিং স্টারের অফিসে গিয়ে খোঁজ নিচ্ছ না কেন?' প্রথমেই বলল কিশোর।

তাই তো! এই সহজ কথাটা এতক্ষণ মনে পড়েনি কেন? ওখানে গেলেই তো

সব জানা যায়।

'থ্যাংক ইউ, কিশোর!'

'মুসাকে নিয়ে এখুনি চলে যাও। দেরি কোরো না। ওকে চিন্তা করতে মানা করো। ওদের বাড়িতে ফোন করে বলে দেবো ওর ফিরতে দু'চার দিন দেরি হতে পারে। কি হয় জানিয়ো। আমি বসে থাকতে পারছি না। গা কাঁপছে। রাখি?'

'ঠিক আছে।'

'আর হ্যাঁ, সাবধানে থেকো।'

'বিপদ আশা করছ নাকি?'

'করছি না। তবে বলা যায় না কিছুই। কেইনের ঘরের পিস্তলটা চিন্তায় ফেলে দিয়েছে আমাকে। যাই হোক, শুয়ে শুয়ে সমস্যাটা নিয়ে ভাবব আমি। দেখি কোন সমাধান বের করতে পারি কিনা। তুমি যোগাযোগ রেখো।'

'আচ্ছা।'

পাশের ঘরের দরজার দিকে তাকিয়ে গলা চড়িয়ে বলল রবিন, 'থ্যাংক ইউ, মিসেস ডিকসন!'

জবাব দিলেন না তিনি। কোথায় গেলেন? হয়তো বাথরুমে। দেরি করার সময় নেই। বেরিয়ে এল রবিন। অর্ধেক পথ আসার পর মনে পড়ল, ফোন কোম্পানিকে কমপ্লেইন করতে ভুলে গেছে। আবার দৌড়ে ফিরে এল মিসেস ডিকসনের বাড়িতে। ফোন করল।

'একেবারেই ডেড?' ওপাশ থেকে প্রশ্ন করল একটা আন্তরিক মহিলা কণ্ঠ।

'হ্যাঁ।'

'আশ্চর্য! ওই লেনের আর কোন বাড়ি থেকে এ রকম কমপ্লেইন আসেনি। ঠিক আছে, লোক পাঠাচ্ছি।'

'থ্যাংক ইউ,' রিসিভার নামিয়ে রাখল রবিন। কিছুটা স্বস্তি বোধ করছে। মিসেস ডিকসন আসছেন না। তাঁকে ধন্যবাদ দেয়ার জন্যে মিনিটখানেক অপেক্ষা করল সে। তারপরেও যখন তিনি দেখা দিলেন না, ঘর থেকে বেরিয়ে এল রবিন।

নিজেদের ড্রাইভওয়েতে ঢুকে বাড়ির সামনের দরজা দিয়ে না গিয়ে পেছন দিকে এগোল। গ্যারেজের পাশ কাটানোর সময় একটা জিনিস দৃষ্টি আকর্ষণ করায় থমকে দাঁড়াল। দরজার ওপর দিকটায় চারকোণা কাঁচ বসানো। তার ভেতর দিয়ে কিছু একটা চোখে পড়ল ওর।

দরজার কাছে এসে ভাল করে দেখার জন্যে কাঁচের ভেতর দিয়ে উঁকি দিল।

নীল একটা টয়োটা গাড়ি। যেটাতে করে অফিসে যান বাবা-মা।

সাত

দৌড়ে ঘরে ঢুকল রবিন। হতাশ হলো। মা-বাবা ফেরেননি। মুসাকে তখন বলল গাড়িটার কথা।

ঘর থেকে বেরিয়ে এল দুজনে। গ্যারেজের দরজা খুলল মুসা। গাড়িটার দিকে তাকিয়ে রবিনকে জিজ্ঞেস করল, 'কাল দেখোনি এটা?'

'খেয়াল করিনি। আসিইনি এদিকে।'
'তাহলে গেলেন কি করে আন্টিরা?'
'বাসে করে যাওয়া যায়।'
'কিন্তু গাড়ি নিলেন না কেন? নষ্ট নাকি?'
'কি জানি! কিছুই মাথায় ঢুকছে না আমার!'
'অত ভেঙে পড়লে চলবে না। কিশোরকে সঙ্গে পেলে ভাল হত। ও-ও তো অসুখ বাধিয়ে পড়ে আছে।'
'ফোন করেছিলাম।'
'শরীর কেমন?'
'ভাল না। বসে থাকতেও পারে না।'
'বলেছ সব?'
মাথা ঝাঁকাল রবিন। 'আমাদেরকে মর্নিং স্টারের অফিসে গিয়ে খোঁজ নিতে বলেছে।'
'আমরা ভাবলাম না কেন কথাটা! চলো, এখনই যাই। গাড়িটা নেব? নাকি বাস?'
'দেখে আসি, চাবি রেখে গেছে কিনা।'
'গাড়ি এখানে। চাবি নিয়ে যাবে কেন? দেখোগে, আছে।'
'মুসা, আমার ভাল্লাগছে না! গাড়ি ফেলে গেছে···খারাপ কিছু ঘটেছে নিশ্চয়ই।'
'আহা, চলোই না গিয়ে দেখি। অনেক কারণে গাড়ি ফেলে রেখে যেতে পারেন। হয়তো খারাপ হয়ে গেছে। কিংবা দূরে কোথাও যাওয়ার কথা ছিল, অফিসের গাড়িতে যাবেন, তাই রেখে গেছেন।'
মায়ের ঘরে গাড়ির চাবি পাওয়া গেল না। টেলিভিশনটা যে ঘরে আছে, সেখানে একটা কেবিনেটে বাড়তি আরেক সেট চাবি থাকে। পাওয়া গেল সেগুলো। জায়গামতই আছে। একটা কোট গায়ে চড়িয়ে মুসার সঙ্গে বেরিয়ে এল রবিন।
ড্রাইভিং সীটে বসল মুসা। এক মোচড়েই স্টার্ট হয়ে গেল গাড়ি। তারমানে খারাপ ছিল বলে ফেলে যাওয়া হয়েছে, তা নয়। গ্যারেজ থেকে বের করে আনল গাড়িটা।
মেঘের সঙ্গে লড়াইয়ে পরাস্ত হয়েছে সূর্য। পুরোপুরি চলে গেছে আড়ালে। ধূসর বিষণ্ন দিন। ঝোড়ো বাতাস বইছে। এতক্ষণে নভেম্বরকে নভেম্বরের মত লাগছে।
ব্লকের শেষ মাথায় এসে ঘ্যাচ করে ব্রেক কষল মুসা। 'ভ্যান!'
সামনে দাঁড়িয়ে আছে গাড়িটা। ড্রাইভিং সীটে বসে আছে বেঁটে, সোনালি-চুল একজন লোক।
ভ্যানের একেবারে পাশে গাড়ি নিয়ে গেল মুসা। সোজা সামনে তাকিয়ে আছে লোকটা। ভান করছে যেন দেখেনি ওদের।
ওর পাশের কাঁচ নামাল মুসা। মুখ বের করে ডেকে জিজ্ঞেস করল, 'এই যে, শুনছেন? কেইনের অপেক্ষা করছেন?'

লোকটাও কাঁচ নামাল। 'সরি। রেডিওর শব্দে শুনতে পাইনি। কি বলছ?' দাঁত বের করে চওড়া হাসি উপহার দিল সে। ঝকঝকে সাদা, নিখুঁত দাঁত। চুলের সোনালি রঙটা ফ্যাকাসে না হলে, আর মুখের চামড়া রক্তশূন্য না দেখালে চেহারাটাকে ভালই বলা যেত। মিশ্র রক্ত আছে বোধহয় শরীরে।

'কেইনের জন্যে বসে আছেন?' আবার জিজ্ঞেস করল মুসা।

'কে?'

'কেইন জেলিমেয়ার।'

মাথা নাড়ল লোকটা। এক চুল মলিন হলো না চওড়া হাসি। 'সরি। চিনি না।'

দীর্ঘ একটা মুহূর্ত লোকটার দিকে তাকিয়ে রইল মুসা। সরি বলল সেও।

আবার জানালার কাঁচ তুলে দিল লোকটা।

গ্যাস পেডাল চেপে ধরল মুসা। লাফ দিয়ে আগে বাড়ল গাড়ি। 'ও মিথ্যে বলেছে।'

'কি করে বুঝলে?'

'ওর হাসি দেখে।'

দুজনেই হাসল। হাসি আসেনি, তবু। যেন হাসিটা প্রয়োজন ছিল। আবার নীরব হয়ে গেল দুজনে।

গায়ে কোট আছে। তাও শীত লাগছে রবিনের। বেশি নার্ভাস হয়ে পড়েছে ও। পত্রিকার অফিসে গিয়ে কি দেখবে? খুব খারাপ কোন দুঃসংবাদ যদি দেয় অফিসের লোকজন? সহ্য করতে পারবে?

একহাতে হুইল ধরে আছে মুসা। দৃষ্টি সামনের দিকে। ভঙ্গি দেখে মনে হচ্ছে রোবট।

বেশিক্ষণ এই নীরবতা সহ্য করতে পারল না রবিন। 'মুসা, কি মনে হয় তোমার? অফিসের লোকেরা সবচেয়ে খারাপ দুঃসংবাদ কি দিতে পারে?'

'খারাপ?' শব্দটা আওড়াল মুসা। মোড় নিয়ে আরেক রাস্তায় পড়ল। 'সবচেয়ে খারাপ হলে বলবে, রবিন, তোমার বাবা-মা মঙ্গলবার বিকেলে ঠিক সময়েই বেরিয়ে গেছেন। কোথায় গেছেন তা তো বলতে পারব না। গতকাল সকালে অফিসে আসেননি কেন?'

আর ভাবতে চাইল না রবিন। মুসা ঠিকই বলেছে। সবচেয়ে খারাপ এটাই বলতে পারে ওরা। 'আর সবচেয়ে ভাল?' বলেই বুঝল বোকার মত কথা বলছে।

'দাঁড়াও, ডেকে দিচ্ছি ওদের। সারাটা রাত বড্ড পরিশ্রম করেছে বেচারারা। বাড়ি নিয়ে যাবে নাকি?'

'সত্যি এ রকম ঘটবে?'

'সম্ভাবনা আছে।'

এ রকম ঘটার কথা বিশ্বাস করতে পারছে না রবিন। অফিসে থেকে থাকলে কোন না কোনভাবে একটা খবর নিশ্চয় দিত মা। ওখানে গিয়ে পাওয়ার আশা নেই। তবে কোথায় আছে খোঁজ মিলতে পারে।

আর যদি খোঁজও না পায়?

খারাপ কথাগুলোই বার বার ঘুরেফিরে আসতে লাগল মনে। ভাল আর আসে

না। রাজ্যের যত খারাপ, ভয়ঙ্কর, কুকথা ছাড়া আর কিছু যেন ঢুকতে চাইছে না মগজে।

ইণ্ডাস্ট্রিয়াল পার্কের প্রবেশ পথটা খুঁজে বের করল ওরা। ওয়াগনার করপোরেশন কমপ্লেক্সে কোনদিক দিয়ে যেতে হবে সাইন লাগিয়ে বুঝিয়ে দেয়া হয়েছে। তিনতলা বিশাল একটা সাদা বিল্ডিং। যতটা আধুনিক হবে ভেবেছিল রবিন, ততটা নয়। চারপাশ ঘিরে আছে চমৎকার লন আর চিরসবুজ গাছের বাগান। কোন্ জায়গায় গাড়ি রাখবে বুঝতে পারল না ওরা। এ ব্যাপারে সাহায্য করতে পারে এমন কাউকেও চোখে পড়ল না। বিল্ডিঙের পেছনে বড় একটা চত্বর দেখতে পেল। ওখানে গাড়ি ঢোকাতেই ড্রাইভওয়ের পাশের ছোট একটা বুদ থেকে বেরিয়ে এল সশস্ত্র প্রহরী। থামতে ইশারা করল।

মুসার জানালার পাশে দাঁড়িয়ে হাত বাড়াল, 'পাস?

'যেতে বলছেন?'

'পাস!'

'আমাদের কাছে পাস নেই।'

একটা প্যাড বের করল গার্ড। নামের লম্বা একটা তালিকার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'নাম?'

'লিস্টে নাম পাবেন না আমাদের,' রবিন বলল। 'অ্যাপয়েন্টমেন্ট করে আসিনি। বাবা-মা'র সঙ্গে দেখা করতে এসেছি।'

'তাঁদের নাম?' আরেকটা আরও লম্বা লিস্ট বের করল গার্ড।

'রজার মিলফোর্ড এবং শেলি মিলফোর্ড।'

'আমার লিস্টে নেই,' সন্দেহ দেখা দিল গার্ডের চোখে।

'মর্নিং স্টারে চাকরি নিয়েছে। বেশিদিন হয়নি। নতুন।'

মাথা নিচু করে গাড়ির ভেতরটা দেখল গার্ড। মুসা আর রবিনকে ভাল করে দেখল। পেছনের সীটের দিকে তাকাল। 'ঠিক আছে, যাও। ওদিকে টোয়েন্টি থ্রী বি-তে পার্ক করো। হেঁটে সামনে দিয়ে গিয়ে ঢুকবে।'

'থ্যাংক ইউ,' স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল রবিন। বুঝতে পারল না এত কড়াকড়ি কেন।

যাই হোক, গার্ড যেখানে বলেছে সেখানে গাড়ি রেখে হেঁটে চলল ওরা।

'আরে আস্তে হাঁটো!' ডেকে বলল রবিন।

প্রায় দৌড়ে চলেছে মুসা। গতি কমিয়ে দিল। 'সরি। জায়গাটা আমার নার্ভের ওপর চাপ দিচ্ছে।'

'অনেক বড়।'

বাড়ির সামনের দিকে এসে কাঁচ লাগানো বিরাট এক দরজা দেখা গেল। ঠেলা দেয়ার জন্যে সেটায় হাত রেখে রবিন বলল, 'আশ্চর্য! এখানে কাউকে খুঁজে বের করা যাবে বলে তো মনে হচ্ছে না?'

দরজার অন্যপাশে ঢুকতেই এগিয়ে এল আরেক প্রহরী। বয়েসে তরুণ। নাকের নিচে শজারুর কাঁটার মত খাড়া খাড়া সোনালি কিছু চুল, গোঁফ বলে চালিয়ে দেয়ার চেষ্টা করছে।

পার্কিং-লটের গার্ডের মতই দুই গোয়েন্দার আপাদমস্তক দেখল এই লোকটাও। 'কারও সঙ্গে দেখা করতে এসেছ?'

'হ্যাঁ,' মাথা ঝাঁকাল রবিন।

'মিস্টার অ্যাণ্ড মিসেস মিলফোর্ড, তাই না?' বোঝা গেল পার্কিং-লটের গার্ড ইন্টারকম কিংবা রেডিওতে খবরটা পৌঁছে দিয়েছে ওকে। 'সোজা হয়ে দাঁড়াও। ব্যথা পাবে না।'

একটা মেটাল ডিটেক্টর বের করল সে। কাপড়ের ওপর দিয়ে মুসা আর রবিনের পা থেকে মাথা পর্যন্ত পরীক্ষা করল। লুকানো অস্ত্র আছে কিনা দেখল লোকটা, বুঝতে অসুবিধে হলো না ওদের।

ঘটনাটা কি? পত্রিকার অফিস এটা, না স্পাইদের হেডকোয়ার্টার?

'ও-কে,' সন্তুষ্ট হয়ে গার্ড বলল। 'এসো আমার সঙ্গে।'

খোলা, চওড়া লবি ধরে ওদেরকে নিয়ে চলল সে। দেয়ালে বড় বড় ছবি ঝোলানো, সব অয়েল পেইন্টিং।

গার্ডের সঙ্গে তাল রাখতে হিমশিম খেয়ে যাচ্ছে দুজনে। মশমশ শব্দ করছে স্নীকার। অস্বস্তি বোধ করছে ওরা।

প্রায় মাইলখানেক হাঁটার পর যেন একটা চকচকে পালিশ করা পিতলের রেলিংওয়ালা সিঁড়ির কাছে এসে থামল গার্ড। সিঁড়ির একপাশে লম্বা একটা কাঠের ডেস্কে বসা এক তরুণীর সামনে গোয়েন্দাদের দাঁড় করিয়ে দিয়ে কোন কথা না বলে ঘুরে দাঁড়াল। আবার ফিরে চলল সদর দরজায়।

অপেক্ষা করতে লাগল দুই গোয়েন্দা। একটা নোটবুকের দিকে তাকিয়ে আছে সুন্দরী রিসেপশনিস্ট। খড় রঙা চুল টেনে পেছনে নিয়ে গিয়ে শক্ত করে বেঁধেছে। নিখুঁত ছাঁটের সবুজ স্যুটের সঙ্গে ম্যাচ করা টাই পরেছে।

নোটবুক দেখা শেষ করে মুখ তুলল সে। ঝকঝকে একটা নিষ্প্রাণ হাসি উপহার দিল গোয়েন্দাদের। যান্ত্রিক কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল, 'কি সাহায্য করতে পারি?'

'আমার বাবা-মাকে দেখতে এসেছি,' জবাব দিল রবিন।

'তাঁরা এখানে কাজ করেন?'

'করেন,' বলতে যাচ্ছিল রবিন, কিন্তু বলা আর হলো না। আবার বাজল ডেস্কে রাখা ফোন। তুলে নিয়ে কানে ঠেকাল তরুণী। কথা বলছে তো বলছেই। শেষ আর হয় না। বার বার তাকাচ্ছে রবিন আর মুসার দিকে। অস্বস্তি বোধ করতে লাগল ওরা, বিশেষ করে মুসা। যদি বলে বসে, রবিনের বাবা-মাকে সে দেখতে এসেছে, তোমার কি? তুমি এসেছ কেন? রবিন ভয় পাচ্ছে—মানা না করে দেয়। বলে, সরি, দেখা হবে না।এমন জায়গার জায়গা, এখানে সবই সম্ভব!

মিনিট তিন-চার কথা বলে ফোন নামিয়ে রাখল তরুণী। আবার বাজল। তুলে নিয়ে আবার কানে ঠেকাল। আবার শুরু হলো দীর্ঘ আলাপ।

সিঁড়ি বেয়ে নেমে আসছে অনেক লোক। উঠছেও অনেকে। বেশির ভাগ বিজনেস স্যুট পরা। তাদের চকচকে পালিশ করা চামড়ার জুতো ভারি শব্দ তুলছে মার্বেলের মেঝেতে। ওপর দিক থেকে চোখ সরাচ্ছে না রবিন। ভাবছে, ইস্, বাবা-

মা যদি নেমে আসত এখন! এই যন্ত্রণাকর পরিস্থিতি থেকে মুক্তি পাওয়া যেত!

রিসিভার নামাল তরুণী। মুখ ফিরিয়ে তাকাল, 'কার সঙ্গে দেখা করবে?'

'আমার বাবা-মা,' জবাব দিল রবিন। 'রজার অ্যাণ্ড শেলি মিলফোর্ড।'

খটাখট ডেস্ক কম্পিউটারের কয়েকটা চাবি টিপল তরুণী। স্ক্রীনের দিকে তাকিয়ে রইল। 'মিলফোর্ড বানানটা কি?'

বলে দিল রবিন।

আবার কয়েকটা চাবি টিপল তরুণী। মনিটরের সবুজ পর্দায় ফুটে উঠল নামের একটা লিস্ট। সেগুলোতে একটা আঙুল রেখে ওপর থেকে নিচের দিকে নামিয়ে আনল সে। কয়েক সেকেণ্ড পর মুখ তুলে তাকাল। আঙুলটা স্ক্রীনে ঠেকানো রয়েছে। 'সরি। লিস্টে নেই।'

'অসম্ভব!' চেঁচিয়ে উঠল রবিন। 'তা কি করে হয়?'

'আমার মনে হয় ভুল বিল্ডিঙে এসেছ তোমরা।'

'ভুল বিল্ডিং?' লবির শেষ মাথার দিকে ফিরে তাকাল মুসা।

'ওয়াগনারদের অফিস একটা নয়। এই ইণ্ডাস্ট্রিয়াল পার্কে আরও কয়েকটা আছে।'

'কিন্তু পত্রিকার নাম তো দেখলাম এ বিল্ডিঙেই...' বলল রবিন।

'পত্রিকা? অনেকগুলো পত্রিকা আছে এদের। কোনটা?'

'মর্নিং স্টার।'

দীর্ঘ একটা মুহূর্ত দুই গোয়েন্দার দিকে তাকিয়ে রইল রিসেপশনিস্ট। ভ্রূকুটি করল। 'তাহলে তো এই বিল্ডিংই। দাঁড়াও, মিস্টার হেভেনফোর্থের সঙ্গে কথা বলি। তিনি এখানকার পার্সোনেল ডিরেক্টর।'

'থ্যাংক ইউ,' চেপে রাখা নিঃশ্বাসটা ফেলল রবিন। চিন্তা করছে। নাম দুটো নেই কেন তালিকায়? এক হতে পারে, চাকরির বয়েস অল্প বলে এখনও কম্পিউটারের লিস্টে নাম তোলা হয়নি। কিন্তু মেনে নিতে পারল না জবাবটা। এত কড়াকড়ি যেখানে, নিখুঁত কাজকর্ম, সেখানে দুটো নাম তোলার জন্যে দুই মাস অনেক সময়। না তোলার অন্য কোন কারণ আছে।

প্রচুর লোক আসছে, যাচ্ছে, ওঠানামা করছে সিঁড়ি বেয়ে; জুতোর নানা রকম শব্দ। উজ্জ্বল আলোয় ঝলমল করছে চারদিক। সেটা যেন আরও নার্ভাস করে দিচ্ছে ওদের।

ওদের দিকে পেছন করে নিচু গলায় মিস্টার হেভেনফোর্থের সঙ্গে কথা বলছে রিসেপশনিস্ট। কি বলছে বুঝতে পারল না মুসা বা রবিন। কয়েক সেকেণ্ড পর রিসিভার নামিয়ে রেখে ফিরে তাকাল তরুণী। বেশ উদ্বিগ্ন মনে হচ্ছে এখন। দ্রুত কয়েকটা নম্বর টিপল। বলল, 'মিস্টার জেরিমোর আছেন? তাঁর সঙ্গে আমাকে কথা বলতে বলেছেন মিস্টার হেভেনফোর্থ।'

আবার দুজনের দিকে পেছন করে কথা বলতে লাগল রিসেপশনিস্ট। কি বলল, এবারেও শুনতে পেল না ওরা। কথা শেষ করে রিসিভার নামিয়ে রেখে ফিরে তাকাল তরুণী। 'পাঁচ মিনিট বসো। মিস্টার জেরিমোর তোমাদের সঙ্গে দেখা করবেন।'

'তিনিও কি কোন পারসোনেল ডিরেক্টর?' জানতে চাইল রবিন।

'না, আমাদের সি.ই.ও.।'

মুসা জিজ্ঞেস করে ফেলল, 'সি.ই.ও?'

'চীফ এগজিকিউটিভ অফিসার,' মুসার অজ্ঞতা দেখে যেন ভ্রূকুটি করল তরুণী। খানিক দূরে বড় বড় দুটো চেয়ার দেখিয়ে বলল, 'বসো।' আবার ফোনের নম্বর টিপতে শুরু করল সে।

চেয়ারের কাছে গিয়ে দাঁড়াল মুসা আর রবিন। বসল না। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এই যন্ত্রণাদায়ক পরিস্থিতি থেকে রেহাই চায়।

'কোম্পানির এতবড় কর্মকর্তা আমাদের সঙ্গে দেখা করতে চায় কেন?' ফিসফিস করে বলল মুসা।

'জানি না!'

কয়েক মিনিট পর আরেকজন তরুণী নেমে এল সিঁড়ি বেয়ে। বগলে একগাদা ফাইল। গোয়েন্দাদের কাছে পরিচয় দিল, সে জেরিমোরের সেক্রেটারি। ওর সঙ্গে যেতে বলল ওদের।

ওপরে উঠে বেশ কয়েকটা বড় বড় হলঘর, অফিস আর লবি পার করিয়ে কোণের দিকে মিস্টার জেরিমোরের বিরাট অফিস ঘরে এনে ওদের ঢুকিয়ে দিল সে।

ওদের দিকে তাকিয়ে হাসলেন জেরিমোর। কানে লাগানো রিসিভারটা নামিয়ে রাখলেন। বয়েস কম, তিরিশের কোঠায়। খাটো করে ছাঁটা বাদামী চুল। কালো ফ্রেম ভারি পাওয়ারের চশমা চোখে। 'হাই। নাইস টু মিট ইউ। স্কুল নেই আজ?' আন্তরিক গলায় বললেন তিনি। আঙুল নাচিয়ে তাঁর ডেস্কের সামনের চেয়ারে বসতে ইশারা করলেন।

'যাইনি,' অস্বস্তি বোধ করছে মুসা।

হাসলেন জেরিমোর। ওদের চেহারার বিষণ্ণতা যেন হঠাৎ করে নজরে পড়ল।

'আমার বাবা-মাকে দেখতে এসেছি,' রবিন বলল। 'কাল রাতে বাড়ি যায়নি।'

'নিশ্চয় কাজের চাপ। দাঁড়াও, ডেকে দিচ্ছি। বাড়িতে কিছু হয়েছে নাকি?'

'না, তা নয়। কোন খবর দেয়নি তো...'

'দুশ্চিন্তা হচ্ছে, না?' উষ্ণ হাসি ছড়িয়ে গেল জেরিমোরের মুখে।

এ রকম একজন উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা ওদের সঙ্গে এত গুরুত্ব সহকারে কথা বলছেন, তাতে কৃতজ্ঞ হয়ে গেল রবিন।

'নাম কি তোমার বাবা-মার?'

'মিলফোর্ড। রজার আর শেলি মিলফোর্ড।'

ভারি চশমাটা নামিয়ে নাক ডললেন মিস্টার জেরিমোর। আবার পরে নিয়ে দ্রুত কয়েকটা চাবি টিপলেন কম্পিউটারের। 'মিলফোর্ড...মিলফোর্ড...'

'এই সেপ্টেম্বরে চাকরি নিয়েছে,' গলা কাঁপছে রবিনের। 'আমার বাবা পত্রিকার সিনিয়র রিপোর্টার। মর্নিং স্টার।'

কম্পিউটার থেকে চোখ সরালেন জেরিমোর। 'সাংবাদিক?'

'হ্যাঁ। আগে অনেক পত্রিকায়...'

'এই নামে নতুন কাউকে নেয়া হয়েছে বলে তো মনে পড়ে না,' দ্বিধায় পড়ে

গেলেন মনে হলো জেরিমোর।

'কিন্তু ওরা…'

উঠে দাঁড়ালেন তিনি। যথেষ্ট লম্বা মানুষ। বসে থাকলে অতটা লাগে না। 'আমাদের কোম্পানিতেই চাকরি নিয়েছেন? ঠিক জানো?'

'হ্যাঁ,' আবার স্বস্তির ভাবটা চলে গেল। শঙ্কিত হয়ে উঠল রবিন।

'আমি সত্যি দুঃখিত,' জেরিমোর বললেন। 'কি করে তোমাদের সাহায্য করব বুঝতে পারছি না।' কম্পিউটারের স্ক্রীনের দিকে তাকালেন আবার। আরও কয়েকটা চাবি টিপলেন। 'নাহ্,' মাথা নেড়ে বললেন অবশেষে, 'মিলফোর্ড নামে কেউ নেই এখানে।'

আট

রবিনের মনে হলো, বাস্তবে নয়, কোন দুঃস্বপ্নের মধ্যে রয়েছে। জেরিমোরের কথাটা কানে বাজছে: মিলফোর্ড নামে কেউ নেই এখানে।

ব্ল্যাক ফরেস্ট পার্কে বসে আছে ওরা। পার্কটা শহরের একধারে, হাই স্কুলের পেছনে। পাশ দিয়ে বইছে গ্রে উইলো রিভার। নির্জন পার্ক। গাছগুলো পাতাশূন্য। সব যেন কেমন বিমর্ষ, গম্ভীর।

মুসা বসেছে একটা গাছের শেকড়ে। রবিন শক্ত মাটিতে। গলা পর্যন্ত টেনে দিয়েছে জ্যাকেটের চেন। লম্বা চুল বাতাসে উড়ছে।

ওয়াগনার করপোরেশন থেকে ফেরার পথে একটা কথাও বলেনি রবিন। স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল যেন সে। বাবা-মা ওর সঙ্গে মিথ্যে কথা বলবে, ভাবতেও পারেনি। যেখানে কাজ করে না, সেখানকার নাম কেন বলল? এখন কিভাবে খুঁজে বের করবে ওদের?

মিস্টার জেরিমোরের কথা প্রথমে বিশ্বাস করেনি সে। নিশ্চয় তিনি ভুল করেছেন, বলেছে রবিন। এরপর তিনবার তিনি নিজের কম্পিউটার দেখেছেন। পার্সোনেল ডিপার্টমেন্টে খোঁজ নিয়েছেন। কম্পিউটারে কোন গণ্ডগোল, কোন ভুল আছে কিনা, স্পেশালিস্টকে দিয়ে দেখিয়েছেন।

কিন্তু না। সব ঠিক আছে। মিলফোর্ড নামে কেউ ওখানে কাজ করে না। কোনকালে করেওনি।

বাবা-মাকে খুঁজে বের করার ব্যাপারে রবিনকে সাহায্য করতে চেয়েছেন জেরিমোর। খুবই আন্তরিকতা দেখিয়েছেন তিনি।

ওয়াগনার বিল্ডিং থেকে ফিরে আর বাড়িতে ঢুকতে ইচ্ছে করেনি ওর। পার্কে নিয়ে আসতে বলেছে মুসাকে।

'কি করা যায় এখন, বলো তো?' ছোট একটা পাখির দিকে তাকিয়ে আছে মুসা। রবিনের চোখের দিকে তাকাতে পারছে না।

'পুলিশকে খবর দিতে হবে। আর কি?'

'হ্যাঁ, তাই করতে হবে।'

'কিন্তু আমার সঙ্গে মিথ্যে কথা বলল কেন, বলো তো?' প্রায় ককিয়ে উঠল

রবিন।

'আমার কেন যেন মনে হচ্ছে, কোথাও কিছু একটা ঘাপলা আছে,' চোখ ফেরাল না মুসা। দেখল ঠোকর দিয়ে একটা পোকা ধরেছে পাখিটা। 'মিথ্যে কথা বলার মানুষ নন ওঁরা।'

চুপ করে রইল দুজনে কিছুক্ষণ। তারপর মুসা বলল, 'পুলিশের কাছে যাওয়ার আগে বরং চলো কিশোরের সঙ্গে কথা বলি। ওর পরামর্শ শোনা যাক।'

'আমিও এই কথাটাই ভাবছিলাম। চলো। তবে তাড়াতাড়ি ফিরে আসতে হবে। রাতে বাড়ি খালি রাখাটা ঠিক হবে না।'

কিশোরের জ্বর কমেনি। তবে অ্যান্টিবায়োটিক খাওয়ার পর আর বাড়ছে না। দুই বন্ধুকে দেখে হাসল। রোগে চেহারা মলিন হলেও হাসিটা উজ্জ্বল। বালিশে পিঠ রেখে আধশোয়া হলো।

আগাগোড়া সব কথা ওকে শোনাল মুসা আর রবিন। চুপ করে শুনল কিশোর। ওরা থামলে প্রায় আধমিনিট চুপচাপ ভাবার পর বলল, 'যা যা জানলাম, আরেকবার আলোচনা করে দেখা যাক কোন সূত্র বেরোয় কিনা?'

'কি আর সূত্র বেরোবে?' আক্ষেপ করে বলল রবিন। 'আমার মা-বাবা আমার সঙ্গে মিথ্যে বলেছে। তারপর কোন রকম জানান না দিয়ে নিরুদ্দেশ হয়েছে। এর মধ্যে রহস্যের কিছু দেখছি না আমি।'

'আমি দেখছি। কারণ যদ্দূর চিনি, তাঁদেরকে মিথ্যুক ভাবতে পারছি না আমি।'

রবিন নিজেও পারছে না। কিন্তু অফিসের এতগুলো লোক কি মিথ্যে কথা বলেছে? কি স্বার্থ তাদের?

'এক এক করে জোড়া দেয়া যাক সব কিছু...'

'কি জোড়া দেবে?'

'তুমি উত্তেজিত হয়ে আছ। মাথাটা শান্ত করো। নইলে তাঁদের খুঁজে বের করতে পারবে না। মস্ত ক্ষতি হয়ে যেতে পারে। যা জিজ্ঞেস করছি, জবাব দাও। আজ কি বার?'

'বার দিয়ে কি হবে?'

'আহ্, জবাব দাও। বেশি কথা বলতে বাধ্য কোরো না আমাকে। আমি পারব না। এমনিতেই দুর্বল লাগছে।'

'তাহলে থাক এখন...'

'না, থাকবে না। তুমি বলো, আজ কি বার?'

'বুধবার।'

'তারমানে গতকাল ছিল মঙ্গলবার। সকালে উঠে চাকরিতে যান আঙ্কেল আর আন্টি। ঠিক?'

'বাড়ি থেকে বেরিয়েছে, এটা ঠিক,' রবিন বলল। 'তবে অফিসে গেছে কিনা বলতে পারব না। আদৌ কোথাও চাকরি করে কিনা এখন, তাও জানি না।'

'আবার রেগে যাচ্ছ। তোমাকে শান্ত হতে বলেছি,' কিছুটা রুক্ষ স্বরে বলল কিশোর।

'সরি। ঠিক আছে, তুমি বলো।'

হাতদুটো আড়াআড়ি কোলের ওপর ফেলল কিশোর। 'সকালে বেরিয়েছেন। রাতে বাড়ি ফেরেননি।'

'হ্যাঁ।'

'রাতে তাঁদের বিছানায় হাতির দাঁতে তৈরি একটা বানরের খুলি পেয়েছ। সেটাকে সূত্র ধরা যেতে পারে। তাই না?'

মুসা আর রবিন দুজনেই মাথা ঝাঁকাল।

'আরেকটা ব্যাপারে গুরুত্ব দিতে হবে,' রবিন বলল। 'কেইন জেলিমেয়ার মায়ের বেডরুমে ঢুকে পর্দার আড়ালে লুকিয়ে ছিল।'

মুসা বলল, 'আমি জানি কি করছিল। ভ্যানে যে লোকটা বসেছিল, তাকে সঙ্কেত দিচ্ছিল।'

মাথা দোলাল কিশোর, 'তা দিতে পারে। ভ্যানটা সম্পর্কে কি কি জানি আমরা?'

'প্রায় কিছুই না,' জবাব দিল রবিন।

'শুধু জানি,' মুসা বলল, 'বাড়ির সামনে অনেক রাত পর্যন্ত দাঁড়িয়ে ছিল। কেইনকে চুপি চুপি ওটাতে ঢুকতে দেখেছি।'

'অথচ পরের বার যখন গাড়িটা দেখলাম, তাতে বসা সোনালি-চুলো লোকটা বলল সে কেইনকে চেনে না।'

'ও মিথ্যে বলে থাকতে পারে,' নিচের ঠোঁটে একবার চিমটি কাটল কিশোর। 'কেইনের ঘরে একটা পিস্তল দেখেছ। ওটাকেও মূল্যবান সূত্র ধরা যেতে পারে।'

'কিন্তু এ সব সূত্র দিয়ে হবেটা কি?' অধৈর্য হয়ে উঠল রবিন।

'হবে অনেক কিছুই। পুলিশের কাছে যাওয়ার আগে কেইনের সঙ্গে কথা বলো। আমার ধারণা, ও কিছু জানে। হয়তো বিপদের মধ্যে রয়েছে সে-ও।'

'বেশ, বলছ যখন, তাই করব।'

'হ্যাঁ, কোরো। ও তোমাদের আত্মীয়। আমার মনে হয় না অহেতুক তোমাদের কোন ক্ষতি করবে ও। দেখো তো, এতক্ষণে চলে এসেছেন কিনা আঙ্কেল আর আন্টি? যাঁদের নিয়ে এত ভাবছি, দেখো, ওদিকে এসে বসে আছেন কিনা।'

'কি করে কথা বলব? ফোন তো খারাপ…আচ্ছা, দেখি, কমপ্লেইন তো করেছি। হয়তো মেরামত করে দিয়ে গেছে।'

ফোন করার জন্যে নিচতলায় নেমে এল রবিন। লিভিং রুমে ঢুকে রিসিভার তুলে ডায়াল করল। রিঙ হতে লাগল ওপাশে। তারমানে ঠিক হয়ে গেছে! কিন্তু তুলছে না কেউ। আটবার রিঙ হলো। লাইন কেটে দিয়ে আবার ডায়াল করার কথা ভাবছে সে, এই সময় তোলা হলো ওপাশের রিসিভার। 'হ্যালো?'

পরিচিত কণ্ঠ। তবু জিজ্ঞেস করল রবিন, 'কেইন?'

'হ্যাঁ। রবিন? কোনখান থেকে?'

'রকি বীচ। কিশোরদের বাড়ি। ফোনটা ঠিক হয়েছে দেখা যাচ্ছে।'

'হয়েছে।'

'মা এসেছে?'

জবাব দিতে এক মুহূর্ত দ্বিধা করল কেইন। 'না। দুজনের একজনও না।'
'কোন খবর দিয়েছে?'
'না।'
'কেইন, তোমার সঙ্গে আমার জরুরী কথা আছে।'
'বলো?'
'ফোনে বলা যাবে না।'
'ঠিক আছে, বাড়ি এসো, বলা যাবে। রাখি?'
'আচ্ছা।'

নয়

সন্ধ্যায় মুসাকে নিয়ে বাড়ি ফিরল রবিন।

বাইরে তখন ঘন অন্ধকার। নভেম্বরের সন্ধ্যা তাড়াতাড়ি আসে। জানালার পাশে রাখা ল্যাম্পটা জ্বালল সে। মৃদু আলোয় ঘরের পুরানো মডেলের আসবাবগুলো পরিবেশের বিষণ্ণতা আরও বাড়িয়ে দিল।

গায়ে কাঁটা দিল ওর। 'আর পুলিশকে না জানিয়ে উপায় নেই।'

'জানাও,' বলল মুসা।

রান্নাঘরে চলল ওরা। ঘরের যতগুলো আলো আছে, সব জ্বেলে দিল রবিন। আলো কম থাকলে বাড়িটা ছমছমে হয়ে যায়।

'তুমি বসো। আমি ফোন করি,' রিসিভার তুলে নিল মুসা।

'দাঁড়াও দাঁড়াও,' বাধা দিল রবিন। ফিল কোহেনের কথা মনে পড়েছে। কার্ডটা কোথায় রেখেছে মনে করতে পারল না। হাত দিল প্যান্টের পকেটে। পাওয়া গেল। বের করে আনল। দুমড়ে-মুচড়ে দলা পাকিয়ে আছে।

'কার?' মুসা জানতে চাইল।

'ক্যাপ্টেন ফিল কোহেন।'

'ভালই হলো। তোমার সঙ্গে পরিচয়, তুমিই কথা বলো।'

ফোনের কাছ থেকে পিছিয়ে গেল মুসা।

রিসিভার ক্রেডল থেকে উঠিয়ে রেখে, এক হাতে কার্ডটা ধরে আরেক হাতে নম্বর টিপল রবিন। তারপর রিসিভার তুলে কানে ঠেকাল।

প্রথম রিঙেই তুলে নিল লোকটা। 'পুলিশ। ক্যাপ্টেন কোহেন।'

'ও, ক্যাপ্টেন, আমি।'

'আমি কে?'

'রবিন। রবিন মিলফোর্ড। ভুলে গেছেন?'

'না, না, মনে আছে। পার্টি চলছিল তখন, তাই না?'

'হ্যাঁ…আমার বড় বিপদ, ক্যাপ্টেন…আমার বাবা-মাকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।'

গম্ভীর হলো ক্যাপ্টেনের কণ্ঠ। 'কি হয়েছে তাঁদের?'

'ওরা…' থেমে গেল রবিন। অদ্ভুত এক অনুভূতি। বাবা-মা নিখোঁজ হওয়ার

ব্যাপারটা শুধু যেন অন্যের বেলায়ই ঘটতে পারে, নিজের বেলায় নয়। এমনটা ঘটেছে, পুলিশকে জানাচ্ছে, এটা যেন নিজেরই বিশ্বাস হতে চাইছে না। কোনমতে বলল, 'কাল রাতে বাড়ি ফেরেনি কেউ।'

ওপাশে দীর্ঘ নীরবতা। তারপর গলায় সহানুভূতি ঢেলে ক্যাপ্টেন বলল, 'ফোনটোন কিছু করেননি?'

'না। সারারাত খারাপ ছিল ফোন। আজ সকালে কমপ্লেইন করে আসার পর ঠিক হয়েছে।'

'ঠিক আছে. তোমার রিপোর্ট লিখে নিচ্ছি। আমার মনে হয় অহেতুক দুশ্চিন্তা করছ। এ রকম আর ঘটেছে নাকি? মানে, কোন খবর না দিয়ে বাইরে রাত কাটানোর ঘটনা?'

'বাবা মাঝে-মধ্যে বাইরে রাত কাটায়। তবে কোনবারই এ রকম খবর না দিয়ে উধাও হয়ে যায়নি। ফোন করেছে। আর মা তো বহু বছর পর আবার চাকরি করতে গেল।'

'ও।' চুপ হয়ে গেল ক্যাপ্টেন। বোধহয় রিপোর্ট লিখে নিচ্ছে। খানিক পর জিজ্ঞেস করল, 'অফিসে ফোন করেছিলে?'

'নিজেই গিয়েছিলাম।' সকালে যা যা ঘটেছে, জানাল রবিন।

ক্যাপ্টেন বলল, 'চিন্তা কোরো না। একটা ব্যবস্থা হয়েই যাবে।'

আরও আগে পুলিশকে ফোন করা উচিত ছিল; ভাবল রবিন।

'ধরে রাখো, চেক করে নিই,' কোহেন বলল। কাগজ নাড়াচাড়ার শব্দ কানে আসছে রবিনের। কয়েক মিনিট পর বলল আবার কোহেন, 'কই, কোন অ্যাক্সিডেন্ট রিপোর্ট তো নেই।' আবার নাড়াচাড়া। 'বড় ধরনের কোন ক্রাইম রিপোর্টও নেই—হাইজ্যাক কিংবা খুন। ভয় পাওয়ার কিছু নেই তোমার। খারাপ কিছু ঘটেনি তাঁদের।'

'বাঁচালেন,' স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল রবিন।

ওর কাঁধ খামচে ধরল মুসা, 'কোথায় আছে, জানে?'

মাথা নাড়ল রবিন। ফিসফিস করে বলল, 'অ্যাক্সিডেন্ট করেনি। অন্য কোন দুর্ঘটনাও নয়। আমার মনে হয় খারাপ কিছু ঘটেনি!'

ওপাশে কাগজ নাড়াচাড়া বন্ধ হচ্ছে না। ক্যাপ্টেন বলল, 'খুব ভয় পেয়ে গেছ তুমি, তাই না? সাংঘাতিক সব খারাপ ঘটনা কল্পনা করে বসে আছ?'

'ঠিকই বলেছেন,' স্বীকার করল রবিন। 'আপনার কি ধারণা…'

'এখনই লোক লাগাচ্ছি আমি,' বাধা দিয়ে বলল ক্যাপ্টেন। একটা পুলিশ রেডিও অন হতে শুনল রবিন। 'ওয়াগনার করপোরেশনেও পাঠাব একজনকে। ভালমত চেক করে আসবে; কোন ভুল হয়েছে কিনা ওদের সেটা দেখবে।'

'থ্যাংক ইউ, ক্যাপ্টেন,' বিরক্ত; ক্লান্ত রবিন বলল

'একটুও ভেব না। ব্ল্যাক ফরেস্ট এমন কোন বড় শহর নয় যে দুজন লোক নিখোঁজ থেকে যাবে। তোমার বাবা-মাকে শীঘ্রি খুঁজে বের করব আমরা। ফোনের কাছে থেকো। তেমন মনে করলে লোক পাঠাব তোমাদের বাড়িতে।'

'অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাকে, ক্যাপ্টেন। আমার মন ভাল করে দিলেন

অনেকখানি।'

'দুশ্চিন্তা কোরো না, বুঝলে? যা করার আমি করছি।' তরল কণ্ঠে বলল ক্যাপ্টেন, 'তোমার বাবা-মাকে খুঁজে পেলে আচ্ছা করে বকে দেব, যাতে এ ভাবে আর কখনও না ভোগায় তোমাকে।'

'আপনারা অ্যাক্সিডেন্ট রিপোর্ট পাওয়ার পরে যদি কোন দুর্ঘটনা ঘটে থাকে?'

'তাহলেও খবর পেয়ে যেতাম এতক্ষণে। তোমাকে দুশ্চিন্তা করতে মানা করলাম না?'

'সরি। আর করব না। থ্যাংক ইউ।'

লাইন কেটে দিল কোহেন।

ওপাশে রিসিভার রাখার শব্দের পর পরই খুট করে আরেকটা শব্দ কানে এল রবিনের। মুহূর্তে বুঝে ফেলল, কি ঘটেছে। এক্সটেনশন লাইনে আরও কেউ ওদের কথা শুনছিল।

কে হতে পারে বুঝতে দেরি হলো না ওর। নিশ্চয় কেইন। চিলেকোঠার এক্সটেনশন থেকে শুনেছে। কিন্তু এ ভাবে চুরি করে শুনতে গেল কেন? নিচে নেমে এলেই পারত।

গুপ্তচরগিরি করছে কেইন?

দশ

'কেইন আমাদের ওপর স্পাইং করছে,' মুসাকে জানাল রবিন।

'তাই?'

'এক্সটেনশন লাইনে কথা শুনছিল।'

'সত্যি?'

মাথা নেড়ে জবাব দিয়ে সিঁড়ির দিকে ছুটল রবিন। ওপরে উঠে ডাক দিল, 'কেইন! কেইন?'

মুসাও ছুটে এসে সিঁড়িতে উঠল।

চিলেকোঠার দরজা খুলে বেরিয়ে এল কেইন, 'কি?'

'আমাদের ওপর স্পাইং করছ কেন?' বলতে কোন রকম দ্বিধাদ্বন্দ্ব করল না রবিন।

সিঁড়ি বেয়ে কয়েক ধাপ নেমে এল কেইন। ক্লান্ত দেখাচ্ছে ওকে। শার্টের বুকের কাছে দাগ। চুল এলোমেলো। অবাক হলো যেন, 'স্পাইং করছি?'

'হ্যাঁ, করছ! এক্সটেনশন লাইনে আমাদের কথা শুনছিলে,' রাগ করে বলল রবিন।

চুলের মধ্যে আঙুল চালাল কেইন, 'তুমি ভুল করছ। রিসিভার তুলিইনি আমি। শার্টে দাগ, বদলানোর জন্যে আরেকটা বের করছিলাম...'

'আমাকে ফাঁকি দেয়ার চেষ্টা কোরো না, কেইন—স্পষ্ট রিসিভার রাখার শব্দ শুনেছি আমি,' বাধা দিয়ে বলল রবিন।

'ফোনের মধ্যে শব্দ নানা কারণে হয়, রবিন। গোপনে কারও কথা শোনার

অভ্যাস আমার নেই।'

'আছে কিনা সে তো বোঝাই গেছে!'

'আরেকটু সংযত ভাবে কথা বলো, রবিন।'

'খারাপটা কি বলছি?'

'অহেতুক সন্দেহ করছ আমাকে। আমি বলছি, আমি ফোনে কথা শুনিনি,' রেলিঙে ঠেস দিয়ে দাঁড়াল কেইন। 'আমাকে সন্দেহ করার কোন কারণ নেই।'

'আছে,' জবাব দিল মুসা। 'রবিনের বাবা-মা নিখোঁজ হবার পর থেকেই রহস্যময় আচরণ করছ তুমি। কাল অনেক রাতে বেরোতে দেখেছি তোমাকে।'

'হ্যাঁ, বেরিয়েছি। কেন, সেটা কাল রাতেই বলেছি তোমাকে। ঘুম আসছিল না। হাঁটতে বেরিয়েছিলাম।'

'হাঁটতে বেরোলে রাস্তায় যেতে। ভ্যানে উঠলে কেন? আমি তোমাকে উঠতে দেখেছি।'

'আমি? ভ্যানে? সত্যি আমাকে দেখেছ?'

'উঠেছ তুমি, আর কাকে দেখব?' কেইনের ভান করা দেখে মুসাও রেগে যাচ্ছে।

'চোখে ঘুম ছিল বলে হয়তো ভুল দেখেছ। ভ্যানে আমি উঠিনি। তবে আমিও দেখেছি ওটাকে, রাস্তায় দাঁড়িয়ে ছিল। অচেনা একটা গাড়িতে আমি কেন উঠতে যাব, বলো?'

'সেটাই তো জানতে চাই,' আরও রেগে গেল রবিন।

'তোমাকে সন্দেহ করার আরও কারণ আছে,' মুসা বলল। 'তুমি যদি এত সাধুই হও, তোমার ঘরে পিস্তল কেন?'

'পিস্তল?' কেইনের নিচের চোয়াল ঝুলে পড়ল। 'আমার ঘরে?'

'তোমার ডেস্কের নিচের ড্রয়ারে,' রবিন বলল। 'কেন রেখেছ?'

ক্রমাগত প্রশ্নের আঘাতে নাস্তানাবুদ হয়েই যেন সিঁড়িতে বসে পড়ল কেইন। হাল ছেড়ে দেয়ার ভঙ্গি করে আহত স্বরে বলল, 'আমার ঘর খুঁজেছ তোমরা?'

'হ্যাঁ...'

'আমার ঘরে ঢুকে জিনিসপত্র ঘাঁটার অধিকার কে দিল তোমাদের?'

'কেউ না,' মুসা বলল। 'তোমার আচরণে সন্দেহ হয়েছে বলেই খুঁজেছি...'

'অদ্ভুত আচরণ আমি করিনি, করছ তোমরা,' মাথা নাড়তে নাড়তে বলল কেইন। 'রবিনকে অবশ্য সেজন্যে দোষ দিতে পারছি না। বাবা-মার কোন খবর নেই। দুশ্চিন্তায় মাথা গরম হতেই পারে। কিন্তু তাই বলে...'

'দেখো, কথা ঘুরিয়ে পার পাবে না!' রবিন বলল। 'পিস্তলটা তো আর ভুল দেখিনি। তুমি কলেজের ছাত্র, তুমি করবে লেখাপড়া, তোমার ড্রয়ারে গুলিভরা পিস্তল থাকে কেন?'

'পিস্তল একটা আছে আমার, অস্বীকার করছি না। কিন্তু তাতে দোষের কিছু নেই। ওটা আমার কাছে অনেক বিরাট ব্যাপার।'

'বুঝলাম না।'

'ওটা আমার বাবার। পুলিশ ছিল। আমার আঠারোতম জন্মদিনে উপহার

দিয়েছিল আমাকে। বলে দিয়েছিল যাতে সব সময় কাছে রাখি। তবে ব্যবহার করতে বারণ করেছিল। কয়েক হপ্তা পর ড্রাগ ব্যবসায়ীদের ধরতে গিয়ে গুলি খেয়ে মারা যায় বাবা।' মুখ ঘোরাল কেইন। 'বাবার ওই একটা স্মৃতিই রয়ে গেছে আমার কাছে,' গলা ধরে এল তার।

'এতক্ষণ এত ভণিতা করতে গেলে কেন? আরও আগে বললেই পারতে,' সুর নরম করল রবিন। 'যা ঘটে গেছে, এর জন্যে দুঃখিত...'

'থাক, মাপ চাওয়া আর লাগবে না,' উঠে দাঁড়াল কেইন। 'আন্টিরা যে ফিরলেন না, এ ব্যাপারে কি করেছ?'

'পুলিশকে জানিয়েছি।'

'কখন?'

'এই তো, খানিক আগে। তখনই তো এক্সটেনশন লাইনের শব্দ শুনলাম।

শব্দের আলোচনায় গেল না আর কেইন। 'জানিয়ে ভাল করেছ। আরও আগেই জানানো উচিত ছিল।' ঘড়ি দেখল। 'এহ্‌হে, দেরি হয়ে গেছে। আমাকে আবার এখুনি বেরোতে হবে। ফিরে এসে কথা বলব।'

হ্যাঁ-না কিছু বলল না রবিন। সিঁড়ি থেকে নেমে রান্নাঘরের দিকে এগোল। ওকে অনুসরণ করল মুসা।

সিঁড়িতে পায়ের শব্দ। ওপরে উঠে যাচ্ছে কেইন।

ফিসফিস করে রবিন বলল, 'ও মিছে কথা বলেছে।'

'কি করে বুঝলে?'

'এক্সটেনশনে কথা শোনার কথাটা স্বীকার করল না ও। অথচ আমি শিওর, ওই শুনেছে। ওর পিস্তলের গল্পও বিশ্বাস করিনি। স্মৃতি হিসেবে গুলিভরা পিস্তল কিশোর ছেলেকে উপহার দেবে কোন বাপ, তাও পুলিশ অফিসার, এই গাঁজাখুরি গল্প আর যেই করুক, আমি বিশ্বাস করি না।'

'কিন্তু বাপের কথা বলতে গিয়ে চোখ এমন ছলছল করে উঠল...'

'ওসব অভিনয়। থাক ওর কথা। খিদে পেয়েছে। ঘরে তো কিছু আছে বলে মনে হয় না।'

রান্নাঘরে খাবার খুঁজতে শুরু করল দুজনে। ব্রেড ড্রয়ারে একটা রুটি পেল মুসা। ফুড কেবিনেটের ওপরের তাক থেকে খানিকটা মাখন নামাল রবিন। ফ্রিজে পাওয়া গেল আরেক বয়াম আঙুরের জেলি।

খুশি হয়ে উঠল মুসা। 'অনেক পেলাম। আমি তো ভেবেছিলাম রাতে না খেয়েই থাকতে হবে।'

টেবিলে রুটি কাটতে বসল সে। মাখন আর জেলি মাখিয়ে দুটো টুকরো ঠেলে দিল রবিনের দিকে। নিজে একটুকরো নিয়ে বিরাট হাঁ করে কামড় বসাল। দুই টুকরো খেয়েছে, এই সময় কানে এল সিঁড়ি বেয়ে দৌড়ে নামছে কেইন।

সামনের দরজার পাল্লা বন্ধ হওয়ার শব্দ হতেই লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল রবিন, 'এসো!'

'কোথায়?'

'ওর পিছু নেব। কোথায় যায় দেখব।'

'না,' রবিনের হাত ধরে টেনে বসিয়ে দিতে গেল মুসা, 'দুজনের একসঙ্গে বেরিয়ে যাওয়া ঠিক হবে না।'

'কেন?'

'যদি পুলিশ ফোন করে? চলেও তো আসতে পারে কেউ। পাঠাবে বলেছে ক্যাপ্টেন কোহেন।'

'তা ঠিক,' ঠোঁট কামড়াল রবিন। 'এক কাজ করো তাহলে। তুমি থাকো...'

'না, তুমি থাকো,' উঠে দাঁড়াল মুসা।

'না, তুমি,' কাঁধে চাপ দিয়ে মুসাকে বসিয়ে দিল রবিন। ওকে আর কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে দৌড়ে বেরিয়ে গেল।

মুসার মনে হলো, অযথা যাচ্ছে রবিন। কেইনের সঙ্গে কথা বলার পর আর ওকে সন্দেহ করতে পারছে না। হয়তো কোন বন্ধুর বাড়িতে যাচ্ছে একসঙ্গে বসে পড়বে বলে। তবে ওর কোন বন্ধুকে কখনও দেখেছে বলে মনে পড়ে না মুসার। কোন বন্ধুকে কখনও আনেওনি রবিনদের বাড়িতে। অন্তত মুসা দেখেনি।

মড়মড় করে উঠল পুরানো বাড়িটা। গায়ে কাঁটা দিল মুসার। একা থেকে ভুল করেছে। রবিনের সঙ্গে চলে যাওয়াই উচিত ছিল। ফোনের অপেক্ষায় বসে থাকতে থাকতে কেবলই ভূতের কথা মনে হতে লাগল ওর।

অবশেষে বাজল ফোনটা। এই তো করেছে! উঠে গিয়ে রিসিভার কানে ঠেকাল সে। 'হালো?'

'মুসা, আমি!'

হানির গলা চিনতে বেশ খানিকটা সময় লাগল মুসার।

'হানি? কি হয়েছে?'

'ফোনে বলতে পারছি না,' ভীষণ ভয় পেয়েছে মনে হলো হানি, 'কিন্তু তোমাকে বলা দরকার...খুব জরুরী...তুমি চলে এসো...'

রিসিভারে ধস্তাধস্তির আওয়াজ শোনা গেল বলে মনে হলো। অস্পষ্ট চিৎকারও যেন শুনল।

'হানি? হানি?'

খুট করে একটা শব্দ।

'হানি? হানি? শুনছ?' চিৎকার করে বলল মুসা।

জবাবে ফোনের ডায়াল টোন ভেসে এল কানে।

এগারো

হানিদের বাড়িতে যাওয়ার সবচেয়ে শর্টকাট পথ গোস্ট লেনের পেছনে বনের ভেতর দিয়ে। ওই বন সম্পর্কে নানা ভয়ঙ্কর কাহিনী জানা থাকলেও এ মুহূর্তে সেসব কেয়ার করল না মুসা। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এখন হানিদের বাড়িতে পৌঁছতে হবে।

জ্যাকেট গায়ে দিল সে। একটা টর্চ খুঁজে বের করল। বনের ভেতর দিয়ে গেলে হানিদের বাড়ির পেছন দিকে চলে যাবে, জানা আছে ওর। এয়ারগান দিয়ে

পাখি মারতে বেরিয়ে ওদের বাড়ির কাছাকাছি চলে গিয়েছিল সে। ওকে দেখে বেডরুমের জানালায় দাঁড়িয়ে হাত নেড়েছিল হানি।

টেলিফোনে হানিকে আতঙ্কিত মনে হয়েছে, ভাবছে মুসা। কিছু যেন বলতে চেয়েছিল। কেউ একজন তাকে সেটা বলতে দেয়নি, আটকে দিয়েছে।

সত্যি কোন বিপদে পড়ল হানি? নাকি অহেতুক ভাবছে সে? জানার একটাই উপায়, ওদের বাড়িতে যাওয়া।

স্ক্রীনডোর ঠেলে খুলে বাইরে পা রাখল মুসা। ঠাণ্ডার বহর দেখে অবাক হয়ে গেল। নিজের নিঃশ্বাসও দেখতে পাচ্ছে, কালো আকাশের পটভূমিতে ধূসর বাষ্প হয়ে বেরোচ্ছে।

দ্রুত বাড়ির পাশ ঘুরে পেছন দিকে চলে এল সে। পা ফেললে চাপ লেগে অদ্ভুত শব্দ হচ্ছে। ঘন শিশির পড়েছিল বোধহয়, জমে বরফ হয়ে গেছে। বাতাস স্তব্ধ। নীরব রাত্রি। এতটাই নীরব, অবাস্তব লাগছে। বরফ জমা মাটিতে ওর স্নীকারের মচমচ ছাড়া আর কোন শব্দ নেই।

রবিনদের বাড়ির পেছনটা বেশ কিছুদূর পর্যন্ত ঢালু হয়ে নেমে গিয়ে তারপর আবার সোজা হয়েছে। ঢালের গোড়ায় নেমে আসার পর প্রায় ছুটতে শুরু করল সে। বনের মধ্যে ঢোকার পর যদি এই গতিতে এগোয়, তাহলে কয়েক মিনিটের মধ্যেই গাছপালার ওপাশে কয়েকটা বাড়ির আলো চোখে পড়বে, জানে। তখন হানিদের বাড়িটা চিনে বের করা কঠিন হবে না।

তবে এই বনের মধ্যে সরাসরি এগোনো মোটেও সহজ কাজ নয়। কোন ধরনের রাস্তা নেই। মাঝে মাঝে সামনে ঘন হয়ে আসে গাছপালা, ঝোপঝাড়। কখনও বা লম্বা ঘাস বাধা হয়ে দাঁড়ায়। পাশ কেটে ঘুরে এগোনো ছাড়া তখন উপায় থাকে না।

বনে ঢুকতে ঠাণ্ডা যেন আরও বেড়ে গেল। গতি কমাতে বাধ্য হলো সে। মরা পাতা বিছিয়ে আছে। গোড়ালি অবধি দেবে যায়। ভেজা, পিচ্ছিল পাতার নিচে ঢেকে থাকা শেকড় কিংবা পাথরে বার বার হোঁচট লাগছে।

কমে যাচ্ছে টর্চের আলো। ঝাঁকি দিল সে। কাজ হলো না। সাদা থেকে হলদে হয়ে এল আলোর রঙ। এতটাই মলিন, বড় জোর দুই ফুট চোখে পড়ে এখন।

পায়ের কাছ থেকে খসখস করে সরে গেল কি যেন। ধক করে উঠল বুক। পাতা নড়তে দেখা গেল।

'অ্যাই, যাহ্!' চিৎকার করে উঠল সে।

বনের মধ্যে ওর আশেপাশে তাহলে ঘোরাফেরা শুরু করেছে জন্তু-জানোয়ারেরা! বুকের কাঁপুনি বন্ধ করার চেষ্টা করল সে। নলখাগড়ার মত লম্বা ঘাস দুই হাতে ঠেলে সরিয়ে এগোতে লাগল।

হঠাৎ মনে পড়ল একটা গল্প। দুঃসাহস দেখিয়ে রাতের বেলা ব্ল্যাক ফরেস্টে ক্যাম্প করতে এসেছিল তিনটে ছেলে। বন্ধুদের সঙ্গে বাজি ধরেছিল, সারারাত বনে কাটাবে। বিকেল বেলাই তাঁবু খাটিয়ে রাত কাটানোর জন্যে তৈরি হলো ওরা। অন্ধকার নামলে আগুন জ্বেলে খাবার বানাতে বসল। কিন্তু খাওয়া আর

হলো না। ভয় পেয়ে দিগ্বিদিক জ্ঞান হারিয়ে ছুটল। বনের বাইরে বেরিয়ে সামনে যে বাড়িটা দেখল, মরিয়া হয়ে তার দরজায় ধাক্কা দিতে শুরু করল। আতঙ্কে কোটর থেকে চোখ ছিটকে বেরোনোর জোগাড়-একেকজনের।

ওরা বলল, একটা দানব নাকি আক্রমণ করেছিল ওদের। দেখতে কেমন ঠিকমত বোঝাতে পারল না কেউ। বলল গিনি পিগের মতই অনেকটা, তবে একশো গুণ বড়। ঘোড়ার সমান।

অনেকেই বিশ্বাস করল না ওদের কথা। পুলিশ এসে নিয়ে গিয়ে বাড়ি পৌঁছে দিল ওদের। ওরাও বিশ্বাস করল না এই গপ্পো।

পরদিন সকালে যার যার বাবাকে সঙ্গে নিয়ে জিনিসপত্র উদ্ধার করে আনতে আবার বনে গেল ছেলেগুলো। দেখে অদ্ভুত এক দৃশ্য। তাঁবুর একটা কানা ধারাল দাঁতে চিবিয়ে ছিন্নভিন্ন করে ফেলা হয়েছে। সব খাবার খেয়ে ফেলেছে। রান্না করাগুলো তো বটেই, ক্যানেরগুলোও সাফ। দাঁতে কামড়ে টিন কেটে বের করে খেয়েছে।

'যাহ্!' আবার ধমক দিল মুসা।

দূর, এই জঘন্য গল্পটা মনে পড়ার আর সময় পেল না! এখন প্রতিটি খসখস, শুকনো ডাল ভাঙার কিংবা অন্য যে কোন মৃদু শব্দও চমকে দিচ্ছে ওকে। ফিরে তাকিয়ে দেখছে ঘোড়ার সমান কোন গিনি পিগ দাঁত বের করে ওকে কামড়াতে আসছে কিনা।

আবার শব্দ হতেই থমকে দাঁড়াল সে। কান পেতে শুনল। নীরব চারদিক।

টর্চ তুলে, ঝাঁকি দিয়ে বেশি আলো বের করার চেষ্টা করল ওটা থেকে। লাভ হলো না। সামনের ঝোপের দিকে আলো ফেলল। কিছু নড়ছে না।

অস্বস্তিকর নীরবতা। এ থেকে মুক্তি চায় সে। যে কোন একটা শব্দ হোক—কুকুর কিংবা পেঁচার ডাক হলেও চলে। ডাকল না কোন প্রাণী। ওর মনে হতে লাগল এই পৃথিবীতে নেই ও, চাঁদের বুকে কিংবা অন্য কোন অচেনা গ্রহের বুনোপথে হেঁটে চলেছে।

আরেকটা ব্যাপার আবিষ্কার করল, দিক হারিয়েছে ও।

হানিদের বাড়িটা কোনদিকে? ঠিক পথেই এগোচ্ছে তো? রবিনদের বাড়িটাই বা কোনদিকে?

টর্চ নিভিয়ে দিল সে। কোন লাভ নেই আর এখন জ্বেলে। বরং ব্যাটারির অতি সামান্য যা শক্তি অবশিষ্ট আছে, সেটা জমা থাকুক। চোখে অন্ধকার সঁয়ে আসার অপেক্ষা করল। তাকাতে লাগল এদিক ওদিক। কাছে, দূরে, যেখানেই হোক একটা আলোর জন্যে হাহাকার করছে মন।

কিন্তু শুধুই অন্ধকার।

পথ হারিয়েছি ভালমতই—ভাবল সে।

কথাটা ভাবতেই ভয়ের ঠাণ্ডা শিহরণ নেমে গেল শিরদাঁড়া বেয়ে। লক্ষ করল ধীরে ধীরে কাটতে শুরু করেছে বনের অন্ধকার। ওপরে তাকিয়ে দেখল, মেঘের ভেতর থেকে বেরিয়ে আসছে চাঁদ। কৃতজ্ঞ হয়ে গেল চাঁদের প্রতি। মনে পড়ল, বনে ঢোকার সময় ওটা ওর ডানপাশে ছিল। এখনও যদি ডানে রেখেই হাঁটে, সঠিক

দিকে এগোবে।

ভয় কাটল না, তবে আত্মবিশ্বাস ফিরে পেল কিছুটা টর্চের সুইচ টিপল। ম্লান আলোও জ্বলল না আর এখন। একেবারে ফুরিয়ে গেছে ব্যাটারি। চাঁদের প্রতি খেয়াল রেখে সামনে পা বাড়াল সে।

ভেজা পাতার অস্বস্তিকর গালিচা মাড়িয়ে যতটা দ্রুত সম্ভব ছুটল সে। বেশ ভালই দেখতে পাচ্ছে এখন।

এই সময় পেছনে শোনা গেল পদশব্দ।

পায়ের শব্দই তো? হ্যাঁ, তাতে কোন সন্দেহ নেই। চারপাশটা এতই নীরব, সামান্যতম শব্দ হলেও কানে আসছে। সুতরাং ভুল হওয়ার কথা নয়।

দাঁড়িয়ে গিয়ে কান খাড়া করল। ভয় পেয়েছে। দ্রুত এগিয়ে আসছে পদশব্দ। পা দুটো কাঁপছে ওর। শক্তি পাচ্ছে না যেন। ছুটে আসা প্রাণীটা চারপেয়ে না দুইপেয়ে অনুমান করতে চাইল। পারল না। কাজটা অসম্ভব।

মনের পর্দায় ভেসে উঠল একটা ভয়ানক দৈত্যাকার গিনি পিগের ছবি। শিকারের পিছু নিলে কেমন আওয়াজ করে দানবটা?

শিকার?

আতঙ্কিত হয়ে পড়ল মুসা। দৌড়াতে শুরু করল। সারাক্ষণ চাঁদকে ডানে রেখে চলেছে। সতর্ক রয়েছে কোনমতেই যেন ওটা অন্য কোন পাশে সরে না যায়।

দু'হাত সামনে তুলে রেখেছে সে, যাতে চোখে মুখে এসে বাড়ি না মারতে পারে ডালপাতা। পুরোপুরি ঠেকাতে পারছে না। পায়ের শব্দ জোরাল হচ্ছে। এগিয়ে আসছে আরও দ্রুত। এখনও বোঝা যাচ্ছে না, প্রাণীটা কি?

ফিরে তাকিয়ে দেখবে নাকি? তাহলে থামতে হবে। বোকামি হয়ে যাবে সেটা আরও দ্রুত কাছে চলে আসার সুযোগ দেয়া হবে প্রাণীটাকে।

না থেকে বরং ছোটার গতি আরও বাড়িয়ে দিল সে।

পা ফসকাল হঠাৎ। গলা ফাটিয়ে চিৎকার করে উঠল। পিছলে নেমে যেতে শুরু করেছে। কিছুতেই ঠেকাতে পারছে না পতন। পড়তে পড়তে চিৎকার করে উঠল আবার। বিকৃত শোনাল কণ্ঠস্বর।

শেষ মুহূর্তে বুঝতে পারল সে, কোন ধরনের ফাঁদের মধ্যে পড়েছে।

বারো

শহরের দিকে এগোচ্ছে কেইন। বড় বড় পা ফেলছে। পেছনে তাকাচ্ছে না একবারও। ওর পেছনে সমান তালে এগোচ্ছে রবিন। অন্ধকার রাত। কি জানি কেন গোস্ট লেনের রাস্তার আলোগুলো সব নেভানো। চাঁদ চলে গেছে ঘন কালো মেঘের আড়ালে।

হালকা কুয়াশা গালে আলতো পরশ বুলিয়ে যাচ্ছে। নিঃশব্দে হাঁটছে রবিন। নিজেকে লুকিয়ে রাখার চেষ্টা চালাচ্ছে অনবরত কখনও পাতাবাহারের বেড়ার ধার ঘেঁষে এগিয়ে, কখনও বা ঝোপের কিনার দিয়ে চলে। রাস্তার মাঝখানে আসছে না

একটিবারের জন্যেও। কেইনের সঙ্গে তাল রাখতে হিমশিম খেয়ে যাচ্ছে। ভাবছে, ইস্, একটু কি গতি কমাতে পারে না! ওর এই দ্রুত চলা দেখে সন্দেহ বাড়ছে রবিনের।

মিল রোডে পড়ে বাঁয়ে মোড় নিল। একটা গাড়ি চলে গেল। ওটার হেডলাইটের আলো কয়েক সেকেণ্ডের জন্যে অন্ধ করে দিয়ে গেল ওকে। চট করে একটা ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে পড়ল সে। আলোটা সরে না যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করল।

আবার উঠে দাঁড়িয়ে দেখে অনেক এগিয়ে গেছে কেইন। দূরত্বটা পুষিয়ে নেয়ার জন্যে দৌড়াতে শুরু করল রবিন। অন্ধকারে কিছুতেই ওকে হারিয়ে যেতে দেবে না। মাটি ভেজা। স্নীকারের শব্দ হচ্ছে না তাই। মাঝে মাঝে একআধ ঝলক ঝোড়ো বাতাস আর পাশ দিয়ে হুস হুস করে চলে যাওয়া গাড়ির শব্দ ছাড়া আর কোন শব্দ নেই।

মোড় নিয়ে হথর্ন ড্রাইভে পড়ল কেইন। ডানে-বাঁয়ে তাকাল। পেছনেও যদি তাকায়, এই ভয়ে প্রায় ডাইভ দিয়ে মাটিতে পড়ল রবিন। হামাগুড়ি দিয়ে সরে গেল একটা ডাকবাক্সের আড়ালে। কিছুক্ষণ পর মাথা তুলল। চোখে পড়ল কেবল কালো গাছের সারি। কেইন অদৃশ্য।

হুড়মুড় করে উঠে দাঁড়াল সে। সামনে দৌড় দিল। ছোট একটা কফি শপ আছে হথর্ন ড্রাইভে, নাম বেকি'জ শপ। দিনের যখন-তখন ওখানে কলেজ ছাত্রদের আড্ডা দেখা যায়। বসে বসে কফি খায় আর গুলতানি করে। ওখানে ঢোকেনি তো?

কিছুদূর এগোতে কেইনের দীঘল দেহটা নজরে এল আবার রবিনের। হ্যাঁ, কফি শপের দিকেই চলেছে সে। কিন্তু কেন? পড়ার জন্যে বেরোয়নি সে। হাতে বই নেই। তা ছাড়া কফির দোকানে বসে আর যাই হোক, পড়া হয় না।

হয়তো কোন বন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে চলেছে। অন্ধকার রাতে এই ঠাণ্ডার মধ্যে রবিনের এত কষ্ট তাহলে বিফলে যাবে।

কেইন দোকানে ঢুকে যাওয়ার পর কয়েক মিনিট অপেক্ষা করল সে। তারপর একটা জানালার কাছে এসে ভেতরে উঁকি দিল। ভিড় তেমন নেই। কয়েকজন ছাত্র আর দু'তিনজন নিঃসঙ্গ বুড়ো মানুষ সামনে ধূমায়িত কফির সাদা মগ নিয়ে বসে আছে।

কেইনকে দেখতে পেল না ও। নিশ্চয় দোকানের একধারের কোন একটা বুদে বসেছে। দেখতে হলে ভেতরে ঢুকতে হবে।

সিদ্ধান্ত নিতে পারছে না রবিন—ঢুকবে, কি ঢুকবে না। শেষে যা থাকে কপালে ভেবে ঢোকাই ঠিক করল। দেখতে হবে কি করছে কেইন।

জ্যাকেটের হুডের একপাশ টেনে মুখটা যথাসম্ভব ঢেকে নিল সে। পা রাখল কফি শপের ভেতরে। বাইরের ঠাণ্ডার তুলনায় এখানে বেশ গরম। ডিম, মাংস ভাজা আর কফির গন্ধ আসছে। মাথা নিচু করে রেখে ধীরে ধীরে এগোল বুদের সারির দিকে। প্রথম বুদটার কাছে এসে দরজা দিয়ে ভেতরে উঁকি দিল। নেই।

একের পর এক বুদে উঁকি দিতে লাগল সে।

কেইন বসে আছে শেষ বুদটায়। হাত নেড়ে নেড়ে কথা বলছে কারও সঙ্গে।

কার সঙ্গে বলছে দেখার জন্যে আরেকটু সরল রবিন।

সেই লোকটা! ভ্যানের মধ্যে দেখেছিল যাকে সোনালি চুল। দুজনেই কথা বলছে। দুজনেই উত্তেজিত। কথা বলার সময় মাঝে মাঝে টেবিলে চাপড় মারছে লোকটা।

বোঝা গেল ওদের সঙ্গে মিথ্যে কথা বলেছে কেইন। ওর পিছু নেয়াটা বিফলে যায়নি। ভ্যানের ব্যাপারে মিথ্যে বলেছে সে, সম্ভবত পিস্তলটার ব্যাপারেও। একসঙ্গে কাজ করছে কেইন আর ওই লোকটা।

কি কাজ?

যেটাই হোক, রবিনের ধারণা এর সঙ্গে ওর মা-বাবার নিরুদ্দেশ হওয়ার কোন যোগাযোগ রয়েছে।

দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়িয়ে যতটা পারল নিজেকে আড়াল করে বুদের ভেতরে তাকিয়ে রইল রবিন। পকেট থেকে একটুকরো কাগজ বের করে তাতে কি আঁকতে শুরু করল কেইন। কি আঁকছে? ম্যাপ?

দেখতে ইচ্ছে করল রবিনের। কিন্তু আর এগোনো উচিত হবে না। কেইনের চোখে পড়ে যাবে। খুট করে শব্দ হতে ফিরে তাকিয়ে দেখে মোটাসোটা এক ওয়েইট্রেস চেয়ে আছে ওর দিকে। মহিলার চোখে সন্দেহ।

আর থাকা যাবে না। দরকারও নেই। যা দেখার দেখা হয়ে গেছে। কেইন একটা মিথ্যুক। তাড়াতাড়ি গিয়ে ক্যাপ্টেন কোহেনকে এ কথা জানাতে হবে।

হুডটাকে আবার মুখের ওপর টেনে ঘুরল রবিন। পা বাড়াতে যাবে, কাঁধ চেপে ধরল একটা হাত। 'রবিন!'

'আঁউ!' করে উঠল রবিন, যতটা না ব্যথায়, তারচেয়ে বেশি বিস্ময়ে। আঙুলগুলো খামচে ধরেছে ওর কাঁধ। চেপে ধরল ওকে দেয়ালের সঙ্গে।

দেখার জন্যে ফিরে তাকাল রবিন

চোখে চোখ পড়তেই কেইন বলে উঠল, 'আমার পিছু নিয়েছিলে!' কাঁধে আরও শক্ত হলো আঙুলের চাপ। চোখ জ্বলছে।

ওকে বিশ্বাস নেই! ও বিপজ্জনক! মনে মনে নিজেকে বলল রবিন। আগে বুঝতে পারেনি সেটা। কিন্তু এখন সে নিশ্চিত, প্রয়োজনে ভয়ঙ্কর হয়ে উঠতে পারে কেইন।

'উফ্, কাঁধটা ব্যথা করে ফেলেছ,' ডলতে ডলতে বলল রবিন। মাথা থেকে হুড ফেলে দিল। আর ওটা তুলে রাখার কোন মানে হয় না।

'সরি,' ছেড়ে দিল কেইন। ওর ভাবের কোন পরিবর্তন হলো না। 'ব্যথা দিতে চাইনি।'

কিন্তু দিতে যে চেয়েছে তাতে কোন সন্দেহ নেই রবিনের। ওর কাঁধের ওপর দিয়ে বুদে বসা লোকটার দিকে তাকাল। স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। ঠোঁটে ঠোঁট চেপে রেখেছে।

রবিনকে অবাক করে দিয়ে হাসল কেইন। রাগটা দমন করে ফেলেছে অকস্মাৎ। সোনালি-চুল লোকটার দিকে তাকিয়ে আছে দেখে রবিনের কনুই ধরে

টেনে নিয়ে গেল বুদের ভেতর। 'রবিন, ইনি ডক্টর রস ডুগান। আমার ফ্যাকাল্টি অ্যাডভাইজার।'

মনে মনে বলল রবিন, 'তা তো বটেই। এই লোক অ্যাডভাইজার হলে আমি আমেরিকার প্রেসিডেন্ট।' মুখে বলল, 'নাইস টু মীট ইউ, মিস্টার…'

'ডক্টর,' একটা যান্ত্রিক হাসি দিয়ে শুধরে দিল লোকটা।

'পরীক্ষার ব্যাপারে একটা অ্যাডভাইজ নেয়ার জন্যে এখানে ডক্টরের সঙ্গে দেখা করেছি,' কেইন বলল।

কি সাংঘাতিক মিথ্যুক!—রবিন ভাবল। কাগজটাতে কি লিখেছে দেখার চেষ্টা করল। তাড়াতাড়ি ওটা ভাঁজ করে ফেলল কেইন। আবার শীতল হয়ে উঠেছে চোখ দুটো। 'তুমি এখানে কি জন্যে এলে, রবিন?'

'আমি?…এক বন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে।' বলেই বুঝল রবিন, কথাটা মোটেও বিশ্বাসযোগ্য হলো না। 'মনে হচ্ছে আজ আর আসবে না। যাকগে, চলি। পরে দেখা হবে।' দরজার দিকে রওনা হলো সে।

পেছন থেকে রবিনের কথাটা ফিরিয়ে দিল ডুগান, 'নাইস টু মীট ইউ, রবিন।'

কফি শপ থেকে প্রায় দৌড়ে বেরোল সে। বাইরে এসে দম নিল ভালমত। ধাক্কা লাগাল দুটো ছেলের সঙ্গে। ওরা ঢুকছে দোকানে।

'দেখে হাঁটো না!' বলল একজন।

ফিরে তাকাল না রবিন। ছুটে নামল রাস্তায়। বাইরে এখন অনেক বেশি ঠাণ্ডা। গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি পড়ছে। মাথায় আবার হুড টেনে দিল সে। এবার আর মুখ ঢাকতে নয়, ঠাণ্ডা ঠেকানোর জন্যে। বুকের মধ্যে দুরুদুরু করছে ওর। কেমন বোকা বোকা লাগছে নিজেকে।

কি করা যায় ভাবতে ভাবতে চলল সে। বাড়ি গিয়ে প্রথমেই আগে কেইনের পিস্তলটা লুকিয়ে ফেলবে। কেইন ওকে ভয় পাইয়ে দিয়েছে। ওর ঘরে একটা গুলিভর্তি পিস্তল থাকা আরও ভয়ের ব্যাপার। ও যে একটা মিথ্যেবাদী, এটা প্রমাণ হয়ে গেছে। ওর বন্ধুও আরেক মিথ্যুক। সেদিন রাস্তায় কি রকম মিথ্যে বলেছিল—সে নাকি কেইনকে চেনে না।

ভয়ের অনুভূতিটা বাড়ল রবিনের। প্রায় ছুটতে শুরু করল বাড়ির দিকে। কিন্তু ওখানেও কি নিরাপদ? না। যতক্ষণ কেইন বাস করছে ওই বাড়িতে এবং যতক্ষণ ওর কাছে পিস্তলটা আছে, ততক্ষণ নিরাপদ নয় সে।

বাড়ির কাছে চলে এসেছে। আর মাত্র দুই ব্লক দূরে। এই সময় টের পেল একটা গাড়ি পিছু নিয়েছে ওর।

তেরো

শান্ত হও! মাথা ঠাণ্ডা রাখো! নিজেকে বোঝাল মুসা।

কারাতে শেখানোর ওস্তাদের শিক্ষা মনে পড়ল—লম্বা শ্বাস টেনে ফুসফুস ভরে ফেলো, তারপর আস্তে আস্তে ছাড়ো, ঠাণ্ডা হয়ে যাবে মাথা। এরপর ভেবে দেখো বিপদটা কতখানি। মুক্তি পাওয়ার কোন্ কোন্ পথ খোলা আছে।

কাঁচা হাতে তৈরি ফাঁদ। অথবা তাড়াহুড়ো করে করা হয়েছে। চওড়া একটা গর্ত, পাতা বিছিয়ে ঢেকে দেয়া হয়েছিল ওপরটা গর্তের গভীরতা ছয় ফুটের বেশি নয়

বেরোনো যাবে। আতঙ্কিত হওয়ার কিছু নেই। সারাজীবন আটকে থাকতে হবে না এখানে। বের হতে পারবে। কিছু না, হাত বাড়িয়ে শুধু গর্তের কিনারটা চেপে ধরো, তারপর হাতে ভর দিয়ে টেনে তোলো নিজেকে।

কাজ শুরু করো। আবার লম্বা দম নাও। উঠে দাঁড়াও।

মাথাটা শান্ত করল মুসা। বুকের মধ্যে হৃৎপিণ্ডের দাপাদাপি অনেকটা স্বাভাবিক হয়ে এল। উঠে দাঁড়াল সে।

খুব সহজেই খাদের বাইরে বের করে আনল নিজেকে। শরীরের কাঁপুনি বন্ধ করতে না করতেই আবার আতঙ্কিত হয়ে পড়ল। যে জানোয়ারটা ওকে তাড়া করে এনে গর্তে ফেলেছিল, আবার তেড়ে এল ওটা।

অন্ধকারে বুঝতে পারল না জানোয়ারটা কি।

ওটার ছুটে আসার শব্দ শুনল। সামনের পায়ের শক্তিশালী পায়ের আঘাত লাগল বুকে। চাপা গর্জন করে উঠল ওটা। নিঃশ্বাসের গরম দুর্গন্ধ এসে লাগল নাকে।

আবার গর্তে পড়তে শুরু করল মুসা। নিজের অজান্তে গলা চিরে চিৎকার বেরিয়ে এল, 'বাঁচাও!'

আশেপাশে কেউ নেই বাঁচানোর।

চিত হয়ে পড়ে গেল সে। আরেকটা চাপা গর্জন করে ওর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল জানোয়ারটা বাঁ কব্জি কামড়ে ওকে মাটিতে চেপে ধরে রাখতে চাইল।

জানোয়ারটাকে চিনতে পেরে আতঙ্ক অনেকখানি কেটে গেল মুসার। দানব নয়, একটা বিশাল কুকুর।

'শান্ত হ, বেটা, আস্তে! যা, বাড়ি যা!' কুকুরটাকে বোঝানোর চেষ্টা করল সে। নিজের কণ্ঠস্বর শুনে নিজেই অবাক হয়ে গেল। ওর নয়, যেন আতঙ্কিত ছয়-সাত বছরের কোন শিশুর।

কুকুরটা যেন শুনলই না ওর কথা। কব্জিতে কামড় বসে যাচ্ছে। অনেক কষ্টে হাতটা ছাড়িয়ে নিয়ে গড়িয়ে গর্তের একধারে সরে গেল মুসা।

ঘুরে দাঁড়াল কুকুরটা। মাথা নিচু। ওর দিকে তাকিয়ে ভয়াবহ চাপা গর্জন করতে লাগল।

দানব না, দানবের বাপ—মনে হলো মুসার। এত বড় কুকুর আর দেখেনি। শেফার্ড গোষ্ঠীর খুব বড় জাতের কোন কুকুর। রাতের বেলা এই বনের মধ্যে কি করছে এটা? বুনো কুকুর নাকি? ওকে খেতে এসেছে?

না, বোধহয়। বুনো কুকুর নয়। গলায় কলার দেখা গেল। লকেটের মত কি যেন ঝুলছে ওটা থেকে।

'বস, বেটা! লক্ষ্মী কুকুর! অমন করে না!' কোমল কণ্ঠে বলল মুসা।

জবাবে নিচের ঠোঁট টেনে মারাত্মক দাঁত বের করে দেখাল লক্ষ্মী কুকুর। চাঁদের আলোয় চকচক করে উঠল লম্বা, চোখা, ধারাল দাঁতের সারি।

হাল ছাড়ল না মুসা। বিড়বিড় করে বলতে লাগল, 'লক্ষ্মী কুকুর! যা বেটা, বাড়ি যা! যা!'

কয়েক সেকেণ্ড পরেই বুঝল বোকার মত বকবক করছে কুকুরটার সঙ্গে। শুনবে না ওটা। বাড়ি যাবে না। এটাই ওর বাড়ি। এই ব্ল্যাক ফরেস্ট। আর বাড়ি রক্ষা করার ব্যাপারে কতটা সফল এবং দক্ষ ও, সেটার প্রমাণ দিতে চায় মুসার ওপর।

আক্রমণ করে বসা কুকুরকে কখনও বুঝতে দেবে না যে তুমি ভয় পেয়েছ, তাহলে সর্বনাশ!—কুকুর সম্পর্কে এই সার কথাটা মনে পড়ল মুসার।

কিন্তু কি করে বোঝাবে ভয় পায়নি? বেকায়দা অবস্থায় পড়ে আছে গর্তের মধ্যে। থরথর করে কাঁপছে শরীর। কণ্ঠস্বর হয়ে গেছে অস্বাভাবিক। কথা বলতে গেলেই ইঁদুরের মত কিঁচকিঁচ শব্দ বেরোচ্ছে।

বেশি ভাবার সময় নেই। গরগর শুরু করল কুকুরটা। আচমকা ভারি একটা হাঁক ছেড়ে ঝাঁপ দিল ওর মুখ লক্ষ্য করে।

ঝট করে মাথা নিচু করে ফেলল মুসা। ব্যর্থ করে দিল প্রথম আঘাত। কিন্তু ভারি শরীরের ধাক্কায় কাত হয়ে পড়ে গেল একদিকে। গায়ের ওপর চেপে এল কুকুরটা।

দুই হাতে ঠেলা মেরে ওটাকে ফেলে দিল সে।

মাটিতে পড়েই লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল কুকুরটা। প্রতিপক্ষের শক্তি আঁচ করে একটু যেন অবাক হয়েছে। আবার লাফ দিল।

গড়িয়ে সরে গেল মুসা। এবারও লক্ষ্যভ্রষ্ট করল কুকুরটাকে।

ঝটকা দিয়ে উঠে দাঁড়াল মুসা। হাত বাড়িয়ে লাফ দিল ওপর দিকে। গর্তের কিনারটা ধরে উঠে যেতে চাইল। কিন্তু ফসকে গেল হাত। পড়ল কুকুরটার পিঠের ওপর।

এত ভারি বোঝার চাপে বাঁকা হয়ে গেল কুকুরটার শরীর। বুক ঠেকে গেল মাটিতে। অস্বস্তিতে গর্জন করতে করতে নিজেকে বের করে আনতে চাইল মুসার শরীরের নিচ থেকে। সুযোগটা কাজে লাগাল মুসা। ওটার চিবুকের নিচে হাত ঢুকিয়ে দিয়ে টানতে শুরু করল নিজের দিকে।

কুকুরটার গায়ে ভয়ানক দুর্গন্ধ। সহ্য করতে না পেরে শ্বাস নেয়া বন্ধ করে ফেলল মুসা।

শরীর মোচড়াতে আরম্ভ করল কুকুরটা। হাত ছুটিয়ে বেরিয়ে যেতে চাইছে। কিন্তু ছাড়ল না মুসা। প্রাণপণে ধরে রেখেছে। চাপ বাড়াল আরও। পিঠে চেপে বসে মাথাটা আরও জোরে টানতে লাগল নিজের দিকে।

কুকুরটার চাপা গর্জন আর্তচিৎকারে পরিণত হলো। কিন্তু ছাড়ল না মুসা। ভেজা চামড়ায় পিছলে যেতে শুরু করেছে আঙুলগুলো। টনটন করছে। দম নিতে বাধ্য হলো সে। ভয়াবহ দুর্গন্ধযুক্ত বাতাস ঢুকল নাকে।

তবে রক্তে অক্সিজেন পৌঁছতেই আবার শক্তি পেল আঙুলে।

মাথা ঝাড়া দিল কুকুরটা। হাঁটু দিয়ে মেরুদণ্ড চেপে ধরে গায়ের জোরে টানতে লাগল মুসা। টানছে···টানছে···শক্তি ফুরিয়ে আসছে হাতের···আর বেশিক্ষণ

এই চাপ রাখতে পারবে না···

আচমকা মট করে একটা শব্দ হলো।

মুহূর্তে চাপ কমে গেল। পেছনে ছিটকে পড়ল সে। পিঠ ধাক্কা খেল দেয়ালে।

ঘাড় ভেঙে গেছে কুকুরটার।

থেমে গেছে চিৎকার।

জোরে জোরে শ্বাস টানছে মুসা। হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে কপালের ঘাম মুছল। ঠাণ্ডা ঘামে ভিজে গেছে শরীর। হাতে কুকুরটার গায়ের দুর্গন্ধ। পাক দিয়ে উঠল নাড়ী।

গর্তের দেয়ালে পিঠ দিয়ে বসে রইল সে। কুকুরটার দিকে চোখ। বিশ্বাস করতে পারছে না খালি হাতে মেরে ফেলেছে এতবড় একটা জানোয়ারকে। কানে বাজছে ঘাড় মটকানোর বিশ্রী শব্দটা।

কতক্ষণ পর বলতে পারবে না, তবে বেশ অনেকক্ষণ পর হাত বাড়িয়ে ছুঁয়ে দেখল কুকুরটাকে, সত্যিই মরেছে কিনা। ঠেলা দিয়ে ওল্টাল ভারি শরীরটা। কলারে লাগানো জিনিসটা দেখল।

একটা সাদা বানরের খুলি!

বিস্ময়ে অস্ফুট একটা শব্দ বেরোল মুখ থেকে।

মাথায় কিছু ঢুকছে না যেন ওর। খুলিটা তালুতে রেখে তাকিয়ে আছে। এই জিনিস বুনো একটা কুকুরের গলায় এল কি করে?

আরেকটা জিনিস লক্ষ করল সে। কলারে আটকানো শেকলের খানিকটা অংশ। শেকলের একটা রিঙের ভাঙা মাথাও দেখতে পেল। তারমানে শেকল ছিঁড়ে ছুটে এসেছে কুকুরটা।

উঠে দাঁড়াল সে। বেরিয়ে এল গর্তের বাইরে। খোঁজ করতেই কয়েক গজ দূরে আবিষ্কৃত হলো একটা মাটিতে পোঁতা কাঠের ডাণ্ডা। তাতে পেঁচানো ছেঁড়া শেকলের বাকি অংশ।

বোঝা গেল, ফাঁদের কাছাকাছি বেঁধে রাখা হতো কুকুরটাকে। মুসা ওখানে আসার সামান্য আগে শেকল ছিঁড়েছিল ওটা। ওকে দেখে তাড়া করেছিল।

কিন্তু তেড়ে আসার আগে তো ঘেউ ঘেউ করে কুকুর। এটা করেনি কেন?

জবাবটা সহজ। না করার ট্রেনিং দেয়া হয়েছিল ওটাকে। যাতে লোকের অজান্তে চুপচাপ পিছু নিয়ে অতর্কিতে ঝাঁপিয়ে পড়ে তাদের ওপর। এর কারণও বোঝা যায়। বনের এই অংশে লোকজন আসা বন্ধ রাখতে চায় কেউ।

কেন?

শরীরের প্রতিটি পেশী ব্যথা করছে ওর। গায়ে কাঁটা দিল। মনে হলো, জীবনে কোনদিন স্বাভাবিক হতে পারবে না আর।

চারপাশে তাকিয়ে, মাথাটা পরিষ্কার করার চেষ্টা করতে গিয়ে, হঠাৎ লক্ষ করল গোল একটা জায়গার কিনারে দাঁড়িয়ে আছে। বন কেটে সাফ করে ফেলা হয়েছে জায়গাটার। চাঁদ এখন মাথার ওপরে। উজ্জ্বল আলো ছড়াচ্ছে। এত উজ্জ্বল, জুতোর দাগগুলোও নজর এড়াল না। কয়েক ডজন ছাপ বসে গেছে মাটির ওপরের আলগা বালিতে।

অনেক লোক জমায়েত হয়েছিল এখানে। বেশি আগে নয় সেটা।

আরও নিশ্চিত হলো সে, ফাঁদ আর প্রহরী কুকুরটাকে এখানে রাখা হয়েছিল লোক তাড়ানোর জন্যে। যাতে ভয়ে কেউ আর এদিক না মাড়ায়। কিন্তু আবার সেই প্রশ্ন—কেন?

'কেটে পড়তে হবে এখান থেকে,' শব্দ করে নিজেকে বলল মুসা। গায়ে কাঁটা দিল ওর। ভয় এবং ঠাণ্ডা, দুটোতেই।

বনের কিনারে বাড়িঘর আছে, জানে ও। কিন্তু এখানে দাঁড়িয়ে ওর মনে হতে লাগল, সভ্যতা থেকে বহুশত মাইল দূরে রয়েছে। এই বনকে বিশ্বাস নেই, এখানে যা খুশি ঘটতে পারে। এ যেন এক অন্য দুনিয়া, নিয়ম-নীতিহীন আরেক জগৎ

কি সব আজেবাজে কথা ভাবছে! নিজেকে ধমক লাগাল মুসা।

হানির কথা মনে পড়ল। ওর ফোন পেয়েই ছুটে যাচ্ছিল ওদের বাড়িতে। মাঝপথে এই বিপত্তি।

মনে পড়ল রবিনের কথা। কেইনের পিছু নিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল সে। ফিরে এসেছে কি? ওর বাবা-মা ফিরেছেন? পুলিশ ক্যাপ্টেন ফিল কোহেন ফোন করেছে?

'হানিদের বাড়ি থেকে রবিনকে ফোন করতে হবে,' আবার শব্দ করে বলল মুসা।

হাঁটতে আরম্ভ করল। পা টলমল করছে। ধীরে ধীরে কেটে গেল আড়ষ্ট ভাবটা। আবার সহজভাবে হাঁটতে পারল সে। কিছুদূর এগোতে গাছের ফাঁক-ফোকর দিয়ে হলদে আলো চোখে পড়ল। মিটমিট করছে অনেকটা জোনাকির আলোর মত। গাছের পাতা চোখের সামনে বাধা হয়ে এই কাণ্ড ঘটাচ্ছে।

একটা বাড়ি চোখে পড়ল। দৌড়াতে শুরু করল মুসা। কাঁটাঝোপ, গাছের ডাল, লম্বা ঘাস, শেকড়ে হোঁচট খাওয়া—কোন বাধাকেই পরোয়া করল না আর।

বাড়িটা হানিদের। কয়েক মিনিটের মধ্যেই ওদের পেছনের আঙিনায় এসে দাঁড়াল সে। রহস্যময় সেই গোল জায়গাটা থেকে দূরে নয় এই বাড়ি। হাঁপাতে হাঁপাতে চোখ তুলে তাকাল। হানির বেডরুমের জানালার পর্দায় ম্লান আলো।

জেগে আছে ও? বোঝার উপায় নেই। নিচতলায় হলঘরের জানালায়ও আলো। টিভি স্ক্রীনে ছবির নড়াচড়া চোখে পড়ছে। ছবিগুলো বোঝা যাচ্ছে না, কেবল রঙের পরিবর্তন। জানালার কাছ দিয়ে হেঁটে গেল কেউ। হানির বাবা হবেন।

ছায়ায় গা ঢেকে এগোল মুসা। চলে এল গ্যারেজের কাছে।

টেলিভিশনের সামনে দাঁড়িয়ে আছেন হানির বাবা মিস্টার কোবরান পারকিনস। হাতের একটা ক্যান থেকে চুমুক দিয়ে কিছু খাচ্ছেন। সরে গিয়ে বসে পড়লেন একটা কাউচে।

আবার হানির বেডরুমের দিকে মুখ তুলে তাকাল মুসা।

কাজটা করা কি ঠিক হবে? দোতলায় হানির বেডরুমের জানালার নিচ থেকে নেমে এসেছে কাঠের জাফরি। কাঁটা গোলাপের ঝাড় লাগানো হয়েছিল। ফুলের চিহ্নও নেই, তবে কাঁটালতা পেঁচিয়ে আছে।

জাফরির কাছে এসে ভালমত দেখল সে। শক্তই মনে হলো ভার রাখতে পারবে বোধহয়

কাঁটালতা বাঁচিয়ে শক্ত করে জাফরির কিনার চেপে ধরে নিচের খোপে পা রাখল সে। কাত হয়ে ঘাড় লম্বা করে তাকাল হলঘরের জানালার দিকে হানির বাবা এখনও কাউচেই বসা আছেন কিনা দেখল। আছেন

বেয়ে উঠতে শুরু করল সে। তাড়াহুড়া করল না। একেকবারে একেক খোপ। একটা করে পা তোলে, এক সেকেণ্ড চুপ করে থাকে, দেখে, জাফরি ভেঙে পড়ার সম্ভাবনা আছে কিনা। মৃদু কাঁপে ওটা, তবে ভাঙবে বলে মনে হলো না।

তিন ভাগের এক ভাগ উঠেছে, এই সময় হাত পিছলাল ওর পড়তে শুরু করল।

চোদ্দ

গাড়ির শব্দে ফিরে তাকাল রবিন। হেডলাইটের আলো ছড়িয়ে পড়েছে রাস্তায়। গতি কমিয়ে গাড়িটা চলে যাওয়ার অপেক্ষা করল সে।

কিন্তু গেল না ওটা।

রাতের বেলা এ ভাবে একা বেরোনো উচিত হয়নি ওর। আবার দৌড়াতে শুরু করল সে। গাড়িটাও গতি বাড়াল ওর সঙ্গে সঙ্গে।

হচ্ছেটা কি? ফিরে তাকাল সে। কিন্তু হেডলাইটের উজ্জ্বল চোখ ধাঁধানো হলুদ আলোর ওপাশে পৌছতে পারল না ওর দৃষ্টি।

কি করবে বুঝতে পারল না ও। গাড়িটা ওর পাশ কেটে চলে যায় না কেন? যদি পরিচিত কেউ হয়, তাহলে ধরতে কিংবা কিছু জিজ্ঞেস করতে আসছে না কেন? এ ভাবে পিছু নেয়ার কি মানে?

ঘুরে গাড়িটার দিকে দৌড় দেবে ঠিক করল সে। ওটার পাশ কেটে মোড় নিয়ে চলে যাবে পাশের রাস্তায়। তখন পিছু নিতে হলে পুরোপুরি ঘুরতে হবে গাড়িটাকে। তাতে সময় লাগবে। আশা করা যায় ততক্ষণে লুকিয়ে পড়তে পারবে কোথাও সে।

সুতরাং চরকির মত পাক খেয়ে ঘুরে দাঁড়াল। হাত চোখের ওপর তুলে হেডলাইটের আলো ঠেকাচ্ছে। ঝেড়ে দৌড় দিল গাড়িটার দিকে।

ঘ্যাচ করে ব্রেক কষল গাড়িটা। চিৎকার শোনা গেল, 'রবিন, দাঁড়াও! রবিন!'

চেনা কণ্ঠ।

দাঁড়িয়ে গেল রবিন। ড্রাইভারের আসন থেকে নেমে এল একজন লোক।

বড় নীল ক্যাপরিস গাড়িটা চিনতে পারল রবিন। নেমে আসা লোকটা ক্যাপ্টেন কোহেন।

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল সে। প্রায় চিৎকার করে বলল, 'ক্যাপ্টেন! আপনি?'

'তোমাকে ঠিক চিনতে পারছিলাম না,' বুটের মচমচ শব্দ তুলে রবিনের পাশে এসে দাঁড়াল ক্যাপ্টেন। 'তোমাদের বাড়ি যাচ্ছিলাম।'

'বাবা-মার কোন খোঁজ পেয়েছেন?'

কোহেনের গভীর নীল চোখে রাস্তার আলো প্রতিফলিত হলো। খুব ক্লান্ত লাগছে ওকে। মাথা নাড়ল। 'না। তুমি কিছু জেনেছ?'

'না,' জোরে নিঃশ্বাস ফেলল রবিন।

'মন খারাপ কোরো না,' দস্তানা পরা একটা হাত রাখল কোহেন রবিনের কাঁধে। 'খোঁজ পাইনি বটে, কিন্তু এখনও কোন খারাপ খবরও পাইনি আমরা, তাই না?'

'হ্যাঁ,' বিড়বিড় করল রবিন। 'তবে ভাল খবরও পাইনি।'

গাড়ির দিকে ওকে নিয়ে গেল কোহেন। 'কুচিন্তা এনো না মনে। ভালটাই ভাবো শুধু। লোক লাগিয়ে দিয়েছি। শীগগিরই খুঁজে বের করবে তোমার মা-বাবাকে।'

কিছু বলল না রবিন। হতাশা লুকাতে পারল না।

'তাঁদের একটা ফটো দরকার,' কোহেন বলল। 'কপি করে আশেপাশের সব শহরের পুলিশকে পাঠিয়ে দেব। আর কিছু জেনেছ? নতুন কোন সূত্র, যেটা পুলিশের কাজে লাগতে পারে?' লোকটা এত লম্বা, রবিনের সঙ্গে কথা বলার সময় নিচের দিকে ঘাড় বাঁকা করে রাখতে হচ্ছে।

'বুঝতে পারছি না...কি বলব...'

'চলো, বাড়ি পৌঁছে দিই তোমাকে। ছবিটাও দরকার। গাড়িতে বসে ভাবতে থাকো। কিছু মনে পড়লে বলবে। অনেক লোক লাগিয়েছি। খবরের কাগজগুলোকেও খবর দিয়েছি। দক্ষ রিপোর্টাররা খবর জোগাড়ে পুলিশকেও ছাড়িয়ে যায়। অনেক সময় নিজের জীবনের পরোয়া না করে বিপদে ঝাঁপ দেয়।'

এ সব কথা জানা আছে রবিনের। ওর বাবা খবরের কাগজের লোক।

গাড়ির দরজা খুলে ধরল কোহেন। উঠে বসল রবিন। পুলিশের গাড়ি ওর অচেনা নয়। একবার দেখেই বুঝতে পারল এটা সরকারি গাড়ি নয়। তবে সাধারণ প্রাইভেট কারের চেয়ে কিছু বেশি, বাড়তি যন্ত্রপাতি বসানো আছে। হঠাৎ করে সচল হলো রেডিও। খড়খড় কড়কড় করল কয়েক সেকেণ্ড। তারপর একটা সংক্ষিপ্ত মেসেজ দিল। রেডিওটা পুলিশের।

বাড়ি ফেরার পথে ক্যাপ্টেনকে কেইনের কথা বলল রবিন। পিস্তল, ধূসর ভ্যান আর ওটার চালক রস ডুগানের কথা বলল। আশা করল, কোন মন্তব্য করবে ক্যাপ্টেন। কিন্তু একটা কথাও বলল না। সোজা তাকিয়ে আছে সামনের দিকে।

'আপনার কি মনে হয় কেইন কিছু জানে?' জিজ্ঞেস করল রবিন।

'জানতে পারে। ওর ব্যাপারে খোঁজ নিতে হবে। আরেকজনের কি নাম যেন বললে?'

'কেইন ওকে ডক্টর রস ডুগান বলে পরিচয় করিয়ে দিয়েছে।'

'ওর খোঁজও নেব। আর কিছু? আর কোন কথা মনে করতে পারছ?'

গেটের ভেতর ঢুকল গাড়ি। বাড়িটা অন্ধকার। বারান্দার আলো জ্বালেনি মুসা।

'না, আর কিছু মনে পড়ছে না।' দরজা খুলে বেরোতে গিয়েও থেমে গেল রবিন। 'ও হ্যাঁ, একটা কথা।'

ফিরে তাকাল কোহেন। 'কি?'

'একটা অদ্ভুত জিনিস পেয়েছি মা'র ঘরে। হাতির দাঁতে তৈরি একটা ছোট বানরের খুলি। চোখের জায়গায় স্ফটিক বসানো। এটা কি কোন সূত্র?'

এবারেও কোন ভাবান্তর হলো না কোহেনের। শান্তকণ্ঠে জবাব দিল, 'হতে পারে। ল্যাবরেটরিতে পরীক্ষা করালে বোঝা যাবে।'

ঘরে ঢুকল রবিন। মুসাকে দেখল না। ওপরে উঠে অ্যালবাম ঘেঁটে বাবা-মায়ের একটা যুগল ফটো বের করল। তারপর খুলিটা খুঁজল। পেল না। মুসাকে জিজ্ঞেস করতে হবে, কোথায় রেখেছে।

বাইরে বেরিয়ে ছবিটা দিল ক্যাপ্টেনকে। বাড়িতে পৌঁছে দেয়ার জন্যে ধন্যবাদ দিল।

'মন খারাপ করে থেকো না,' সহানুভূতির সুরে বলল কোহেন। 'উপদেশ দেয়া সহজ···তবু বলছি···পারলে গিয়ে খানিক ঘুমিয়ে নাও। উপকার হবে।'

'চেষ্টা করব।'

'কিছু জানার সঙ্গে সঙ্গে জানাব তোমাকে। আমার নম্বরও তোমার কাছে আছে। কথা বলতে ইচ্ছে করলে রিঙ কোরো আমাকে। দিনে, রাতে, যে কোন সময়। নির্দ্বিধায়।'

'থ্যাংকস। শুনে ভাল লাগছে।'

'আমারও লাগছে,' পুরু গোঁফের নিচে সূক্ষ্ম হাসি ফুটল কোহেনের। গাড়িতে গিয়ে উঠল।

ঘরে ফিরে এল রবিন। দরজাটা লাগিয়ে দিল। তালা লাগল। ডাক দিল, 'মুসা, মুসা, কোথায় তুমি?'

জবাব নেই।

আরও জোরে চিৎকার করে ডাকল সে, 'মুসা! অ্যাই, মুসা!'

জবাব নেই এবারেও।

লিভিং রুমে খুঁজল সে। হলঘরে দেখল। তারপর রওনা হলো দোতলায়।

কিন্তু কোথাও পাওয়া গেল না ওকে। বাড়িতে নেই।

লিভিং রুমে ফিরে এল সে। প্রথমে বাবা-মা নিরুদ্দেশ। এখন মুসা গায়েব। হচ্ছেটা কি!

কোন কারণে বাইরে বেরোল নাকি? মেসেজ রেখে গেছে?

দৌড়ে রান্নাঘরে ঢুকল সে। ফোনের পাশের প্যাডটাতে দেখল। কিছু লেখা নেই। রেফ্রিজারেটরের ওপরে দেখল। নেই। আরও নানা জায়গায় খুঁজল, যেখানে মেসেজ রেখে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে। পেল না কোথাও।

কিন্তু এ ভাবে গায়েব হয়ে যাওয়ার তো কথা নয়! জরুরী কারণে বাইরে বেরোলে অবশ্যই মেসেজ রেখে যাবে। বাতাসে উড়ে গিয়ে পড়ে যায়নি তো? ভাবতে ভাবতে টেবিলটার নিচে উঁকি দিল।

দেখতে পেল কাগজের টুকরোটা। একধারে একেবারে দেয়ালের কাছে চলে গেছে। টেবিলের নিচে ঢুকে বের করে আনল ওটা।

নাহ্! সাধারণ কাগজ। দু'তিনটে হিসেব লেখা।

আবার এসে লিভিং রুমে বসে পড়ল সে। সময় কাটতে চাইছে না। ভীষণ

দুশ্চিন্তা হচ্ছে ওর।

বই পড়ার চেষ্টা করল। টেলিভিশন-অন করল। কোন কিছুতে মন বসাতে পারল না।

এগারোটা বাজার পর আর চুপ করে বসে থাকতে পারল না। একটা কিছু করা দরকার। মনে হচ্ছে মুসাও নিখোঁজ হয়েছে।

কিন্তু কি করবে? পুলিশকে ফোন করবে? হ্যাঁ, তাই করা উচিত।

ফিল কোহেনকে ফোন করতে ছুটল সে। রিসিভার তুলে কানে ঠেকিয়েই বিকৃত হয়ে গেল চেহারা। আছাড় দিয়ে নামিয়ে রাখল ক্রেডলে। আবার ডেড!

বিড়বিড় করতে করতে ফিরে এল লিভিং রুমে। পায়চারি শুরু করল। এই সময় মনে পড়ল কথাটা।

পিস্তল!

ভুলে গিয়েছিল কেইনের পিস্তলের কথাটা! লুকিয়ে ফেলতে হবে। একটা কাজ পেয়ে গিয়ে অনেকটা স্বস্তি বোধ করল। রওনা হলো সিঁড়ির দিকে।

প্রায় দৌড়ে উঠে এল সিঁড়ির মাথায়। চিলেকোঠার দরজার সামনে থামল। কেইন কি ফিরেছে? সিঁড়িতে ওঠার শব্দ শোনেনি। তবে তাতে নিশ্চিত করে বলা যায় না ও ফিরেছে কিনা। অনেক সময় এত নিঃশব্দে উঠে যায় সে, কিচ্ছু শোনা যায় না। ডেকে জিজ্ঞেস করল, 'কেইন, আছো?'

জবাব নেই।

আবার ডাক দিল।

এবারও সাড়া এল না।

ঠেলা দিয়ে দরজা খুলে ভেতরে ঢুকে পড়ল সে।

অন্ধকার। হাতড়ে হাতড়ে সুইচবোর্ড খুঁজে বের করে আলো জ্বেলে দিল। আগের মতই আছে ঘরটা। ব্যতিক্রম কেবল বিছানার ওপর একটা শার্ট আর প্যান্ট ফেলে রেখেছে কেইন।

নিচু হয়ে ডেস্কের শেষ ড্রয়ারটা টেনে খুলল রবিন।

মড়মড় শব্দ হলো। পায়ের আওয়াজ? কেইন কি ফিরে এল?

কান পেতে রইল রবিন। আবার মড়মড়। কিন্তু সিঁড়ি বেয়ে উঠে এল না কেউ। হতচ্ছাড়া এই পুরানো বাড়িটাই শব্দ করছে!

বাইরের দিকে কান খাড়া রেখে ড্রয়ারের আণ্ডারওয়্যারগুলো সরাতে শুরু করল সে। হাত ঢুকিয়ে দিল ভেতরের দিকে।

হাতে লাগল না কিছু।

আরও কিছু কাপড় সরিয়ে ভাল করে তাকাল।

অস্ফুট একটা শব্দ বেরোল মুখ থেকে। কুঁচকে গেল ভুরু।

পিস্তলটা নেই!

পনেরো

কিছু একটা ধরার জন্যে মরিয়া হয়ে থাবা মারল মুসা। হাতে লাগল কাঁটালতা।

তাই চেপে ধরল। বাঁ হাতের তালু কেটে, চিরে রক্তাক্ত করে দিল ধারাল কাঁটা। কিন্তু পতন ঠেকাতে পারল না।

চিৎকার করারও সময় নেই। চিত হয়ে মাটিতে পড়ল সে। এত জোরে লেগেছে পিঠে, মনে হলো দম বেরিয়ে গেছে সব, মারা যাচ্ছে। ভীষণ কষ্ট। শ্বাস নিতে পারছে না। আর কোনদিন নিতে পারবে বলেও মনে হলো না। এখনই হয়তো চোখের সামনে অন্ধকার হয়ে আসবে সব কিছু, বেরিয়ে যাবে প্রাণ। কিন্তু অন্ধকারের পরিবর্তে চোখের সামনে দেখা দিল লাল আলো, তারপর হলুদ। চোখ ধাঁধানো হলুদ।

কতক্ষণ ওভাবে পড়ে রইল বলতে পারবে না। হয়তো অনেক সময়। আস্তে আস্তে মলিন হয়ে এল উজ্জ্বল আলো। শ্বাস নিতে পারছে আবার।

ব্যথা টের পেল এতক্ষণে। বাঁ হাতে যন্ত্রণা। উঁচু করে ধরল হাতটা। কি হয়েছে দেখার জন্যে নিয়ে এল মুখের কাছে। তালুর মাঝখানে দুটো গভীর কাটা। রক্ত বেরোচ্ছে।

জাফরির ওপর দিকে তাকাল। হানির রুমে এখনও আলো জ্বলছে। আবার ওঠার সিদ্ধান্ত নিল সে। ভেতরে ঢুকতে পারলে জখমটা বাঁধার জন্যে কিছু না কিছু পাবেই। ক্ষতে লাগানোর মলমও মিলতে পারে।

আবার জাফরি বেয়ে উঠতে শুরু করল সে। তবে এবার আগের চেয়ে অনেক সাবধানে। সামান্যতম তাড়াহুড়ো করল না আর। মাঝামাঝি জায়গায় উঠে আসতেই আত্মবিশ্বাস বেড়ে গেল। মনে হলো, আর পড়বে না।

জানালাটা জাফরির মাথা থেকে ফুটখানেক ওপরে। পাল্লা লাগানো। ভেতর থেকে ছিটকানি আটকানো কিনা কে জানে। কাঁচে টোকা দিল সে। হানি শুনতে পেলে এসে খুলে দেবে।

মড়মড় করে উঠল জাফরি। ভয় পেয়ে গেল মুসা। ভেঙে পড়বে না তো?

খুলছে না কেন? হানি কোথায়?

আবার টোকা দিল মুসা। এবার আরেকটু জোরে।

কিন্তু জবাব নেই।

সামনে ঝুঁকে জোরে ঠেলা দিল পাল্লায়। চাপ দিয়ে খোলার চেষ্টা চালাল।

লাভ হলো না। আবার মড়মড় করে উঠল জাফরি। ভাল বেকায়দায় পড়েছে। জানালা খুলছে না। ঘরে ঢুকতে পারছে না। এদিকে ধসে পড়ার হুমকি দিচ্ছে জাফরি।

লম্বা দম নিল সে। একহাতে জানালার ফ্রেম ধরে আরেক হাত দিয়ে জোরে ঠেলতে শুরু করল। কয়েক ইঞ্চি ফাঁক হলো পাল্লা। বাঁচা গেল! ছিটকানি লাগানো নয়।

এরপর আর তেমন অসুবিধে হলো না। কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই হানির বেডরুমে ঢুকে পড়ল সে। জাফরিটাও ধসে পড়ল না। পড়লে শব্দ হতো। ছুটে আসতেন হানির বাবা।

'হানি?' ফিসফিস করে ডাকল মুসা।

ঘরের চারপাশে তাকাল। ড্রেসারের ওপর রাখা একটা ল্যাম্প জ্বলছে। অল্প

পাওয়ারের বাল্ব। মৃদু আলো। হানিকে দেখা গেল না।

বিছানাটা পাতা। পুতুল সংগ্রহের শখ আছে হানির। ছোটবড় নানা রকমের পুতুল সাজিয়ে রেখেছে দেয়ালে বসানো তাকে। ডেস্ক চেয়ারের হেলানে ঝোলানো ওর ব্যাকপ্যাক। ডেস্কটা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। এককোণে কিছু কাগজ পেপারওয়েট চাপা দেয়া। কয়েকটা পেন্সিল রাখা কাগজের কিনারে। কার্পেটটা মনে হলো সেদিনই ভ্যাকুয়াম ক্লিনার দিয়ে পরিষ্কার করা হয়েছে।

পা টিপে টিপে আলমারিটার কাছে এসে দাঁড়াল সে। অসংখ্য ছবি টেপ দিয়ে আটকানো ওটার দরজার নিচ থেকে ওপর পর্যন্ত। তার মধ্যে হানির বাবা-মায়ের ছবিও আছে। মা থাকেন ডেট্রয়েটে। আরও অনেকের ছবি আছে, যেগুলো চিনতে পারল না সে। সিনেমার প্রিয় হিরো আর পপ সঙ্গীত গায়কের ছবি আছে, ম্যাগাজিন থেকে কেটে নিয়ে লাগিয়েছে।

ওপর দিকে তাকাতে গিয়ে হঠাৎ মাথা বোঁ করে উঠল ওর। তাড়াতাড়ি এসে বিছানার কিনারে বসে পড়ল। সতর্ক রইল হাতের রক্ত যাতে বিছানার চাদরে না লাগে।

হানি কোথায়? না-ই যদি থাকে, ঘরে আলো জ্বলছে কেন?

অন্য কোন ঘরে গেছে হয়তো। ডাকতে যাওয়াটা ঠিক হবে না। ওর বাবার চোখে পড়ে যেতে পারে।

কিন্তু কতক্ষণ বসে থাকবে এ ভাবে? তা ছাড়া হাতের কাটাগুলোরও ব্যবস্থা করা দরকার। রক্ত বন্ধ হচ্ছে না।

উঠে ড্রেসারের দিকে এগোল সে। একটা ড্রয়ার খুলল। আণ্ডারওয়্যার, মোজা আর মেয়েলী জিনিসে ঠাসা। লম্বা একটা উলের মোজা টেনে বের করে সেটা পেঁচিয়ে নিল হাতে। হানি নিশ্চয় কিছু মনে করবে না।

কিন্তু আসছে না কেন এখনও?

ফোন করার সময় খুব ভীত মনে হয়েছিল ওকে। কেন? কিসের ভয়? গেল কোথায়? নিচতলায় বাবার সঙ্গে বসে যে টিভি দেখছে না, তাতে কোন সন্দেহ নেই।

আবার আলমারির সামনে এসে দাঁড়াল মুসা। টান দিয়ে দরজাটা খুলল। হানির গোছানো স্বভাবের প্রমাণ মিলল এখানেও। কোন অল্পবয়েসী মেয়ের এত সুন্দর গোছগাছ করা আলমারি আর দেখেনি সে। প্রতিটি কাপড় জায়গামত ঝোলানো। একটু এদিক ওদিক নেই। সোয়েটারগুলো সব ভাঁজ করে রাখা ওপরের তাকে। এত গোছানোর সময় পায় কোথায় হানি, ভেবে অবাক হলো সে।

দরজা বন্ধ করে দিয়ে বিছানার দিকে ঘুরতেই একটা চকচকে জিনিস দৃষ্টি আকর্ষণ করল ওর। বিছানার পায়ের কাছে পড়ে আছে।

জুতোর ডগা দিয়ে বিছানার নিচ থেকে ওটা ঠেলে সরিয়ে আনল বাইরে। নিচু হয়ে তুলে নিল। নিয়ে এল ড্রেসারের ল্যাম্পের কাছে।

নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছে না। হাতির দাঁত খোদাই করে তৈরি বানরের খুলি।

রবিনের মায়ের বিছানায় যেটা পাওয়া গেছে, কুকুরটার গলায় যেটা দেখেছে,

সেই একই জিনিস। স্ফটিকের চোখ দুটোতে আলো পড়ে ঝিলিক দিচ্ছে। দাঁত বের করা বিকট হাসি।

আসলে কি এটা? যেখানেই যাচ্ছে এই জিনিস দেখতে পাচ্ছে কেন?

ভয়ঙ্কর ভাবনাটা মাথায় খেলে যেতেই শিউরে উঠল সে। ওই একটা খুলিই নয়তো, রবিনদের বাড়িতে যেটা পাওয়া গেছে? কোন অলৌকিক শক্তিতে ভর করে পিছু নিয়েছে ওর? যেখানেই যাচ্ছে সে, অনুসরণ করে বেড়াচ্ছে?

আর কিছু ভাবার সময় পেল না সে। বাইরে ভারি পায়ের শব্দ শোনা গেল। এগিয়ে আসছে দ্রুত।

খুলিটা জিনসের পকেটে ভরে ফেলল সে। লুকানোর জায়গা খুঁজল। কোন জায়গা দেখতে পেল না।

বেডরুমের বাইরে এসে থামল পদশব্দ।

ঝটকা দিয়ে খুলে গেল দরজা। দাঁড়িয়ে আছেন হানির বাবা। হাতে উদ্যত পিস্তল।

ষোলো

'তুমি!' কঠোর দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন মিস্টার পারকিনস। 'আমি তো ভেবেছিলাম চোর!'

'না, চুরি করতে ঢু-ঢুকিনি...'

বিশাল শরীর মিস্টার পারকিনসের। এতটাই বড়, পুরো দরজাটা জুড়ে আছেন। ধূসর আর সাদায় মেশানো রানিং সুট পরেছেন। সম্ভবত সবচেয়ে বড় সাইজ, এর চেয়ে বড় আর বানায় না কোন কোম্পানি। হানির মত কালো চুল, তবে পাতলা, কপালের কাছ থেকে অনেকটা ওপরে সরে গেছে। বেরিয়ে পড়েছে বিরাট কপাল। তাতে ছোটখাটো ঝোপের মত একজোড়া ভুরু। পেশীবহুল দেহ। হাতের পেশী ঠেলে আছে মুষ্ঠিযোদ্ধাদের মত।

তাঁর চোখের রাগ ক্রমে দ্বিধায় পরিণত হলো। এগিয়ে এলেন এক পা।

মুসার মনে হলো, ঘুসি মেরে বসবেন।

কিন্তু তার মুখের দিকে নয়, হাতের মোজাটার দিকে তাকিয়ে আছেন তিনি। রক্ত লেগে গেছে কয়েক জায়গায়।

পিস্তল নামালেন। ঝোপের মত ভুরু নাচিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'এখানে ঢুকেছ কেন?'

'আমি...' বলতে গিয়ে আবার থেমে গেল মুসা। কথা খুঁজে পাচ্ছে না। 'হানির সঙ্গে কথা বলতে এসেছিলাম...'

'হাতে কি হয়েছে?' এমনিতেই খুব ভারি গলা তাঁর। গমগম করে ওঠে। রেগে গেলে তো মনে হয় কামান দাগার শব্দ। এখন কণ্ঠস্বর নামিয়ে রেখেছেন। তা-ও বিকট শব্দ।

মোজা পেঁচানো হাতটা তুলল মুসা, 'কেটে গেছে।'

'হানির সঙ্গে কথা বলতে এসেছিলে, না?' বিছানায় বসে পড়লেন মিস্টার

পারকিনস। তাঁর ওজনে প্রায় পুরোটাই দেবে গেল গদি। পিস্তলটা নামিয়ে রাখলেন একপাশে।

'হ্যাঁ। আমাকে ফোন করেছিল···'

নড়ে বসলেন তিনি। দেবে গেল আরেক পাশ। 'কোন কারণে ও নার্ভাস হয়ে গিয়েছিল,' ছাদের দিকে তাকালেন তিনি। আবার চোখ নামালেন মুসার দিকে। 'কারণটা জানো নাকি?'

মাথা নাড়ল মুসা, 'জানতেই এসেছিলাম।'

'তুমি কিছু করোনি তো?'

'আমি কি করব!'

'প্রেমটেম?'

লজ্জা পেল মুসা। মাথা নাড়ল নীরবে। বড়দের সঙ্গে এ সব আলোচনা করতে অস্বস্তি বোধ করে সে। তা ছাড়া এই ব্যাপারটা তার পছন্দও না। স্কুলে তার বয়েসী কত ছেলেমেয়ে ডেটিঙে যায়, তার চেয়ে ছোটরাও যায়, কিন্তু সে যায়নি কখনও। ভাল লাগে না।

'তাহলে এ ভাবে চুরি করে ঢুকলে কেন?'

'মনে হলো হানি বিপদে পড়েছে। ওকে সাহায্য করতে।'

'কোন দিক দিয়ে ঢুকেছ?'

খোলা জানালাটার দিকে তাকাল মুসা। 'জাফরি বেয়ে।'

দীর্ঘ একটা মুহূর্ত মুসার দিকে তাকিয়ে রইলেন মিস্টার পারকিনস। বিশ্বাস করবেন কিনা বুঝতে চাইছেন যেন। 'শুধু বিপদে পড়েছে বলেই ওকে সাহায্য করার জন্যে এতবড় ঝুঁকি নিয়েছ?'

'বন্ধুর জন্যে এর চেয়ে বড় ঝুঁকি নেয় মানুষ।···এ ভাবে ঢোকা উচিত হয়নি আমার, সরি···হানি কোথায়?' হাতের মোজাটা আরও শক্ত করে পেঁচাতে লাগল মুসা। ব্যথা করছে।

'খালার বাড়ি গেছে। কোন কারণে ভয় পেয়েছিল। আমাকে বলল এখানে থাকতে ভাল লাগছে না। পাঠিয়ে দিলাম।'

চেয়ারের হেলানে ঝোলানো ব্যাকপ্যাকটার ওপর চোখ পড়ল মুসার, 'ব্যাগ নিল না কেন?'

'মনে ছিল না হয়তো। খুব নার্ভাস ছিল, বললামই তো।' উঠে এসে বিশাল একটা থাবা মুসার কাঁধে ফেললেন তিনি। 'দেখি হাতটা?'

হানির বাবা ডাক্তার, মুসা জানে। দেখালে হয়তো ব্যাণ্ডেজ করে দেবেন। কিন্তু দেখাতে চাইল না ও। 'না, থাক, লাগবে না। ততটা লাগেনি। বাড়ি গিয়ে ব্যাণ্ডেজ বেঁধে নেব, তাহলেই হবে।' হানি নেই। এখানে থাকার আর কোন মানে হয় না। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এখন'এখান থেকে বেরিয়ে যাওয়াটাই বরং স্বস্তির।

হানির বাবার মেজাজ বোধহয় ভাল। এখনও রেগে যাননি তাই। কিংবা বাড়িতে ঢুকেছে বলে ভদ্রতা করে অপমান করেননি। রাস্তায় হানির সঙ্গে ওকে দেখে সেদিন যে রকম রেগেছিলেন, আজ সে রকম কিছুই করছেন না।

খোলা জানালাটার দিকে তাকালেন আবার তিনি। তারপর মুসার দিকে

ফিরলেন। 'এসো আমার সঙ্গে।'

'কো-কোথায়?'

'বেরোবে না? নাকি আবার জাফরি বেয়ে নামার ইচ্ছে?'

'না না…'

'তাহলে এসো।'

মুসার কাঁধ চেপে ধরে ওকে ঠেলে বের করে নিয়ে এলেন মিস্টার পারকিনস। সিঁড়ির কাছে এনে ছেড়ে দিলেন। 'এখনও বলো, ধুয়ে ব্যাণ্ডেজ করে দিই।'

'লাগবে না। থ্যাংক ইউ।'

'আর কখনও এ ভাবে হানির ঘরে ঢোকার চেষ্টা কোরো না,' গম্ভীর গলায় বললেন তিনি।

'আচ্ছা,' কোনমতে বলে তরতর করে সিঁড়ি বেয়ে নেমে এল মুসা। সোজা রওনা হলো সদর দরজার দিকে।

বাইরে বেরিয়ে ড্রাইভওয়েতে নামল। ব্যথা করছে হাতটা। বারান্দার আলোয় দেখল। রক্তে ভিজে গেছে সাদা মোজা।

গেটের দিকে এগোল সে। যত শর্টকাটই হোক, কোন কিছুর বিনিময়েই আর এখন বনে ঢুকবে না।

সতেরো

পরদিন বৃহস্পতিবার। চোখের পলকে কেটে গেল দিনটা। নাস্তার পর জোর করে রবিনকে ধরে রকি বীচে নিয়ে এল মুসা। কিশোরের সঙ্গে দেখা করল।

জ্বর কমেছে কিশোরের। প্রচণ্ড ঠাণ্ডা লাগিয়েছিল বুকে। প্রায় নিউমোনিয়া বাধিয়ে ফেলেছিল। ডাক্তার বলে দিয়েছেন, কম পক্ষে সাতদিন ঘর থেকে বেরোতে পারবে না। আর মেরিচাচী ঘোষণা করে দিয়েছেন, সাতদিন বিছানা থেকেই নামতে পারবে না। পায়খানা-প্রস্রাবও বেডপ্যানে সারতে হবে।

কি আর করে বেচারা কিশোর। সারাক্ষণ শুয়েই থাকে।

দুই বন্ধুকে দেখে হাসিতে উজ্জ্বল হলো ওর মুখ।

'কেমন আছো?' জিজ্ঞেস করল মুসা।

'বিছানায় শুয়ে কি আর ভাল থাকা যায় নাকি?' রবিনের দিকে তাকাল। 'তোমার কি খবর? আংকেলরা ফিরেছেন?'

যা যা ঘটেছে, জানাল ওকে রবিন আর মুসা।

চুপচাপ শুনল কিশোর। মাঝে মাঝে চিমটি কাটল নিচের ঠোঁটে। আনমনে বিড়বিড় করল, 'বন্ধু খুঁজে বের করা উচিত!'

'কি বললে?' মুসার প্রশ্ন।

'বন্ধু,' রহস্যময় কণ্ঠে বলে রবিনের দিকে ফিরল কিশোর। 'আংকেলের এমন কোন বন্ধু আছেন, তাঁর নতুন চাকরিটার খবর জানেন?'

'গুন!' বলে উঠল রবিন।

'গুন?'

'গুন,' পুরো নামটা মনে করার আপ্রাণ চেষ্টা করল রবিন। 'গুন প্রাগ! বাবার খুব ঘনিষ্ঠ বন্ধু। তিনি জানতে পারেন।'

'কোথায় থাকেন?'

'তা তো জানি না। ফোন বুক দেখে বের করতে হবে।'

'করো। আংকেলরা ওয়াগনার করপোরেশনে চাকরি নিয়েছেন কিনা জানা গেলে একটা বড় সূত্র পাওয়া যাবে আশা করি।'

'সেটা কি?' জানতে চাইল মুসা।

'ওয়াগনার করপোরেশনের কেউ একজন মিথ্যে কথা বলেছে।'

'কে?'

'এখনও শিওর না। রবিন, গুন কোথায় থাকেন খোঁজ নাও আগে। তাঁর সঙ্গে দেখা করো। পারলে আজই।'

'এখনই বেরোব?'

'এখন বেরোবে কি?' দরজার কাছ থেকে বললেন মেরিচাচী। রবিনের বাবা-মা নিখোঁজ হওয়ার কথা তিনিও জেনেছেন, কিশোরের কাছে। 'দুপুরে খেয়ে যাবে। আপাতত নাস্তা সেরে নাও।'

খাবারের প্লেট সাজানো একটা ট্রে বিছানার ওপর নামিয়ে দিয়ে চলে গেলেন চাচী।

খাওয়ার পর মুসা বলল, 'তোমরা কথা বলো। আমি চট করে একবার বাড়ি থেকে ঘুরে আসি।'

বেরিয়ে গেল সে। দুপুরের খাওয়ার আগেই ফিরে এল।

বিকেলে ব্ল্যাক ফরেস্টে ফিরে চলল রবিনকে নিয়ে।

কিশোরদের বাড়িতে ফোন বুক ঘেঁটে নামটা বের করতে পারেনি রবিন। অতএব গুনের ঠিকানাও জোগাড় হয়নি।

ব্ল্যাক ফরেস্টে যখন ঢুকল ওরা, সন্ধ্যা হয়ে এসেছে।

বাড়ি ফিরে দৌড়ে বাবার স্টাডিতে ঢুকল রবিন। ড্রয়ার খুঁজে বাবার ছোট ফোন বুকটা বের করল। পাতা ওল্টাতেই পেয়ে গেল নামটা—গুন প্রাগ। চিৎকার করে উঠল, 'মুসা, পেয়েছি!'

'কোথায় থাকেন?'

মুখ কালো হয়ে গেল রবিনের। 'শুধু ফোন নম্বর। ঠিকানা নেই।'

'দাঁড়াও, বের করছি,' বলে দৌড় দিল মুসা। রান্নাঘরে এসে ফোনটা তুলে নিল। এক সেকেণ্ড রিসিভারটা কানে চেপে ধরে রেখেই আছাড় দিয়ে নামিয়ে রাখল। 'ধূর! ডেড!'

ক্রেডলে ঠিকমত বসেনি রিসিভার। গড়িয়ে পড়ে গেল টেবিলে। রাগ করে তুলল না মুসা। ও ভাবেই পড়ে রইল ওটা।

'আচ্ছা, এরিয়া ফোন বুকে দেখলে কেমন হয়? ওখানে থাকতে পারে ঠিকানা।'

'যদি আনলিস্টেড নম্বর না হয়।'

'দাঁড়াও, দেখি,' তাক থেকে বড় ফোন ডিরেক্টরিটা নামাল রবিন। টেবিলে

রেখে পাতা ওল্টাতে শুরু করল। গুন প্রাগ পাওয়া গেল না, পাওয়া গেল গুনজালেস প্রাগ। তবে ফোন নম্বর মিলে গেল। তিনি থাকেন বার্নগেট টাউনে। থার্ড জুন স্ট্রীটের ১৮ নম্বর বাড়িতে।

'নম্বর যখন মিলেছে, ইনিই। গুনজালেসকেই হয়তো সংক্ষেপে গুন ডাকা হয়।'

'তা তো বুঝলাম। কিন্তু বার্নগেট টাউনটা কোথায়? নামও শুনিনি।'

'তা-ও বের করছি।'

ফোন বুকের শুরুতে কয়েকটা পৃষ্ঠায় ম্যাপ আছে। এরিয়া ম্যাপটা বের করল রবিন। তাতে পাওয়া গেল বার্নগেট টাউনের নাম। ব্ল্যাক ফরেস্টের দুটো শহর পরে।

উঠে দাঁড়াল মুসা। 'চলো, বেরোই।'

পঁয়তিরিশ মিনিট পর বার্নগেট টাউনে ঢুকল ওরা। পাহাড়ের গোড়ায় সারি সারি বাড়িগুলো গোধূলির কালচে আলোয় কেমন একঘেয়ে বিষণ্ণতায় যেন চুপ করে আছে। গাড়ি চালাতে চালাতে রাস্তার নাম আর নম্বর দেখতে শুরু করল মুসা। রবিনও দেখছে।

রাস্তাটা পেতে দেরি হলো না।

'ডানে ঘোরো,' বলল রবিন।

রাস্তার শেষ মাথায় ব্লকের কোণে পাওয়া গেল মিস্টার প্রাগের বাড়ি। ড্রাইভওয়েতে দাঁড়িয়ে আছে একটা ফোর্ড গাড়ি। বাড়ির সামনের দরজায় এসে দাঁড়াতেই হলঘর থেকে টেলিভিশনের শব্দ ভেসে এল। বেল বাজাল রবিন।

খুলে দিলেন একজন হাসিখুশি লোক। কালো গোঁফ। মাথার চুল পাতলা। চাঁদির কাছে টাক। রবিনকে দেখে অবাক হলেন। 'রবিন! তুমি? কি ব্যাপার? এসো, এসো। তোমার বাবা কেমন আছে?'

'সেই খোঁজ নিতেই তো এলাম।'

'মানে? এসো, ভেতরে।'

রবিন আর মুসা বসার পর জিজ্ঞেস করলেন গুন, 'কি হয়েছে, বলো তো?'

রবিন কিছু বলার আগেই চায়ের ট্রে নিয়ে ঢুকলেন রোগা-পাতলা একজন মহিলা। হেসে পরিচয় করিয়ে দিলেন গুন, 'তোমার আন্টি। কোরা, ও রবিন।'

'রজারের ছেলে?'

'হ্যাঁ।'

'হঠাৎ কি মনে করে? বসো। আমি আরও চা নিয়ে আসছি।'

চলে গেলেন মিসেস প্রাগ।

কদিন ধরে বাবা-মা বাড়ি আসছে না, কোন খোঁজও নেই, জানাল রবিন।

অবাক হলেন গুন। জিজ্ঞেস করলেন, 'অফিসে খোঁজ নিয়েছ?'

'কোন্ অফিস?'

'নতুন চাকরিটা যেখানে নিয়েছে। মর্নিং স্টার।'

চট করে মুসার দিকে তাকাল রবিন। আবার ফিরল গুনের দিকে, 'তারমানে ওয়াগনার করপোরেশনেই চাকরি করে?'

'কেন, সন্দেহ আছে নাকি তোমার?'

'না, ওখানে খুঁজতে গিয়েছিলাম। ওরা মানা করল। বলল ওখানে নাকি চাকরি করে না...'

'ভুল করেছে। এত বড় প্রতিষ্ঠান, ভুল হতেই পারে। ভালমত আবার খোঁজ নাওগে। কিন্তু কথা হলো এতদিন ধরে গায়েব হয়ে রইল কোথায়? খবর না দিয়ে? চিন্তার ব্যাপার! পুলিশকে জানিয়েছ?'

মাথা ঝাঁকাল রবিন।

আরও দু'চার কথার পর, চা খেয়ে বেরিয়ে এল রবিন আর মুসা।

গাড়িতে উঠেই মুসা বলল, 'তারমানে মিথ্যে বলেননি আংকেল। ওয়াগনার করপোরেশনেই চাকরি নিয়েছেন। আর বলবেনই বা কেন?'

'কিন্তু মিথ্যে তো একজন বলেছে আমাদের কাছে!'

'কে, বলো তো? রিসেপশনিস্ট?' স্টার্ট দিল মুসা।

'না। মিথ্যে বলেছে, আমার ধারণা, সেই বিগ বস—প্রিক জেরিমোর।'

'কেন বলবে?'

মোড় ঘুরে বড় রাস্তায় নামল গাড়ি।

'বুঝতে পারছি না। পুলিশের সাহায্য নিতে হবে,' উত্তেজিত হয়ে পড়েছে রবিন। 'ব্ল্যাক ফরেস্টে গিয়ে আগে ক্যাপ্টেন কোহেনকে খুঁজে বের করতে হবে। সব বলতে হবে তাঁকে।'

ফেরার পথে অন্ধকার হয়ে যাওয়ায় গতি কমিয়ে রাখল মুসা। বাড়ির কাছাকাছি আসতে বলে উঠল, 'খাইছে! ওই দেখো!'

রবিনদের বাড়ি থেকে এক ব্লক দূরে মোড়ের কাছে দাঁড়িয়ে আছে সেই ধূসর ভ্যানটা, রবিনও দেখল।

'আবার কি জন্যে এল?'

গতি আরও কমিয়ে ভ্যানের পাশ কাটাল মুসা। রস ডুগানকে গাড়িতে দেখতে পেল না।

ড্রাইভওয়েতে গাড়ি ঢোকাল সে।

'আরি,' দোতলার জানালার দিকে তাকিয়ে বলে উঠল রবিন, 'আলো জ্বালল কে? না নিভিয়েই বেরিয়ে গিয়েছিলাম নাকি?'

'না, নিভিয়েছিলে, মনে আছে। কেইন না তো?'

'হতে পারে। সাবধান থাকতে হবে। কি করে বসে, বলা যায় না।'

পেছনের দরজা দিয়ে পা টিপে টিপে ঢুকল দুজনে। আস্তে করে পাল্লাটা ভেজিয়ে দিল রবিন। ঘরে ঢুকে সিঁড়ির গোড়ায় এসে ওপর দিকে তাকাল। চিলেকোঠার দরজার ফাঁক দিয়ে আলো আসছে। তারমানে কেইন ফিরেছে।

সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে এল দুজনে।

চিলেকোঠার দরজার সামনে দাঁড়াল। আস্তে করে টোকা দিয়ে ডাকল রবিন, 'কেইন, আছো নাকি?'

জবাব নেই।

অবাক লাগল ওদের। ঘুমিয়ে পড়েছে? এত তাড়াতাড়ি?

আবার ডাকল রবিন, 'কেইন?'

জবাব নেই এবারেও। 'ঘটনা কি? ও তো কখনও আলো জ্বেলে ঘুমায় না!'

সামান্য ফাঁক হয়ে আছে পাল্লাটা। তারমানে ভেতর থেকে ছিটকানি লাগানো নয়। ঠেলা দিয়ে খুলে ভেতরে পা রাখল রবিন।

কেইনকে দেখতে পেল। চিৎকার করে উঠতে চাইল। কিন্তু স্বর বেরোল না গলা দিয়ে।

ডেস্কের সামনে বসে আছে কেইন। মাথাটা ঢলে পড়েছে টেবিলে। হাত দুটো ছড়িয়ে পড়ে আছে। ঘাড়ের ঠিক নিচে বিঁধে আছে একটা তীর। মুসার তীর। রক্তে ভিজে গেছে শার্ট।

কিছু একটা ঘটেছে, রবিনের দাঁড়ানোর ভঙ্গিতেই বুঝে গেল মুসা। ধাক্কা দিয়ে ওকে সরিয়ে সেও ভেতরে ঢুকল। দেখতে পেল কেইনকে। চিৎকার করে উঠল।

চেয়ারের নিচে কার্পেটেও রক্ত। অনেকগুলো তীর ছড়িয়ে পড়ে আছে।

'ও তো মরে গেছে!' বহুদূর থেকে ভেসে এল যেন মুসার ফিসফিসে কণ্ঠ। 'কে মারল?'

হঠাৎ পাল্লাটা এসে বাড়ি খেল রবিনের শরীরে। আড়াল থেকে বেরিয়ে এল ক্যাপ্টেন ফিল কোহেন। দরজার আড়ালে লুকিয়ে ছিল এতক্ষণ। হাতে মুসার ধনুক। জ্বলন্ত চোখে তাকাল ওর দিকে, 'কেন এ কাজ করলে, মুসা? খুন করলে কেন ছেলেটাকে?'

আঠারো

শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে মুসা। মগজটাও কেমন শূন্য হয়ে গেছে। প্রথমে ভেবেছিল, রসিকতা করছে কোহেন। কিন্তু যখন দৃষ্টির শীতলতা বিন্দুমাত্র কমল না, বুঝল, রসিকতা নয়। কেইনের খুনের দায়ে সত্যি ওকে অভিযুক্ত করছে কোহেন।

'আমি না!' বিড়বিড় করল মুসা। হাঁটু দুটো দুর্বল লাগছে। নিচের দিকে তাকাল। জুতোয় কেইনের রক্ত।

'ও কেইনকে খুন করেনি!' চিৎকার করে উঠল রবিন।

'না,' খানিকটা জোর পেয়ে বলল মুসা, 'আমি খুন করিনি! কেন করতে যাব?'

মুসার কাঁধে হাত রাখল কোহেন। ধনুকটা ছুঁড়ে ফেলে দিল। 'শান্ত হও,' কোমল কণ্ঠে বলল সে। ওকে ঠেলে নিয়ে চলল ঘরের বাইরে। 'সবারই শান্ত থাকা উচিত এখন।' রবিনের দিকে তাকাল সে, 'খুনটা হয়েছে মুসার অস্ত্র দিয়ে, এটা তো ঠিক...'

'আমার অস্ত্র হলেই প্রমাণ হয় না আমি করেছি,' মগজের শূন্যতাটা কেটে যাচ্ছে মুসার। অস্বাভাবিক হয়ে গেছে স্বর। নিজের গলা নিজেই চিনতে পারল না। 'খুনটা কখন হয়েছে বলে মনে হয় আপনার?'

'এই ঘণ্টাখানেকের মধ্যে।'

'আমরা তখন ছিলামই না এ বাড়িতে, প্রমাণ করতে পারব। সাক্ষী আছে!'

দীর্ঘ একটা মুহূর্ত ওর দিকে তাকিয়ে রইল কোহেন। মাথা নাড়ল, 'চলো, নিচতলায়। বসে কথা বলব।'

সিঁড়ি দিয়ে নামার সময়ও মুসার কাঁধ থেকে হাত সরাল না সে।

লিভিং রুমে ঢুকল তিনজনে।

ভাবনাগুলো সব জট পাকিয়ে যাচ্ছে মুসার মগজে। অনেক প্রশ্ন। কোনটাই পরিষ্কার হচ্ছে না। কে মারল কেইনকে? কেন মারল?

বসতে যাচ্ছিল সে আর রবিন, এ সময় ঝটকা দিয়ে খুলে গেল দরজা। ঘরে ঢুকল রস ডুগান। হাতে উদ্যত পিস্তল।

কোহেনকে দেখে থমকে দাঁড়াল।

'এই সেই লোক!' চিৎকার করে উঠল রবিন। 'এর কথাই বলেছিলাম, কেইনের সঙ্গে দেখা করেছে!'

ডুগানের চোখ রবিনের দিকে। এই সুযোগে চোখের পলকে পিস্তল বের করে ফেলল কোহেন। গুলি করল পর পর তিনবার। তিনটে গুলিই ডুগানের বুকে লাগল। চোখ উল্টে গেল ওপর দিকে। বিদঘুটে একটা চিৎকার বেরোল মুখ থেকে। ভাঁজ হয়ে এল হাঁটু। মুখ থুবড়ে পড়ে গেল দেহটা।

বোকা হয়ে তাকিয়ে আছে রবিন।

ওর কাছাকাছি রয়েছে কোহেন। এক পা এগিয়ে গিয়ে ওর কাঁধে হাত রাখল। মোলায়েম গলায় বলল, 'আর কোন ভয় নেই। শত্রু খতম। সব ঠিক হয়ে যাবে।'

মুসাও স্তব্ধ। যেন বাস্তবে ঘটছে না এ সব। ভয়াবহ কোন দুঃস্বপ্ন। ঘরটা দুলছে মনে হচ্ছে। দুজন মৃত মানুষ। দুটো লাশ। খুন। রক্ত···

টলে উঠল সে। হাত বাড়িয়ে ধরে ফেলল কোহেন। দুজনকে ঠেলে নিয়ে চলল একটা সোফার দিকে। প্রায় ধাক্কা দিয়ে বসিয়ে দিল।

রবিন এখনও নীরব। কোন কথা বলতে পারছে না।

কোহেনের দিকে তাকাল মুসা। কানে বাজছে গুলির শব্দ। ডুগানের আর্ত চিৎকার।

'আর কোন ভয় নেই। মাথা ঠাণ্ডা করো তোমরা,' নরম স্বরে বলল কোহেন। মুখের একপাশ চুলকাল। পিস্তলটা ঢুকিয়ে রাখল হোলস্টারে।

গিয়ে দাঁড়াল ডুগানের কাছে। ওল্টাল লাশটা। হাঁটু গেড়ে বসে মুখ দেখল ভালমত। 'কেইনের সঙ্গে দেখেছ একে, না?'

'হ্যাঁ,' ফ্যাঁসফ্যাঁসে হয়ে গেছে রবিনের গলা। 'কফি শপে কথা বলতে দেখেছি।'

'সূত্রগুলো সব জোড়া লাগানো দরকার এখন,' উঠে দাঁড়াল কোহেন। 'বুঝতে হবে, তোমার বাবা-মাকে কি করেছে এরা।'

ডেস্কে রাখা টেলিফোনের দিকে এগোল সে। 'থানায় ফোন করা দরকার। লাশগুলো এসে নিয়ে যেতে বলি। তোমরা বসে থাকো।'

রিসিভার কানে ঠেকিয়ে নম্বর টিপল সে। 'কে, ইউরি? আমি। গোস্ট লেন থেকে বলছি।···হ্যাঁ হ্যাঁ, মিলফোর্ডদের বাড়ি···কয়েকজন লোক আর একটা ট্রাক নিয়ে চলে এসো। দুটো লাশ পড়ে আছে এখানে। নিয়ে যেতে হবে। তাড়াতাড়ি

করো। রাখি?'

রিসিভার নামিয়ে রাখল সে। ফিরে এল সোফার কাছে।

তাকিয়ে আছে মুসা।

কোলের ওপর দুই হাত রেখে চুপচাপ বসে আছে রবিন।

'আর কোন ভয় নেই,' ওদের শান্ত করার জন্যে বলল কোহেন। 'খারাপ কিছু আর ঘটবে না।'

'খারাপ লাগছে আমার,' রবিন বলল। 'এ ভাবে মারা গেল লোকগুলো…'

উঠে দাঁড়াল মুসা। বোঁ করে উঠল মাথা। থাবা দিয়ে ধরল একটা কাউচ।

'কি হলো? কোথায় যাচ্ছ?' ওকে ধরে ফেলল কোহেন।

'রান্নাঘরে। পানি খাব।'

'আমার জন্যেও নিয়ে এসো এক গ্লাস,' রবিন বলল।

'যেতে পারবে?' জিজ্ঞেস করল কোহেন।

মাথা ঝাঁকাল মুসা।

ওকে ছেড়ে দিল কোহেন। 'যাও, তাড়াতাড়ি খেয়ে এসো। অনেক কথা আছে।'

রান্নাঘরে ঢোকার আগে ফিরে তাকাল মুসা। সামনের জানালার কাছে চলে গেছে কোহেন। তাকিয়ে আছে বাইরের দিকে।

রান্নাঘরে ঢুকে টেবিলের দিকে চোখ পড়তে থমকে দাঁড়াল মুসা। তেমনি পড়ে আছে রিসিভারটা। তোলা হয়নি। ঘাড়ের পেছনটা শিরশির করে উঠল ওর। চোখ মিটমিট করল। ভুল দেখছে না তো! সত্যি রিসিভারটা টেবিলে পড়ে আছে?

বিমূঢ়ের মত এগিয়ে গিয়ে তুলল ওটা। কানে ঠেকাল। নীরব হয়ে আছে ফোন। ডায়াল টোন নেই। ক্রেডলে রেখে চাপ দিয়ে আবার তুলে কানে ঠেকাল।

আগের মতই। নীরব।

ফোনটা ডেড হয়ে আছে এখনও।

তাহলে থানায় ফোন করল কি করে কোহেন?

একটাই জবাব। ফোন সে করেনি। করার ভান করেছে কেবল।

উনিশ

তারমানে কোহেনটা একটা ধাপ্পাবাজ! হয়তো পুলিশের লোকই নয়।

সাহায্যের জন্যে থানায় ফোন করেনি সে। ওদের দুজনকে বোকা বনিয়ে আটকে নিয়ে বসে আছে। কেন?

ওদের চোখের সামনে ডুগানকে খুন করেছে সে। কেইনের হত্যাকারীও কি সে-ই? ওদেরকেও খুন করবে না তো?

কে সে? কি চায়? কি ঘটছে রবিনদের বাড়িতে? হাজারো প্রশ্ন ভিড় করে এল আবার মুসার মনে।

রিসিভার নামিয়ে রেখে ফোনটার দিকে তাকিয়ে ভাবতে লাগল সে। রবিনকে সাবধান করে দিতে হবে কোনভাবে। বোঝাতে হবে কোহেন নিজের পরিচয় যা

দিয়েছে সেটা সে নয়। ও একটা ধোঁকাবাজ। বিপজ্জনক লোক।

'মুসা, কি করছ?' ডাকল কোহেন।

পেছনের দরজা দিয়ে পালানোর কথা ভাবল মুসা। পুলিশ নিয়ে ফিরে আসবে। কিন্তু সে নড়ার আগেই দরজায় দেখা দিল কোহেন। 'পানি খেয়েছ?'

'না...'

একটা গ্লাস নিয়ে সিংকের কলের নিচে ধরল মুসা। পানি ভরে খেল। আবার গ্লাসটা ভরে নিয়ে পা বাড়াল লিভিং রুমের দিকে। ওর পিছে পিছে চলল কোহেন।

আগ্রহের সঙ্গে হাত বাড়িয়ে গ্লাসটা নিল রবিন। ওর দিকে তাকিয়ে চোখের ইঙ্গিতে কোহেনকে দেখানোর চেষ্টা করল মুসা। ওরা যে বিপদের মধ্যে রয়েছে, রবিনকে এটা বোঝানোর জন্যে উপায় একটা বের করতেই হবে।

'এখানে ভাল্লাগছে না!' নিরীহ ভঙ্গিতে কোহেনকে বলল মুসা। 'আমি আর রবিন রান্নাঘরে চলে যাই...'

নাকের ফুটো ফুলে উঠল কোহেনের। বিপদের গন্ধ পেয়েছে যেন। 'না, ওখানে যাওয়া লাগবে না।' শান্তকণ্ঠে বলল সে। দুই গোয়েন্দার দিকে তাকিয়ে হাসল। ওদের মুখোমুখি একটা গদি আঁটা টুলে বসল। 'কথা আছে।'

রবিন তাকিয়ে আছে মুসার দিকে। মুসা ওর দিকে। ইঙ্গিত করল মুসা। বুঝল না রবিন।

'এখন আমার কয়েকটা প্রশ্নের জবাব দাও,' কোহেন বলল। রবিনের দিকে তাকিয়ে হাসল। 'প্রথম প্রশ্ন, কি করে প্রমাণ করবে চিলেকোঠার ওই ছোকরাকে খুন করেনি মুসা?'

রবিনের দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করল মুসা। কিন্তু কোহেনের দিকে তাকিয়ে আছে সে। রবিন যাতে জবাব দিতে না পারে সেজন্যে তাড়াতাড়ি বলল, 'আগে আপনি বলুন, রবিনের বাবা-মা কোথায়? কিছু জেনেছেন?'

প্রশ্নটা এড়িয়ে গেল কোহেন। 'খুঁজে বের করতে হবে।'

'সে তো প্রথম থেকেই শুনছি। আচ্ছা বলুন তো, আপনি এখানে কেন এসেছেন?' প্রশ্নটা এমন ভঙ্গিতে করল মুসা যাতে রবিনের সন্দেহ জাগে। ইস্, কোনভাবে যদি ওকে বোঝানো যেত লোকটা ভুয়া!

'তোমাদের সঙ্গে কথা বলতে,' গাল চুলকাল কোহেন। 'ঘরে দেখলাম না। ওপরতলায় আলো দেখে ভাবলাম ওখানে আছ। গিয়ে দেখি মরে পড়ে আছে কেইন। ঘাড়ে তীর বেঁধা। এই সময় তোমাদের পায়ের শব্দ শুনে তাড়াতাড়ি লুকিয়ে পড়লাম দরজার আড়ালে।'

'ধনুকটা আপনার হাতে গেল কি করে?' আচমকা প্রশ্নটা ছুঁড়ে দিল মুসা।

হাসল কোহেন। শান্ত ভঙ্গি। বলল, 'চিলেকোঠার মেঝেতে পড়ে ছিল। তুলে পরীক্ষা করছি, এই সময় তোমরা এলে। ব্যাপার কি? প্রশ্ন করার কথা আমার। অথচ তুমি করে যাচ্ছ অনর্গল?'

রবিনের দিকে তাকাল মুসা। চোখ ঘোরাল। মুখ বাঁকাল। কিছুই বুঝল না রবিন।

'রবিন,' কোহেন বলল, 'আমার প্রশ্নের জবাব কিন্তু দিলে না?'

মরিয়া হয়ে উঠল মুসা। কি করে বোঝাবে?

ঘড়ি দেখল কোহেন। 'কখন ফোন করলাম, আসছে না কেন এখনও?' জানালার দিকে তাকাল সে। আবার ফিরল রবিনের দিকে। 'বাড়ি আসার আগে কোথায় গিয়েছিলে?'

লোকটার ভান করা দেখে পিত্তি জ্বলে গেল মুসার। সে তো জানে, লাশ নিতে থানা থেকে কখনই আসবে না পুলিশ।

'একজন লোকের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম,' জবাব দিল রবিন, 'বাবার বন্ধু।'

'বোলো না, রবিন!' আর কোন উপায় না দেখে চিৎকার করে উঠল মুসা। 'ওকে কিছু বোলো না!' আর না জানার ভান করে থেকে লাভ নেই। খেপা চিতাবাঘের মত কোহেনের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল সে। এক ধাক্কায় চিত করে ফেলে দিল মেঝেতে।

রাগে চেঁচিয়ে উঠল মুসা।

'আরি, মুসা, করো কি!' অবাক হয়ে গেল রবিন।

কোহেনের হোলস্টার থেকে পিস্তল খুলে নেয়ার চেষ্টা করল মুসা। পারল না। ওর নিচ থেকে পিছলে একপাশে সরে গেল লোকটা। ঠেলা দিয়ে ওকে গায়ের ওপর থেকে ফেলে লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল। হাতে উদ্যত পিস্তল।

'চেষ্টাটা ভালই করেছিলে,' চিবিয়ে চিবিয়ে বলল সে, 'তবে অতটা ভাল নয়। যাও, বসো আগের জায়গায়।'

'মুসা! হলো কি তোমার?' রবিনের দৃষ্টি দেখে মনে হলো ওর ধারণা মুসা পাগল হয়ে গেছে।

আন্তরিকতার মুখোশ খসে পড়ল কোহেনের চেহারা থেকে। শীতল দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে দুই গোয়েন্দার দিকে। পিস্তল নামাচ্ছে না। 'তারমানে এমন কিছু জানো তোমরা যা আমাকে বলোনি। সেটাই বলে ফেলো দেখি এবার।'

হাঁ হয়ে গেল রবিন, 'মানে?'

'যা বললাম শুনেছ,' ধমকের সুরে বলল কোহেন। 'নাও, শুরু করা যাক। প্রথম প্রশ্ন, তোমার বাবা-মা কোথায়? ভাল চাইলে বলো। অনেক ঝামেলা থেকে বাঁচা যাবে।'

'কিন্তু আমি তো জানি না!' বিমূঢ়ের মত জবাব দিল রবিন।

'অনেক হয়েছে তোমাদের সঙ্গে খেলা,' কঠোর কণ্ঠে বলল কোহেন। জোরে নিঃশ্বাস ফেলল। 'এখনও বুঝতে পারছ না আমি ফালতু কথা বলি না? চোখের সামনেই তো দেখলে একজনকে খুন করলাম। আরেকজনকে করেছি তোমরা আসার আগে। তোমাদেরকেও খুন করি, তাই চাও?'

'আ-আপনি···আপনি পুলিশ নন?' চোখ বড় বড় হয়ে গেছে রবিনের।

'পুলিশ তো বটেই,' তিক্ত কণ্ঠে বলল কোহেন। উঠে দাঁড়াল। 'তবে ছিলাম। ষোলো বছর পুলিশের চাকরি করেছি। কিন্তু তোমার বাবা···'

'কি করেছে আমার বাবা?'

'প্রশ্ন আমি করছি, তুমি শুধু জবাব দেবে,' অধৈর্য স্বরে বলল কোহেন। 'অনেক

পথ পাড়ি দিয়ে এসেছি তোমার বাবার খোঁজে। এর জন্যে বহুদিন অপেক্ষা করতে হয়েছে আমাকে।' দুজনের একেবারে সামনে এসে দাঁড়াল সে। 'কোথায় সে?'

'আমি জানি না,' রবিন বলল। 'কিন্তু আপনি কেইনকে খুন করলেন কেন?'

'বড় বেশি ছোঁক ছোঁক করছিল। তোমাদের বোকা বানিয়েছিলাম, কিন্তু ওকে পারিনি। মনে হয় কিছু সন্দেহ করেছিল ও। সুতরাং কি আর করা?' মুসার দিকে তাকাল কোহেন। 'একটা দারুণ অস্ত্র রেখে দিয়েছিলে ঘরে। কাজে লেগেছে আমার। ধন্যবাদ। এমনই অস্ত্র, কেইনের খুনের ব্যাপারে কেউ আমাকে সন্দেহ করবে না। খুব সহজেই শেষ করে দিলাম। একটিবারের জন্যে পেছনে ফিরে তাকায়নি। কখন মারা গেল, তাও বোধহয় বোঝেনি।'

রবিনের দিকে পিস্তল তাক করল কোহেন। 'এখন বলো, তোমার বাবা কোথায়?'

মুসা বলল, 'ও সত্যি জানে না। সে জন্যেই তো আমি ওর সঙ্গে এ বাড়িতে রয়ে গেছি। ওর বাবা-মাকে খুঁজে বেড়াচ্ছি।'

'বিশ্বাস করতে পারলাম না, দুঃখিত,' রবিনের কপাল বরাবর সই করল কোহেন। পরক্ষণে ঘুরিয়ে ফেলল মুসার দিকে। 'আমার ধারণা, তোমার বন্ধুকে গুলি করলেই সব কথা গড়গড় করে বলে দেবে।'

'না!' চিৎকার করে উঠল রবিন।

'বেশ, তাহলে বলে ফেলো।'

'সত্যি বলছি, জানি না,' ককিয়ে উঠল রবিন, 'আমি জানি না ওরা কোথায় আছে!'

'বুঝলাম, গুলি ওকে করতেই হচ্ছে,' পিস্তল নেড়ে মুসাকে দেখাল কোহেন। 'খুব খারাপ কথা। বন্ধুর জন্যে একটুও দরদ নেই তোমার।'

'না!' আবার চিৎকার করে উঠল রবিন, 'কি করে বোঝাব আপনাকে, সত্যি কিছু জানি না আমি!'

'গুড-বাই, মুসা,' পিস্তলের নল আরেকটু এগিয়ে আনল কোহেন।

চোখ বন্ধ করে ফেলল মুসা।

এক সেকেণ্ড! দুই সেকেণ্ড! তিন সেকেণ্ড!

মুসা ভাবছে—কতটা যন্ত্রণা হবে? কিছু কি টের পাব? কখন গুলিটা লাগল, বুঝতে পারব?

চার সেকেণ্ড! পাঁচ! ছয়!

গুলি করল না কোহেন। এত দেরি করছে কেন? দেখার জন্যে চোখ মেলল মুসা।

ধীরে ধীরে পিস্তলটা নামিয়ে নিল কোহেন।

ঘোরের মধ্যে রয়েছে যেন মুসা। দম নিতে কষ্ট হচ্ছে।

ওর দিকে তাকিয়ে নেই কোহেন। চেয়ে আছে ওর পেছনে। চেহারায় তীব্র অসন্তোষ।

'পিস্তলটা ফেলো!' মুসার পেছন থেকে আদেশ এল।

ঝট করে ঘুরে তাকাল মুসা। 'হানি!'

কাঁধময় ছড়িয়ে পড়েছে ওর লম্বা কালো চুল। নীল সোয়েটশার্টে দাগ। গাল দুটো লাল, ফোলা ফোলা। চোখের নিচেও ফোলা। কেঁদেছে মনে হয় খুব।

কাঁধে ঠেকানো একটা শক্তিশালী হান্টিং রাইফেল। কোহেনের দিকে তাক করা।

'কে তুমি?' চিৎকার করে উঠল কোহেন। 'এখানে কি?'

ওর প্রশ্নের জবাব দিল না হানি। 'মুসা, রবিন, উঠে এসো। তাড়াতাড়ি করতে হবে আমাদের। মীটিং শুরু হয়ে যাচ্ছে। দেরি করা যাবে না।'

'মীটিং?'

'খবরদার, নড়বে না!' ধমক দিল কোহেন আবার মুসার দিকে পিস্তল তাক করল।

গুলি করল হানি। কোহেনের পেছনের দেয়ালে ফুটো করল বুলেট। চিৎকার করে হাত থেকে পিস্তলটা ছেড়ে দিল সে। ফ্যাকাসে হয়ে গেছে মুখ।

'পরের বার কপালে গুলি করব,' হুমকি দিল হানি। বিশাল রাইফেলটা শক্ত করে ধরে রেখেছে। সামান্যতম কাঁপছে না হাত। 'একটা খবর জানিয়ে রাখি, চার বছর বয়েসে আমাকে গুলি করতে শিখিয়েছে আমার আব্বা। তোমার কপালটা ছাতু করে দেয়া আমার জন্যে ছেলেখেলা।'

'হানি, কোথায় চলে গিয়েছিলে তুমি?' জিজ্ঞেস করল মুসা।

'এখন কথা বলার সময় নেই।' ইঙ্গিতে কোহেনকে দেখাল হানি, 'ওকে কি করা যায়? যা করার জলদি করতে হবে।'

'গ্যারেজে তালা দিয়ে রাখতে পারি,' বলতে বলতে উঠে দাঁড়াল রবিন। 'শক্ত দরজা। ভাঙতে পারবে না।'

বুদ্ধিটা ভালই। কোহেনের পেছনে গিয়ে দাঁড়াল হানি। বাইরে বেরোতে বাধ্য করল ওকে। পিঠে নল ঠেকিয়ে ঠেলে নিয়ে চলল গ্যারেজের দিকে।

তুষার পড়ছে। মাটি ঢেকে দিয়েছে ইতিমধ্যে। যেদিকেই তাকানো যায়, শুধু সাদা তুষার।

কোহেনকে গ্যারেজে ভরে দরজা লাগিয়ে বাইরে থেকে বড় তালা আটকে দেয়া হলো।

'এর জন্যে পস্তাতে হবে তোমাদের,' ভেতর থেকে নিষ্ফল আক্রোশে ফুঁসতে থাকল সে।

'জলদি চলো,' তাড়া দিল হানি। 'এমনিতেই দেরি হয়ে গেছে।'

কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই বাড়ির পেছনের আঙিনা পেরিয়ে এল ওরা। দ্রুত হাঁটতে গিয়ে পা পিছলে যাচ্ছে তুষারে ভেজা মাটিতে।

'বনের ভেতর দিয়ে যেতে হবে,' হানি বলল। পিচ্ছিল মাটির তোয়াক্কা না করে সবার আগে প্রায় দৌড়ে চলল।

ওর পেছনে ছুটতে ছুটতে মুসা জানতে চাইল, 'কোথায় ছিলে তুমি? কি হয়েছে?'

'আমার খালার বাড়িতে,' নিঃশ্বাস জোরাল হতে আরম্ভ করেছে হানির। নাকের ফুটো দিয়ে বেরোচ্ছে সাদা বাষ্পের মত। বনের মধ্যে ঢুকে পড়েছে ওরা।

গর্জন করে ফিরছে ঝোড়ো বাতাস। বিচিত্র শব্দ করে বেঁকে যাচ্ছে গাছের ডাল। 'তোমাকে ফোন করতে শুনে ফেলেছিল আব্বা। ধরে নিয়ে গিয়ে আমাকে আটকে রাখল মাটির নিচের ঘরে। আজকে নিয়ে গিয়ে রেখে এসেছিল খালার বাড়িতে। আমি পালিয়ে এসেছি। বাড়ি গিয়ে আব্বার রাইফেলটা নিয়ে চলে এসেছি।'

'কেন?' জানতে চাইল রবিন।

'সে অনেক কথা। এখন বলা যাবে না। জলদি যেতে না পারলে সর্বনাশ হয়ে যাবে।'

'কিন্তু যাচ্ছি কোথায় আমরা?'

'তোমার আব্বা-আম্মাকে বাঁচাতে!' গাছপালার ভেতর দিয়ে প্রায় ছুটে চলল হানি। 'মস্ত বিপদে রয়েছেন দুর্জনে···' হানির শেষের কথাগুলো ঢেকে দিল ঝোড়ো বাতাসের শব্দ।

পেছনে পড়ে গেল রবিন। মুসা আর হানির সঙ্গে তাল রেখে দৌড়াতে হিমশিম খেয়ে যাচ্ছে সে। সাংঘাতিক ছুটতে পারে মেয়েটা। বোঝা যায় এই বনে চলার অভ্যাস আছে, হরহামেশাই হয়তো ঢুকে পড়ে।

কনকনে ঠাণ্ডা বাতাস, হাড় ভেদ করে ঢুকে যেতে চায়। মুখের চামড়া ইতিমধ্যেই জমে খসখসে হয়ে গেছে মুসার। কাল রাতে এই পথ দিয়েই হানিদের বাড়িতে যাওয়ার কথা মনে পড়ল ওর। কাল রাতে? বিশ্বাস হতে চায় না। মনে হচ্ছে বহুযুগ আগের কথা। ফাঁদের মধ্যে পড়েছিল। আক্রমণ করেছিল বিশাল কুকুরটা। ওটার ঘাড়ের হাড় ভাঙার বিশ্রী শব্দটা আবার যেন স্পষ্ট শুনতে পেল ও।

তুষারপাত আর ঝোড়ো বাতাস আগের রাতের চেয়ে ভয়াবহ করে তুলেছে বনটাকে। ভয় লাগছে মুসার। প্রতিটি অন্ধকার ঝোপের দিকে চোখ পড়তেই মনে হচ্ছে এই বুঝি লাফিয়ে বেরিয়ে এল আরেকটা দৈত্যাকার কুকুর। কিংবা অন্য কোন দানব।

কোথায় চলেছে ওরা? কোনখানে, কিসের মীটিঙে নিয়ে যাচ্ছে ওদেরকে হানি?

আরও পিছিয়ে পড়েছে রবিন। হাঁপাচ্ছে। ফুসফুস ফেটে যাবে যেন। আর পারছে না। এই সময় গতি কমাল হানি। সামনে ঘন ঝোপঝাড়। তুষারে ছাওয়া উঁচু ঘাস। দু'হাতে সেসব ঠেলে সরিয়ে এগোতে গিয়ে ককিয়ে উঠল রবিন, 'আ-আমি···'

'চুপ!' বাধা দিল হানি। 'পৌঁছে গেছি···'

সামনে ছোট ছোট হলুদ আলো দেখা গেল একঝাঁক। গাছপালার ভেতর দিয়ে চলেছে। মিটমিট করছে জোনাকির মত। কিন্তু জোনাকি নয়, ভাল করেই জানে মুসা আর রবিন। শীতকালে বেরোয় না এই পোকা। তাহলে?

'মোম!' উত্তেজনায় জোরেই বলে ফেলল মুসা।

'আস্তে,' হুঁশিয়ার করল হানি। 'শুনে ফেলবে!'

'এ কোথায় এলাম?' রবিনের প্রশ্ন।

মুসা চিনে ফেলল। সেই গোলা খোলা জায়গাটা, আগের দিন যেখানে পায়ের ছাপ দেখে গিয়েছিল। জ্বলন্ত মোমবাতি হাতে ওখানে গিয়ে ভিড় করেছে অনেক লোক।

'সময়মতই এসেছি,' ফিসফিস করে বলল হানি, 'মীটিং এখনও শুরু হয়নি।'

'কিসের মীটিং?' আরেকবার জানতে চাইল মুসা।

এবারও তার প্রশ্ন এড়িয়ে গেল হানি, 'এসো। ওই গাছগুলোর ওপাশেই আমাদের বাড়ি। আব্বা কোথায় আলখেল্লা রাখে, জানি আমি।'

মোম? আলখেল্লা?

'খাইছে!' খপ করে হানির হাত খামচে ধরল মুসা। 'সব কথা না জেনে আর এক পাও এগোব না আমি!'

ওর হাতে হাত রাখল হানি। বরফের মত ঠাণ্ডা। 'মুসা, প্লীজ, রবিনের বাবা-মাকে বাঁচাতে হলে তাড়াতাড়ি করতে হবে আমাদের!'

বিশ

বিপদ! বুঝতে অসুবিধে হচ্ছে না আর রবিনের। বাতাসে যেন শক ওয়েভের মত ভেসে বেড়াচ্ছে ভয়ানক বিপদের গন্ধ। ক্লান্তি ভুলিয়ে দিল ওর। বনের ভেতর দিয়ে দৌড়ে আসায় ঘামে ভিজে গেছে শরীর। ঘাম জমে গিয়ে চড়চড় করছে। ভীষণ অস্বস্তি লাগছিল এতক্ষণ। কিন্তু বনের ভেতরে জ্বলন্ত মোম হাতে আলখেল্লা পরা, মাথায় হুড তোলা মূর্তিগুলো সব কিছু ভুলিয়ে দিল ওর।

বেশি কাছে যায়নি এখনও তিনজনে। গাছপালার আড়ালে লুকিয়ে এখান থেকেও দেখতে পাচ্ছে লোকগুলোকে। খোলা গোল জায়গাটায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে ডজনখানেক মানুষ। পরনে মংকদের কালো আলখেল্লা। হুডের আড়ালে ঢাকা পড়েছে মুখের বেশির ভাগ। সবার হাতেই একটা করে লম্বা কালো রঙের মোম।

বাবা-মা কি এখানেই আছে?—জিজ্ঞেস করতে যাচ্ছিল রবিন। বুঝতে পেরে হাতের ইশারায় ওকে চুপ থাকতে বলল হানি।

মাথা নুইয়ে ধীরে ধীরে খোলা জায়গাটার দিকে এগিয়ে গেল ওরা। মাটিতে পড়া নরম তুষারকণার কারণে ওদের ভেজা স্নীকারের শব্দ হচ্ছে না। মৃদু বাজনা বাজছে। কোনও ধরনের বাঁশি হবে। সম্ভবত ক্যাসেট বাজানো হচ্ছে।

'বাজনা থামলেই মীটিং শুরু হবে,' ফিসফিস করে বলল হানি।

একটা বাড়ির পেছনের আঙিনায় দুই গোয়েন্দাকে নিয়ে এল সে। নিচু বেড়ার আড়ালে আড়ালে মাথা নুইয়ে রেখে দ্রুত চলে এল সামনের দিকে। হানিদের বাড়ি এটা।

'আলখেল্লাগুলো আছে বেসমেন্টে,' কাছাকাছি কেউ নেই, তবু ফিসফিস করে বলল হানি।

'বোকামি হয়ে গেছে। কোহেনের পিস্তলটা নিয়ে আসা উচিত ছিল,' মুসা বলল। 'কাজে লাগত।'

'হ্যাঁ,' মাথা ঝাঁকাল রবিন, 'লিভিং রুমেই পড়ে আছে ওটা।'

'এখন আর চিন্তা করে লাভ নেই,' হানি বলল। বাড়ির একপাশে নিয়ে এল গোয়েন্দাদের। একটা দরজা আছে। সেটা দিয়ে ভেতরে ঢুকে পড়ল ওরা। নেমে এল মাটির নিচের ঘরে। ওপর থেকে কথা আর হাসি শোনা যাচ্ছে। বাজনাটা

বাজছে এখনও, তবে আরও মৃদু হয়ে এসেছে শব্দ।

বেসমেন্টে ঘর একটা নয়, অনেক। বড় একটা রেকর্ড রুম আছে, সেই সঙ্গে আরও কিছু ছোট ছোট ঘর। একটা ঘরে ঢুকে সুইচ টিপে আলো জ্বালল হানি। দেখা গেল ছাদ পর্যন্ত উঁচু করা রাইফেলের স্তূপ। কোণের দিকের একটা বিশাল আলমারির কাছে মুসা আর রবিনকে নিয়ে এল সে। টেনে পাল্লা খুলল। কয়েকটা গাঢ় বাদামী রঙের আলখেল্লা ছাড়া আর কিছু নেই আলমারিটায়।

আচমকা মুসার বাহু খামচে ধরল হানি। 'আমি জানতাম, আব্বাও আছে ওদের দলে,' বলতে গিয়ে বেদনায় কালো হয়ে গেল ওর মুখ, চোখে ভয়। 'প্রথমে শুনেছি কোন একটা বিশেষ ধর্মের অনুসারী ওরা, পরে জানলাম ফ্যানাটিক, ভয়াবহ সন্ত্রাসী। ধর্মের নামে মানুষ খুন করে।'

'কোহেনও কি ওদের দলে?' জিজ্ঞেস করল মুসা।

'না। যেই আমি জেনে গেলাম আজকে কি করার প্ল্যান করেছে ওরা, আর কোন উপায় না দেখে তোমাকে ফোন করলাম। সাহায্যের জন্যে। ভাবলাম ওদের ঠেকাতে হবে,' হানি বলল। 'আব্বা সেটা শুনে ফেলল। জোর করে আমাকে পাঠিয়ে দিল খালার বাড়িতে। খুনখারাপি পছন্দ করে না আব্বা। কিন্তু একবার ব্রাদারহুডে যোগ দিয়ে ফেলেছে, পিছিয়ে আসারও পথ নেই আর।'

'কিছুই বুঝতে পারছি না আমি,' জোরে কথা বলতে ভয় পাচ্ছে রবিন। 'এ সবের সঙ্গে আমার বাবা-মার কি সম্পর্ক? ওরাও কি...'

'শ্‌শ্‌শ্‌!' ঠোঁটে আঙুল রাখল হানি।

বেসমেন্টের সিঁড়িতে পায়ের শব্দ।

'এখান থেকে বেরিয়ে যেতে হবে,' বলেই তিনটে আলখেল্লা টেনে বের করল হানি। 'নাও, ধরো। পরে নাও।'

দ্রুত আলখেল্লায় গা ঢেকে নিল ওরা। বেশ ভারি। দেখে অতটা মনে হয় না। ঘাম আর ন্যাপথালিনের গন্ধে ভরা।

'হুড তুলে দাও,' নিজের হুডটা টেনে তুলে দিতে দিতে বলল হানি, 'মুখ ঢাকো।' কোমরের বেল্ট আঁটো করল। 'ওদের অনুকরণ করবে। ওরা যা যা করে ঠিক তাই করার চেষ্টা করবে।'

'এটা?' হানির রাইফেলটা দেখাল রবিন।

'নেয়া যাবে না,' আলখেল্লার স্তূপের নিচে ওটাকে লুকিয়ে রাখল হানি। 'আমার হাতে এ জিনিস দেখলে সন্দেহ করবে ব্রাদাররা। সব গড়বড় হয়ে যাবে। এসো।'

ঘর থেকে বেরিয়ে এল তিনজনে। সিঁড়ি বেয়ে নেমে এসেছে দুজন লোক। পাশ কাটানোর সময় মুখ ফিরিয়ে রাখল গোয়েন্দারা।

'ইভনিং,' মিষ্টি স্বরে বলল একজন।

জবাব দিল না ওরা।

ওপরে উঠে যত তাড়াতাড়ি পারল, হানিদের পেছনের আঙিনা পেরোল। বনে ঢুকে এগোল খোলা জায়গাটার দিকে। তুষার পড়া থেমেছে। প্রচণ্ড ঠাণ্ডা। দূর থেকে হলুদ বিন্দুর মত লাগছে মোমের আলোগুলোকে।

মুসার সঙ্গে গা ঘেঁষাঘেঁষি করে রইল রবিন ভিড়ের মধ্যে হারিয়ে ফেলার ভয়ে। আলখেল্লা পরা অবস্থায় সবাইকে প্রায় একরকম লাগছে। আলাদা করে চেনা কঠিন।

ভয় পাচ্ছে মুসাও। কিসের মীটিং করছে লোকগুলো? কোনও ধরনের প্রেতসভা? ওরা কি পিশাচ-সাধক?

সঙ্গে করে তিনটে মোম এনেছে হানি। একটা গুঁজে দিল রবিনের হাতে। কালো, সরু মোম। সোজা করে ধরে রাখতে গিয়ে দেখল রবিন, ওর হাত কাঁপছে।

হঠাৎ বন্ধ হয়ে গেল বাজনা। এদিক ওদিক তাকাল রবিন। কোথা থেকে আসছিল ওটা, দেখতে চাইছে।

নীরব হয়ে গেছে হুডতোলা মূর্তিগুলো।

ব্ল্যাক ফরেস্টের ভয়াল বনে কতক্ষণ ধরে চলবে ওদের সভা? কি কি করবে? কিছুই বুঝতে পারছে না মুসা বা রবিন।

কৌতূহলে ফাটছে দুজনে। কিন্তু হানিকে প্রশ্ন করার উপায় নেই এখন।

ঝোড়ো বাতাস ঝাপটা দিয়ে উড়িয়ে নিতে চাইল রবিনের হুড। থাবা মেরে ধরে ফেলল সে। টেনে নামিয়ে আনল কপালের নিচে যতটা সম্ভব।

'সারিতে দাঁড়াও,' খোলা জায়গাটায় ঢুকে কানের কাছে ফিসফিস করল হানি।

মুসার হাত ধরল রবিন। ঠাণ্ডা যেন বরফ। ওর নিজের হাতও ঠাণ্ডা।

দুই সারিতে দাঁড়িয়ে যাচ্ছে লোকগুলো। তারপর দুই প্রান্ত থেকে দুটো সারির চার মাথা এক হয়ে মিশে গিয়ে একটা চক্র তৈরি করল।

বাতাসে মিটমিট করছে মোমের আলো। কাত হয়ে নিভে যেতে চাইছে শিখাগুলো, কিন্তু নিভছে না। মানুষগুলো গোল হয়ে দাঁড়াতে আলোরও একটা চক্র তৈরি হলো।

চক্রের কেন্দ্রে গিয়ে দাঁড়াল দুটো আলখেল্লা পরা মূর্তি। মোম তুলে ধরল প্রায় মুখের কাছে। চেহারা দেখা গেল না। মুখোশ পরেছে।

দেখে চমকে গেল মুসা আর রবিন। সাদা রঙের মুখোশ। বানরের চেহারা। দাঁত বের করে আছে। একেবারে হাতির দাঁতে তৈরি বানরের খুলিটার মত।

হুডে মুখ ঢাকা তৃতীয় আরেকটা মূর্তি চক্র থেকে বেরিয়ে গিয়ে দাঁড়াল প্রথম দুজনের কাছে।

সবাই নীরব। কেউ কোন কথা বলছে না, বিড়বিড় করেও না। প্রকৃতিও যেন কৌতূহলী চোখে তাকিয়ে দেখছে এই বিচিত্র সভা।

এক এক করে মুখোশ পরা মূর্তি দুটোর মুখে আঙুল ছোঁয়াল তৃতীয় লোকটা। তারপর আচমকা একজনের মুখোশ খামচে ধরে টান দিয়ে ছিঁড়ে ফেলল।

মোমের আলোয় পরিষ্কার চিনতে পারল চেহারাটা রবিন। ওর মা!

বিশ্বাস করতে পারছে না নিজের চোখকে। শেষ পর্যন্ত ওর বাবা-মাও ব্রাদারহুডে যোগ দিল!

একুশ

এ বাস্তব হতে পারে না! স্বপ্ন দেখছে ও। দুঃস্বপ্ন। তুষার। কালো বন। আলখেল্লা পরা একদল মানুষ। কালো মোম। হলুদ আলোর চক্র। মাঝখানে মা আর বাবা। ওদের পরনে মংকের পোশাক। মুখে কুৎসিত মুখোশ। দুঃস্বপ্ন ছাড়া এ আর কি হতে পারে?

মুসার দিকে তাকাল রবিন। মুখ ঢেকে রেখেছে মুসা। চেহারা দেখতে পেল না।

এ জন্যেই কি বাবা-মা ছেড়ে গেছে ওকে? বনের মধ্যে এসে অদ্ভুত ধর্মানুসারীদের উদ্ভট এক সভায় নেতৃত্ব দেয়ার জন্যে? বলেছিল, বুধবারে একটা পার্টিতে যাবে। এই কি সেই পার্টি? সেদিনও কি এতেই অংশ নিয়েছিল?

কি করছে ওরা? প্রেতসাধক হয়ে গেছে? নাকি পিশাচ? পিশাচদের সর্দার?

অসুস্থ বোধ করছে রবিন।

আবার মুসার দিকে তাকাল সে।

মুসার নজর সামনের দিকে।

কি ঘটবে? এখানে কেন এনেছে ওদের হানি?

চক্রের মানুষগুলো সব ধীরে ধীরে এগোতে শুরু করল। সুতরাং রবিন, মুসা আর হানিও এগোল ওদের সঙ্গে।

চক্রের মাঝখানে বড় একটা কাটা গাছের গুঁড়ি রয়েছে। ওটাকে কেন্দ্র করেই তৈরি হয়েছে চক্রটা। রবিনের বাবা-মার মুখোশ ছিঁড়ে ওটার দিকে তাঁদের নিয়ে চলেছে তৃতীয় লোকটা।

হঠাৎ বয়ে গেল একঝলক বাতাস। ঝাপটা দিয়ে হুড খুলে ফেলল ওর। কালো খাটো চুল আর চশমা দেখতে পেল রবিন। সঙ্গে সঙ্গে চিনল। প্রিক জেরিমোর!

ও, এ জন্যেই—এতক্ষণে বুঝতে পারল রবিন—এ জন্যেই ওদের সঙ্গে মিথ্যে বলেছে জেরিমোর। রবিনের বাবাই মানা করে দিয়েছিল ওকে, রবিন অফিসে খুঁজতে গেলে যেন তাকে কিছু না বলে। নেতার কথা তো রাখতেই হবে। অতএব মিথ্যে বলেছে ওয়াগনার করপোরেশনের বিগ বস।

'আমরা এখন রেডি!' সদস্যদের উদ্দেশ্যে চিৎকার করে বলল জেরিমোর। হুড তুলল না আর। 'আমরা, সাদা বানরেরা আবার আমাদের আমেরিকা পুরোপুরি দখল করে নেব, একসময় যেটা আমাদের সম্পত্তি ছিল। অনেক সহ্য করেছি আমরা, অনেক অপেক্ষা করেছি। আমাদের জিনিস ভোগ করেছে দখলদার লুটেরারা। আর ওদের ভোগ করতে দেয়া হবে না! দেয়া হবে না! দেয়া হবে না! খুব শীঘ্রি মাথা তুলে দাঁড়াব আমরা। যে ক্ষমতা আমরা অর্জন করেছি, তাকে ঠেকানোর সাধ্য নেই আমাদের শত্রুদের।'

মাথার ওপর মুঠোবদ্ধ হাত তুলে ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে বলল সে, 'অপরাধীদের সঙ্গে হাত মিলিয়েছে আমেরিকার বর্তমান প্রেসিডেন্ট। তাকে আর ক্ষমতায় থাকতে দেয়া হবে না। আমেরিকার ভাগ্য পরিবর্তন করব আমরা অবশ্যই। আমাদের

প্রতিশোধ হবে দ্রুত, বিচার হবে ত্বরিত। কোন অপরাধীই নিরাপদে পার পেতে পারবে না আমাদের রাজত্বে। আমাদের সাম্রাজ্য আমরা ফিরিয়ে নেব। অপরাধীদের ধ্বংস করব।'

উল্লসিত চিৎকার করে উঠল আলখেল্লাধারীরা, মিস্টার এবং মিসেস মিলফোর্ড বাদে।

'আর কাউকে আদালতে যেতে হবে না!' চিৎকার করে বলল জেরিমোর। 'ভীতু, মেরুদণ্ডহীন পুলিশদের কাছে গিয়ে সাহায্যের জন্যে কাতর হতে হবে না! ব্রাদারহুডদের কাছে 'না' বলে কোন শব্দ থাকবে না!'

সম্মিলিত চিৎকার ছড়িয়ে গেল বনের মধ্যে।

গুঞ্জন থেমে এলে হাত নামাল জেরিমোর। তাকাল মিলফোর্ডদের দিকে। 'আমাদের সঙ্গে যারা বেঈমানী করেছে তাদের শাস্তি হবে সবার আগে।'

আবার সম্মিলিত চিৎকার।

বেইমানী? অন্ধকারে ভুরু কোঁচকাল রবিন। কি বলতে চায় লোকটা?

আবার হাত তুলল জেরিমোর। লম্বা ফলাওয়ালা একটা ছুরি দেখা গেল তার হাতে। 'সাদা বানরের ব্রাদারহুডেরা কখনও বিশ্বাসঘাতককে ক্ষমা করবে না!' চিৎকার করে বলল সে।

সমস্বরে চিৎকার করল সদস্যরা।

আবার এল ঝোড়ো বাতাসের ঝাপটা। আরেকটু হলে মাথা থেকে হুড় নামিয়ে দিয়েছিল রবিনের। থাবা দিয়ে ধরে ফেলল সে। কেউ দেখে ফেলল না তো?

তাকাল কেন্দ্রের দিকে। চক্র থেকে একজন লোক বেরিয়ে গিয়ে হাঁটু গেড়ে বসতে বাধ্য করল মিস্টার মিলফোর্ডকে। গাছের গুঁড়ির ওপর তাঁর মাথাটা ঠেসে ধরল।

রবিনের কানের কাছে ফিসফিস করে বলল হানি, 'সময় হয়েছে! কিছু করতে হবে আমাদের!'

ছুরি নাড়ল জেরিমোর। গম্ভীর গলায় ঘোষণা করল, 'বলি দেয়া হবে বিশ্বাসঘাতককে। এ ভাবেই সুবিচার প্রতিষ্ঠা করবে ব্রাদারহুডরা।'

মেরুদণ্ডে শিরশির করে উঠল রবিনের। অস্ফুট শব্দ বেরিয়ে এল মুখ থেকে। হাত চেপে ধরল মুখে। ভয়ে ভয়ে তাকাল পাশের লোকটার দিকে। কিছু সন্দেহ করল না তো?

বোধহয় না। সামনের দিকে তাকিয়ে আছে সে।

বুঝতে অসুবিধে হলো না রবিনের, ভুল করেছিল সে—ওর বাবা ব্রাদারহুডদের নেতা নয়। ওদের শত্রু। ওর বাবা-মা দুজনকেই খুন করতে চাইছে পিশাচগুলো। বাধা দেয়ার ক্ষমতা নেই ওদের। দৌড়ে পালানোও সম্ভব নয়। কারণ চতুর্থ যে লোকটা গিয়ে দাঁড়িয়েছে কেন্দ্রের মাঝে, তাঁর হাতে উদ্যত পিস্তল।

হাঁটু দিয়ে মিলফোর্ডের পিঠ চেপে ধরল জেরিমোর। ছুরি তুলল। ষাঁড়ের মত চিৎকার করে জিজ্ঞেস করল, 'তুমি সাদা বানরদের শত্রু, স্বীকার করছ?'

'ও আমাদের শত্রু!' চক্র থেকে বলে উঠল একজন। 'স্বীকার করা লাগবে না! ওকে বলি দাও!'

বয়ে গেল জোরাল বাতাস। আবার খসিয়ে দিচ্ছিল রবিনের হুড। ধরে ফেলল সে। ওর হাতে হাত রাখল মুসা। আলতো চাপ দিয়ে বলল, 'কি করা যায়? ইস্, এখন কিশোর থাকলে…'

'মরো তাহলে, বেঈমান!' ছুরি নামাতে শুরু করল জেরিমোর।

'না না, ওকে মেরো না!' ককিয়ে উঠলেন মিসেস মিলফোর্ড। জেরিমোরের ছুরি ধরা হাতটা চেপে ধরে টেনে সরানোর চেষ্টা করতে লাগলেন।

ধাক্কা দিয়ে তাঁকে সরিয়ে দিল জেরিমোর। পেছন থেকে জাপটে ধরল চতুর্থ লোকটা। আবার মিলফোর্ডের দিকে ফিরল জেরিমোর। এখনও তাঁর মাথাটা রয়েছে গাছের গুঁড়িতে।

'মরতে তোমাকে হবেই!' চিৎকার করে উঠল জেরিমোর।

কিছু করতে হলে এখনই সময়—ভাবল মুসা। কিন্তু অস্ত্র ছাড়া কি করতে পারবে? খালি হাতে এগোতে চাইলেও লাভ নেই। ও জেরিমোরের কাছে পৌঁছানোর আগেই ধরে ফেলা হবে ওকে। বলি দেয়া হবে কিংবা স্রেফ গুলি করে মারবে ব্রাদারহুডের সদস্যরা।

মুসার কাছ ঘেঁষে এল রবিন। প্যান্টের পকেটে কি যেন ঢুকিয়ে দিল।

রবিন হাতটা বের করে নিতেই আলখেল্লার নিচে দিয়ে পকেটে হাত ঢোকাল মুসা। একটা শক্ত জিনিস লাগল হাতে। বানরের খুলি। যেটা মিসেস মিলফোর্ডের ঘরে পাওয়া গেছে।

কেন দিয়েছে রবিন, আন্দাজ করতে পারল সে। জিনিসটা বের করে জেরিমোরকে সই করে ছুঁড়ে মারল। কপালে জোরে লাগলে জ্ঞান হারানোও অসম্ভব নয়। আর কিছু না হোক, বাধা তো পাবেই। তাতে আরও সামান্য সময় বেঁচে থাকবেন মিস্টার মিলফোর্ড।

অন্ধকারে উড়ে গেল সাদা খুলিটা। কিন্তু কয়েক ইঞ্চির জন্যে লাগল না কপালে। জেরিমোরের কাঁধের ওপর দিয়ে চলে গেল।

বাইশ

'কে ছুঁড়ল?' ষাঁড়ের মত গর্জন করে উঠল জেরিমোর। মুসার দিকে নজর। এগিয়ে আসতে শুরু করল। আবার চিৎকার করে উঠল, 'কে ছুঁড়ল ওটা?'

তিন-চার কদম এগিয়ে থেমে গেল সে।

স্থির দাঁড়িয়ে আছে মুসা।

সুযোগটা কাজে লাগালেন মিসেস মিলফোর্ড। যে লোকটা ধরে রেখেছিল, ঝাড়া মেরে তার হাত থেকে ছুটে গেলেন। থাবা দিয়ে মাটিতে ফেলে দিলেন পিস্তলটা। লাফিয়ে উঠে দাঁড়ালেন মিস্টার মিলফোর্ড। প্রচণ্ড ঠেলা মারলেন জেরিমোরের পিঠে।

সামলাতে পারল না জেরিমোর। চিৎকার করে উপুড় হয়ে পড়ে গেল তুষারের ওপর। হাত থেকে খসে পড়ল ছুরি।

দ্বিধায় পড়ে গেল বাকি সদস্যেরা। অবাক। কয়েকজন এদিক ওদিক দৌড়াতে

শুরু করল। কিন্তু বেশির ভাগই যেখানে ছিল সেখানেই পাথর হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

পিস্তলটার জন্যে মাটিতে ডাইভ দিয়ে পড়লেন মিস্টার মিলফোর্ড। তুলে নিলেন ওটা। লাথি মেরে দূরে সরিয়ে দিলেন ছুরিটা। তাঁর পাশে এসে দাঁড়ালেন মিসেস মিলফোর্ড।

পিস্তলের নল জেরিমোরের ঘাড়ে চেপে ধরলেন মিস্টার মিলফোর্ড। 'নড়বে না কেউ! তাহলে তোমাদের গুরুর খুলি উড়ে যাবে!'

কিন্তু তাঁর হুমকির পরোয়া না করে যে যেদিকে পারল ছুটে পালাতে শুরু করল সদস্যরা। ঢুকে পড়তে লাগল বনের ভেতর। দমকা বাতাসে হুড খসিয়ে দিল একজনের। অবাক হয়ে দেখল রবিন, মিসেস ডিকসন। মোমের আলোয় তাকে চিনতে কোন অসুবিধে হলো না। ফোন করতে গেলে কেন সেদিন ওরকম আচরণ করেছিল মহিলা, বুঝতে পারল। মিসেস ডিকসন জানত, ওর বাবা-মা কোথায় আছে। ব্রাদারহুডের সদস্য বলে চেপে গেছে কথাটা, বলেনি রবিনকে।

টান দিয়ে মাথার হুড পেছনে সরিয়ে মিস্টার মিলফোর্ডকে সাহায্য করতে ছুটল মুসা আর রবিন।

মিসেস মিলফোর্ড দেখতে পেলেন ওদের। 'তোমরা! তোমরা এখানে!' দুজনকে দুদিক থেকে জড়িয়ে ধরলেন তিনি। 'আমার বিশ্বাস হচ্ছে না!'

'জলদি গিয়ে কোনখান থেকে থানায় ফোন করো!' স্ত্রীকে বললেন মিস্টার মিলফোর্ড। 'আমি ততক্ষণ আটকে রাখছি এদের।' পিস্তলের নলটা আরও জোরে ঠেসে ধরলেন জেরিমোরের ঘাড়ে।

'বাবা, সব পালাচ্ছে তো!' চেঁচিয়ে উঠল রবিন।

'পালাক। কদ্দূর আর। পালের গোদাটাকে ধরেছি। হিড়হিড় করে টেনে আনা যাবে বাকিগুলোকে।'

ছুরিটা তুলে নিয়ে রওনা হয়ে গেলেন মিসেস মিলফোর্ড।

মুসার দিকে তাকিয়ে হাসলেন মিস্টার মিলফোর্ড, 'হাতের নিশানা তো মোটেও ভাল না তোমার।'

রবিন হেসে বলল, 'আমার নিশানা খারাপ বলে ওকে মারতে দিয়েছিলাম। কিন্তু ও...'

'সরি,' লাজুক হাসি হাসল মুসা। 'তাড়াহুড়ায়...'

'নিশানা যাই হোক,' মিলফোর্ড বললেন, 'আমাদের প্রাণ বাঁচিয়েছ, এটাই আসল কথা।'

কাছে এসে দাঁড়িয়েছে হানি। ওকে দেখিয়ে মুসা বলল, 'প্রাণ আসলে হানি বাঁচিয়েছে। ধন্যবাদ দিলে ওকে দেয়া উচিত।'

আলখেল্লা পরা বিশালদেহী এক লোক এগিয়ে এলেন ধীরে ধীরে। হানির বাবা। 'আমি ওদের ঠেকানোর অনেক চেষ্টা করেছি, মিস্টার মিলফোর্ড। পারিনি। সাংঘাতিক ভয় পেয়েছিলাম আমি। আমার নিজের জন্যে নয়। হানির জন্যে।'

'আপনি এর মধ্যে জড়ালেন কি করে, মিস্টার পারকিনস?' জানতে চাইলেন মিলফোর্ড।

ফোঁস করে একটা নিঃশ্বাস ফেললেন পারকিনস। 'শুরুতে জেরিমোরের কথা

বিশ্বাস করেছিলাম আমি। ওর আইডিয়াটা পছন্দ হয়েছিল। ভেবেছিলাম অপরাধ আর অপরাধীদের বিরুদ্ধে একটা জনমত গড়ে তুলতে চাইছে সে। কিন্তু জানতাম না বাইরে থেকে অস্ত্র চোরাচালান করে এনে জমা করবে ওরা। আইনকে নিজের হাতে তুলে নেবে। মানুষ খুন করবে। পরে বুঝলাম ওরা আসলে একধরনের সন্ত্রাসী। উগ্রপন্থী। তখন আর সরে আসার সাহস হলো না আমার। নিশ্চিত জানতাম, আমি ওদের বিরোধিতা করলে হানিকে খুন করবে ওরা।'

ভ্রূকুটি করল জেরিমোর। থু-থু ফেলল তুষারে। 'তুমি একটা আস্ত কাপুরুষ, পারকিনস। সাদা বানরের অভিশাপ তোমাকে ক্ষমা করবে না। অপঘাতে মারা যাবে তুমি।'

ওর কথায় কান দিল না কেউ।

দূরে পুলিশের সাইরেন শোনা গেল। মিসেস মিলফোর্ড নিশ্চয় ফোন করতে পেরেছেন।

জেরিমোরকে উঠে দাঁড়াতে বললেন মিলফোর্ড। পিস্তলের মুখে ওকে হাঁটতে বাধ্য করলেন। হাঁটতে হাঁটতে রবিনের দিকে তাকালেন, 'কেইন কোথায়?'

'ওকে···ওকে খুন করেছে···'

থমকে দাঁড়ালেন মিলফোর্ড। সরু হয়ে এল চোখের পাতা। 'বলো কি? ওর মত এজেন্টকে খুন করল! এফ বি আইয়ের খুব দামী এজেন্ট ছিল ও। আমি আর তোমার মা জেনে গিয়েছিলাম এই এলাকায় ব্রাদারহুডরা আস্তানা গেড়েছে। ওদের পেছনে লাগলাম একটা স্টোরি তৈরি করার জন্যে। কেইনের সাহায্য চেয়েছিলাম। ওকে আমাদের বাড়িতে ঢোকালাম। শুরু থেকেই ভয় ছিল আমার, ওর পেছনে লাগবে ব্রাদারহুডরা। তোমাকে নিয়েও ভয় ছিল আমার। আমার ওপর রেগে গিয়ে ওরা তোমাকেও খুন করে বসতে পারত।'

'শুধু কেইনকেই নয়, রস ডুগান নামে আরও একজনকে খুন করেছে,' মুসা বলল।

'ওকেও!'

'হ্যাঁ,' মাথা ঝাঁকাল রবিন। 'সে-ও কি এজেন্ট ছিল নাকি?'

'ছিল। খবরটা করার আগে গোপনে যোগাযোগ করেছিলাম আমার এক বন্ধুর সঙ্গে, এফ বি আইয়ের উচ্চ পর্যায়ের অফিসার। আমাকে সাহায্য করার জন্যে ওই দুজনকে পাঠিয়েছিল সে।'

'ব্রাদারহুডদের হাতে মারা যায়নি ওরা। ফিল কোহেন নামে এক লোক খুন করেছে দুজনকে।'

'কে? কোহেন?' মিলফোর্ডের কণ্ঠে অবিশ্বাস। আবার বললেন, 'কোহেন? এখানে? জেল থেকে বেরিয়ে এসেছে! এখানে কি ওর?'

'কে ওই লোক, বাবা?'

'পুলিশ ছিল। পুলিশ অফিসার। ঘুষখোর। ঘুষ খেয়েছে বলে একটা রিপোর্ট করেছিলাম ওর নামে। ড্রাগ স্মাগলারদের সঙ্গে সম্পর্ক ছিল। হাতেনাতে ধরিয়ে দিয়েছিলাম ওকে। জেল হয়েছিল। জেল থেকে বেরিয়ে নিশ্চয় আমার ওপর প্রতিশোধ নিতে এসেছিল। ও খুন করেছে কেইন আর ডুগানকে?'

'করেছে। আমার কাছে এসে বলল সে পুলিশের ক্যাপ্টেন। বিশ্বাস করেছিলাম।'

'কোথায় এখন ও?'

'আপনাদের গ্যারেজে আটকে রেখে এসেছি,' মুসা জানাল।

'আগেই পাগল ছিল,' বিড়বিড় করলেন মিলফোর্ড, 'এখন নিশ্চয় বদ্ধ উন্মাদ হয়ে গেছে। নিশ্চয় তার কাজে বাধা সৃষ্টি করেছিল কেইন আর ডুগান। দিয়েছে সরিয়ে। পাগলের কাছে আর কি আশা করা যায়?'

*

'সাদা বানরের অনুসারীদের ব্যাপারে স্টোরি করতে হলে ভেতরে ঢুকে যাওয়া ছাড়া উপায় ছিল না,' মিসেস মিলফোর্ড বললেন রবিনকে। 'তোমার বাবা বলল, ঢুকতে হলে ওদের সদস্য হওয়ার ভান করতে হবে। আমি সঙ্গে থাকলে ব্যাপারটা বিশ্বাসযোগ্য হবে বেশি। রাজি হলাম যেতে। তারপর তো এই বিপদ...'

মা-বাবাকে সঙ্গে নিয়ে বাড়ি ফিরেছে রবিন। মুসা আছে এখনও ওদের বাড়িতে।

কোহেনকে ধরে নিয়ে গেছে পুলিশ। ও স্বীকার করেছে, রবিনদের টেলিফোন লাইন বার বার নষ্ট করে দিয়েছে ও।

কেইন আর ডুগানের লাশ নিয়ে গেছে পুলিশ।

'এতদিন ছিলে কোথায় তোমরা?' জানতে চাইল রবিন।

'জেরিমোর আমাদের বিশ্বাস করেনি। পারকিনসদের বেসমেন্টে আটকে রেখেছিল। সভায় সবার সামনে আমাদের খুন করার প্ল্যান করেছিল সে।'

'কিন্তু হানির জন্যে পারল না,' বলে উঠল মুসা।

'হ্যাঁ,' মাথা ঝাঁকাল রবিন, 'এ যাত্রা ওর জন্যেই বেঁচে গেলে, মা। ও এসে আমাদের নিয়ে না গেলে জানতেও পারতাম না কোথায় আছ তোমরা। বাঁচানো তো দূরের কথা!'

'একটা প্রশ্ন,' আঙুল তুলল মুসা, 'আন্টি, সাদা বানরের খুলিটা আপনার ঘরে এল কি করে?'

'তোমার আঙ্কেল নিয়ে এসেছিল,' মিসেস মিলফোর্ড বললেন। 'ওটা হাতে পড়াতেই তো সাদা বানরদের কথা জানতে পারে রবিনের বাবা। খোঁজ-খবর শুরু করে। ওদের সদস্য হওয়ার পর জানলাম, প্রতিটি সদস্যকে একটা করে ওরকম খুলি উপহার দেয় ওরা। ব্রাদারহুডে যোগ দেয়ার সার্টিফিকেট।'

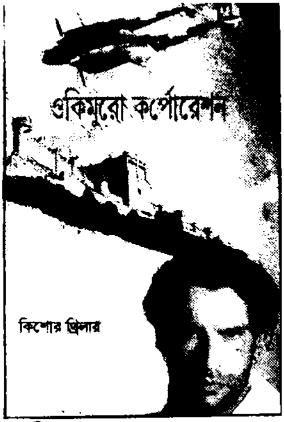

ওকিমুরো কর্পোরেশন

প্রথম প্রকাশ: ১৯৯৭

বুদ্ধিটা কিশোরের।

মেলা দেখতে গিয়েছিল তিন গোয়েন্দা। প্লেন ফেয়ার। অর্থাৎ বিমানের মেলা। সেই আদিমতম মডেল থেকে আধুনিক বিমান, প্রায় সব রাখা হয়েছিল বিশাল এলাকা জুড়ে। সে এক এলাহি কারবার। অনেক আগ্রহী গ্রাহকও জুটেছিল। অবিশ্বাস্য দাম দিয়ে কিনে নিয়ে গেছে দুর্লভ মডেলের একেকটা পুরানো বিমান, অ্যানটিক হিসেবে।

আইডিয়াটা তখনই মাথায় এসেছে কিশোরের। স্যালভিজ ইয়ার্ডের ব্যবসাটাকে চমৎকারভাবে আরও অনেক বাড়ানো যায়। পুরানো বাতিল গাড়ি, বাতিল বিমান কিনে সেগুলোকে সারিয়ে নিতে পারলে বেশি দামে বিক্রি করা সম্ভব। কেনার লোকের অভাব হবে না। ব্যক্তিগত সংগ্রহে রাখার বাতিকওয়ালা কোটিপতি তো আছেই, অনেক জাদুঘর আর এভিয়েশন ক্লাবও আছে, যারা ও ধরনের বিমান কিনতে আগ্রহী হবে।

মুসা আর রবিনের সঙ্গে আলোচনা করল কিশোর। ওদেরও পছন্দ হলো আইডিয়াটা। একটা ব্যাপারে তিনজনেই একমত হলো—এ কাজে সবচেয়ে বেশি সাহায্য যে করতে পারবে, সে ওমর শরীফ। সেই দুর্ধর্ষ অ্যাডভেঞ্চারপ্রিয় বেদুইন, পাইলট হিসেবে যার জুড়ি মেলা ভার।

প্লেন ছাড়া কিছু বোঝে না ওমর। পুরানো বিমানের ব্যবসা করলে প্রচুর বিমান ঘাঁটাঘাঁটি করতে পারবে, এই লোভে প্রস্তাবে রাজি হওয়ার ষোলো আনা সম্ভাবনা ওর, এ আশা নিয়েই তার সঙ্গে দেখা করল তিন গোয়েন্দা।

নিরাশ হতে হলো না ওদের। ওমর বলল, 'আমি ভাবছিলাম একটা ছোটখাটো এয়ার লাইন খুলব। কিন্তু তার জন্যে অনেক টাকা লাগে। চেষ্টা করলে টাকা জোগাড় করতে পারি। পার্টনার করতে হবে কোন কোটিপতিকে। কিন্তু যে সব শর্ত জুড়ে দেবে, সেগুলো মানা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। তাই যাচ্ছি না।'

'আমরাও কোন শর্ত-টর্তে যেতে চাই না,' কিশোর বলল। 'চারজনে মিলে প্রতিষ্ঠানটা গড়ব। গায়ে খাটব। লাভ-লোকসান সব আমাদের। ভাগাভাগি করে নেব।'

মুচকি হাসল ওমর, 'শুনতে তো ভালই লাগছে। কিন্তু টাকা? এত টাকা কোথায় পাব? কত আছে তোমাদের?'

'তিনজনের কাছে সব মিলিয়ে একটা বিমানের খোল কেনার পয়সা হয়ে

যাবে।'

হাসি বাড়ল ওমরের, 'অনেক টাকা। আমার কাছে যা আছে যোগ করলে হয়তো অনেক পুরানো একটা এক এঞ্জিনের ছোটখাট জিনিস কেনা যেতে পারে। কিন্তু এক বিমান দিয়ে তো আর এয়ার লাইন খোলা যায় না।'

'ওই একটা দিয়েই শুরু করব আমরা। উন্নতি হবেই।'

দীর্ঘ একটা মুহূর্ত কিশোরের দিকে তাকিয়ে রইল ওমর। তারপর মাথা দুলিয়ে বলল, 'এখন মনে হচ্ছে সত্যি হবে। তোমার আত্মবিশ্বাস আমার মধ্যেও ঢুকতে আরম্ভ করেছে। আমি রাজি। বলো, কি করতে হবে?'

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল তিন গোয়েন্দা।

'প্রথম প্রশ্ন,' কিশোর বলল, 'ঠিক করতে হবে, কোন ব্যবসাটা করতে যাচ্ছি আমরা? এয়ার লাইন? নাকি স্যালভিজ ইয়ার্ড?'

মুসা দিল জবাব, 'একসঙ্গে দুটোই। পুরানো বাতিল বিমান কিনে মেরামত করব। কিছু বিক্রি করব। আর ভাল দেখে কিছু রেখে দেব এয়ার লাইন চালানোর জন্যে।'

'তুমি তো দেখি আরেক কাটি বাড়া,' হাসল ওমর। কথাটা ভেবে দেখল।

একমত হয়ে মাথা ঝাঁকাল কিশোর। রবিনের দিকে তাকাল, 'তোমার কিছু বলার আছে?'

'না,' মাথা নাড়ল রবিন। 'আমার মনে হয় কোম্পানির নামটাও ঠিক করে ফেলা যায়।'

'বাহ্, কারও আর তর সইছে না,' কিশোরের দিকে তাকাল ওমর। 'কিছু ভেবেছ?'

মাথা কাত করল কিশোর, 'ভেবেছি। ওকিমুরো কর্পোরেশন।'

'খাইছে!' অবাক হলো মুসা, 'দুনিয়ায় এত নাম থাকতে এই জাপান প্রীতি কেন?'

'তাই তো,' তর্জনী নাচাল ওমর। 'আমাদের একজনও জাপানী নই। এ রকম নাম রাখতে যাব কেন?'

রবিন বলল, 'জাপানীদের হু-হু করে উন্নতি দেখে হয়তো রাখতে চাইছে। ভাবছে, জাপানী নাম রাখলে আমাদেরও ওরকম হবে।'

'উঁহু,' মাথা নাড়ল কিশোর, 'শুনতে জাপানী নামের মত মনে হলেও আসলে তা নয়। এটা পুরোপুরি ইংরেজি।'

'তোমার এই নাটকীয়তা ভাল লাগে না,' অধৈর্য ভঙ্গিতে হাত নাড়ল মুসা। 'পরিষ্কার করে বলো।'

'খুব সহজ। রবিন, নোটবুক বের করো। ইংরেজিতে বানান করে লেখো তো দেখি।'

নোটবুক আর কলম বের করে লিখল রবিন: OKIMURO CORPORATION. বাড়িয়ে দিল কিশোরের দিকে। 'হয়েছে?'

মাথা ঝাঁকাল কিশোর। 'এখন আমাদের চারজনের নাম বানান করে লেখো। শুধু ফার্স্ট নেম।'

আবার লিখল রবিন: KISHORE, ROBIN, MUSA, OMAR.

'গুড। এবার চারটে নাম এমন ভাবে আগে-পরে করে সাজাও, যাতে ওমর ভাইয়ের নামটা প্রথমে থাকে। যেহেতু তিনি আমাদের সবার বড়, তাঁকে এই সম্মানটা দিতেই হবে। তারপর তিন গোয়েন্দার কার্ডে যে ভাবে সিরিয়ালি আমাদের নাম লেখা থাকে, ওভাবে লেখো।'

লিখল রবিন: OMAR, KISHORE, MUSA, ROBIN. হাসি ফুটল মুখে। মাথা দুলিয়ে বলল, 'বুঝে ফেলেছি। চমৎকার! ওমরের O, কিশোরের KI, মুসার MU, এবং রবিনের RO। যোগ করলে হয়ে যাচ্ছে...'

'OKIMURO!' রবিনের কথাটা শেষ করে দিল ওমর। 'বিউটিফুল!'

'আপনার পছন্দ হয়েছে?' জিজ্ঞেস করল কিশোর।

'খুব সুন্দর।'

মুসার দিকে তাকাল কিশোর, 'তোমার?'

'তিনটে ভোটই তো তোমার পক্ষে,' হাত নাড়ল মুসা। 'আমি ভেটো দিলেই বা কি হবে?'

'সব সময় খালি ঘুরিয়ে কথা বলার অভ্যাস। পছন্দ হয়েছে কিনা তাই বলো।'

'হাজার বছর গবেষণা করলেও আমি এত কিছু মিলিয়ে এমন একটা নাম রাখতে পারতাম না।'

'বেশ, তাহলে নাম আমাদের সবারই পছন্দ হয়েছে। বাকি রইল অফিস। সেটা কোথায় হবে?'

ওমর বলল, 'নিশ্চয় সে ব্যাপারেও কিছু চিন্তা করে রেখেছ?'

নিচের ঠোঁট কামড়াল কিশোর, 'রকি বীচের ধারে যে পুরানো এয়ার পোর্টটা আছে, বিশ্বযুদ্ধের সময় ব্যবহার করা হত, সেটাতে জায়গা ভাড়া নিয়ে ছাউনি তুলতে পারি আমরা। তাহলে রানওয়েটাও ব্যবহার করতে পারব। ছাউনিতে রাখব শুধু মেরামত করা ভাল জিনিসগুলো। বাতিল মাল কিনে আগে আমাদের ইয়ার্ডে নিয়ে যাব। একদিকের জঞ্জাল সব সাফ করে নিলেই হবে, জায়গা বেরিয়ে যাবে। চাচার পাশা এজেন্সির অফিসটাকে অফিস হিসেবে ব্যবহার করতে পারব, তবে সেটা আপাতত। পরে ব্যবসা জমে গেলে নিজেদের অফিস করে নেব আমরা। বলা যায় না, কোন একদিন প্রাইভেট এয়ার পোর্ট আর রানওয়েও হয়ে যেতে পারে।'

'উচ্চাকাঙ্ক্ষা থাকা ভাল,' মুসা বলল। 'কবে থেকে শুরু করছি আমরা?'

'সিদ্ধান্ত যখন নিয়ে ফেলেছি, দেরি করে লাভ কি? আজ থেকেই।'

চালু হয়ে গেল ওকিমুরো কর্পোরেশন।

বড় রকমের প্রথম সাহায্যটা এল বিখ্যাত চিত্রপরিচালক ডেভিস ক্রিস্টোফারের কাছ থেকে। এক সকালে তিন গোয়েন্দাকে তাঁর অফিসে ডেকে পাঠালেন তিনি। সঙ্গে অবশ্যই ওমরকে নিয়ে যেতে বললেন।

নিশ্চয় অ্যাসাইনমেন্ট! ওমরকে যখন সঙ্গে নিতে বলেছেন, সন্দেহ নেই বড় ধরনের কোন কেস। দুরুদুরু বুকে রওনা হলো গোয়েন্দারা। রাজকীয় রোলস রয়েসে করে হলিউডে, পরিচালকের অফিসে ওদের নিয়ে চলল ইংরেজ শোফার

হ্যানসন।

দুই

'ইনি জেনারেল হেনরি কাস্টার,' পরিচয় করিয়ে দিলেন পরিচালক। 'একটা বিপদে পড়েছেন। ভাবছেন, আমরা তাঁকে সাহায্য করতে পারব।'

'আমাদের সাধ্যমত চেষ্টা করব আমরা,' ওমর বলল। 'বিপদটা কি?'

'তাঁর ছেলেকে হারিয়েছেন জেনারেল, একমাত্র ছেলে।'

'মারা গেছে নাকি? সরি···'

'মারা গেছে কিনা সেটা জানা যায়নি, তবে সেরকমই সন্দেহ করছেন জেনারেল। প্লেন নিয়ে বেরিয়ে আর ফিরে আসেনি।'

'প্লেনটা পাওয়া গেছে?'

'না। কিছুই পাওয়া যায়নি।'

'কোথায় গেছে ও, উনি জানেন?'

'হ্যাঁ।'

'তাহলে আর কি। খুঁজে বের করে ফেলা যাবে।'

মাথা নাড়লেন পরিচালক, 'যতটা সহজ ভাবছ ততটা নয়।'

'কেন? খুব দুর্গম কোন অঞ্চলে গেছে নাকি?'

'লিবিয়ান ডেজার্টের দক্ষিণ অঞ্চলে।'

'হুঁম্!' মাথা দোলাল ওমর, 'খারাপ জায়গা। খুব খারাপ।

জেনারেল বললেন, 'মনে হচ্ছে মরুভূমিটা আপনি দেখেছেন।

মুচকি হাসল ওমর, 'মিস্টার ক্রিস্টোফার তাহলে বলেননি, আমার বাড়িই মিশরে।'

'তাই! এ জন্যেই আমি সাহায্য চাইতে এলে আপনাকে ডেকে এনেছে ডেভিস। কতটা খারাপ জায়গা, বলুন তো?'

'কল্পনাও করতে পারবেন না। তবু একটা ধারণা দেয়ার চেষ্টা করি। পারতপক্ষে কোন পাইলট প্লেন নিয়ে ওদিকে যেতে চায় না। এঞ্জিনের গোলমাল কিংবা অন্য কোন কারণে বালিতে নামতে বাধ্য হলে ধরে নিতে হবে নিশ্চিত মৃত্যু।'

'কিন্তু আমি তো শুনেছি মরুদ্যান আছে ওদিকে। মরুভূমির মাঝখানে আছে প্রাচীন সভ্যতার ধ্বংসাবশেষ বসবাসের অযোগ্যই যদি হবে, ওসব গড়ে উঠেছিল কি করে ওখানে?'

'সব শোনা কথা, প্রমাণ পাওয়া যায়নি এখনও। ওই গুজব শুনে যারা দেখতে গেছে, তাদের অধিকাংশই ফেরত আসেনি। দু'চারজন যাও বা এসেছে, বেশির ভাগ পাগল হয়ে গেছে, তাদের কাছ থেকে পরিষ্কারভাবে কিছু জানা যায়নি। স্থানীয় লোকেরা বলে, ওই মরুভূমির মাঝখানে মানুষ বাস করতে পারে না, পারে কেবল শয়তান।'

'যত্তসব কুসংস্কার!'

'আমারও তাই ধারণা। মরুভূমির মাঝে সভ্যতার নিদর্শন দেখে এসে প্রথম ঠিকমত জানাতে পেরেছে একজন ফ্রেঞ্চ পাইলট, উনিশশো পঁচিশ সালে। হাবুবে পড়ে কোর্স থেকে সরে গিয়েছিল সে...'

'হাবুব কি?'

'মরুঝড়। ওখানকার আঞ্চলিক নাম। ফিরে এসে বলেছে, গভীর মরুভূমির মাঝখানে একটা মরুদ্যান দেখে এসেছে। কিন্তু সে সম্পর্কে বিস্তারিত বলার আগেই অ্যাক্সিডেন্টে মারা যায় বেচারা। তার কথা শুনে স্যার রবার্ট ক্লেটন নামে একজন অভিযাত্রী দেখতে যান সেই মরুদ্যান। ছবি তোলেন। দেখে তাঁর মনে হয়েছে গাছ জন্মানোর উপযোগী জমি রয়েছে ওখানে। আবার যাওয়ার জন্যে তৈরি হচ্ছিলেন, এই সময় হঠাৎ করে মারা গেলেন তিনিও। তাঁর মৃত্যুটাও রহস্যজনক। জায়গাটার বদনাম আছে। ওখানে কেউ যেতে চাইলেই নাকি তার অ্যাক্সিডেন্ট ঘটে। তবে সেটাও কুসংস্কার।' জেনারেলের দিকে তাকাল ওমর, 'ওরকম একটা বাজে জায়গায় আপনার ছেলের যাওয়ার কারণটা কি?'

'সব খুলেই বলি,' জেনারেল বললেন। 'সে এক দীর্ঘ কাহিনী। যতটা সম্ভব ছোট করে বলছি শুনুন।'

ভাল করে শোনার জন্যে চেয়ারে হেলান দিয়ে আরাম করে বসল ওমর। তিন গোয়েন্দার কেউ হেলান দিয়ে, কেউ হাতলে ভর দিয়ে তাকিয়ে আছে জেনারেলের দিকে। পরিচালকের চোখেও আগ্রহ।

'আমার ছেলে পলের বয়েস একুশ,' শুরু করলেন জেনারেল। 'বয়েসটা জানানো জরুরী। কারণ সে আর আমার কন্ট্রোলে নেই। ওর মা মারা গেছে কয়েক বছর হলো। প্রচুর টাকা রেখে গেছে ওর জন্যে। মৃত্যুর আগে উইল করে স্বাধীন করে দিয়ে গেছে ছেলেকে। সোজা কথায়, যা খুশি তাই করতে পারবে ও। আমার বাধা দেয়ার অধিকার থাকবে না।'

'আপনার কথা থেকে বোঝা যাচ্ছে ক্ষমতাটা সে পুরোপুরি ব্যবহার করেছে,' শুকনো গলায় বলল ওমর।

'না, তা নয়, ও খুব ভাল ছেলে। পড়াশোনায় ভাল। কিছু করার আগে আমাকে জিজ্ঞেস করত, আমার ইচ্ছের বিরুদ্ধে কিছু করত না। শেষে একটা ব্যাপারে মতবিরোধ দেখা দিতেই শুরু হলো গণ্ডগোল।'

'নিশ্চয় জোর করে আপনি কিছু চাপাতে গিয়েছিলেন ওর ওপর?'

'অনেকটা তাই। আমাদের বংশটাই মিলিটারির বংশ। আমার বাবা ছিলেন সামরিক বাহিনীতে। আমার দাদা, দাদার বাবা সবাই সৈনিক, আমিও তাই; স্বাভাবিক ভাবেই আমি চাইছিলাম আমার ছেলেও আর্মিতে ঢুকুক। আমার বিশ্বাস ঢুকতও, কয়েকটা ঘটনা যদি ঘটে না যেত—ওই যে বলে না অসৎ সঙ্গে সর্বনাশ, ওর বেলায়ও ঘটেছে তাই। ওর একটা বড় দোষ, অন্যের কথায় প্রভাবিত হয়। প্লেনে করে উড়তে গিয়ে একদিন আমার বাড়ির সীমানায় ফোর্স ল্যাণ্ডিং করতে বাধ্য হয় এক পাইলট, পলের সর্বনাশের সেদিন থেকেই শুরু। কয়েকদিন আমাদের বাড়িতে ছিল লোকটা। ওই কদিন ফ্লাইং ছাড়া আর কোন কথা হয়নি পলের সঙ্গে

ওর।'

মুচকি হাসল ওমর, 'পাইলটের সঙ্গে এ ছাড়া হবেই বা আর কি?'

'আমাকে এসে বলল পল, ও বৈমানিক হবে, সৈনিক নয়। খুব খারাপ লাগল আমার। প্রথমে বোঝানোর চেষ্টা করলাম। তারপর বাধা দিলাম। আমার বাধা মানল না ও। ফ্লাইং স্কুলে ভর্তি হলো। একটা প্লেন কিনে ফেলল। ক্লাস আর ঘুমানোর সময় বাদে বাকি সময়টা কাটাতে লাগল আকাশে উড়ে উড়ে।'

'প্লেনটা কোন্ ধরনের?'

'তা তো বলতে পারব না। তবে ছোট জাতের, এক এঞ্জিন। কাব না কি যেন বলতে শুনেছি ওকে।'

বিস্ময় দেখা দিল ওমরের চোখে, 'এই জিনিস নিয়ে উত্তর আফ্রিকায় পাড়ি জমিয়েছে ও?'

'হ্যাঁ।'

ভ্রূকুটি করল ওমর।

'কেন?' প্রশ্ন করলেন জেনারেল, 'তাতে কি কোন অসুবিধে আছে?'

'আছে। পুরানো মডেলের জিনিস, নিশ্চয় সেকেণ্ডহ্যাণ্ড কিনেছে। হালকা। প্র্যাকটিস করার জন্যে খুব ভাল। কিন্তু এ জিনিস নিয়ে লিবিয়ার মরুভূমি পাড়ি দেয়ার চেষ্টাকে দুঃসাহস ছাড়া আর কি বলা যায়। যাই হোক, আপনি বলুন।'

জেনারেল বললেন, 'মিডল ইস্টে চাকরি করার সময় প্রফেসর রালফ জেলিমেয়ারের সঙ্গে পরিচয় হয় আমার। নামটা শুনেছেন হয়তো...'

কিশোর বলে উঠল, 'বিখ্যাত আর্কিওলজিস্ট?'

তার দিকে তাকিয়ে ভুরু কোঁচকালেন জেনারেল, 'কোথায় জানলে?'

'পত্রিকায়।'

'জর্ডানের এক ধ্বংসাবশেষে বহুদিন খননকাজ চালিয়েছেন,' বলল রবিন।

হাসলেন জেনারেল। 'বাহ্, পড়াশোনা ভালই করো তোমরা। ইনটেলিজেন্ট ইয়াং ম্যান। তোমাদের ওপর দায়িত্ব দিয়ে নিশ্চিন্ত হওয়া যাবে। যাই হোক, সেই লোক কিছুদিন আগে হঠাৎ করে আমার বাড়িতে এসে হাজির। গরমকালে ভয়াবহ গরমের জন্যে খনন চালানো অসম্ভব হয়ে পড়ে। সেসময়টা তাই ছুটি কাটান প্রফেসর। এবার এসেছিলেন আমেরিকায়। বহুদিন আগেই আমন্ত্রণ জানিয়ে রেখেছিলাম তাঁকে। এসে উঠলেন আমার বাড়িতে। আমার চেয়ে বেশি খাতির হয়ে গেল পলের সঙ্গে। ওর স্বভাবই এমন। নতুন লোক দেখলেই তার সঙ্গে আলাপ করার জন্যে ব্যস্ত হয়ে ওঠে। পাইলটের সঙ্গে যেমন বিমান নিয়ে আলোচনায় মেতে থাকত, প্রফেসরকে পেয়ে তাঁর সঙ্গে চলল কেবল প্রত্নতত্ত্বের আলোচনা। তাঁর ভক্ত হয়ে গেল। এতই উৎসাহী হয়ে উঠল, প্রফেসরের সঙ্গে চলে গেল তাঁর খননের জায়গা দেখতে। নিজের প্লেনে করে তাঁকে উড়িয়ে নিয়ে গেল জর্ডানে। মাটি খুঁড়ে তোলা হাজার বছরের পুরানো হাঁড়িপাতিল দেখে প্রফেসরের মতই উত্তেজিত হয়ে পড়ল সেও। প্রত্নতত্ত্ব শেকড় গাড়ল মগজে। ফেরার সময় সঙ্গে করে নিয়ে এল আরেকজনকে।'

'নাটকের তৃতীয় চরিত্র,' আনমনে বিড়বিড় করল ওমর।

'হ্যাঁ, তৃতীয় চরিত্র। আরেকজন আর্কিওলজিস্ট। জর্ডানে পলের সঙ্গে পরিচয়। এমন করে কথা বলে যেন দুনিয়ার তাবৎ বিষয় তার নখদর্পনে। নাম জানাল হুরুম ওয়াজিন্দার। বয়েস তিরিশ। বাড়ি নাকি মিশরে। তবে দেখে কিছু বোঝা যায় না। এশিয়ার যে কোনও দেশের লোক বলে চালান করে দেয়া যায়। চমৎকার ইংরেজি বলতে পারে।'

'মনে হচ্ছে তাকে আপনি পছন্দ করতে পারেননি?'

'না, পারিনি। কেন সেটা বোঝাতে পারব না। তবে আমি একবিন্দু বিশ্বাস করি না ওই লোককে। বেশি ভদ্র, বেশি মোলায়েম করে কথা বলে—ওই যে তেলতেলে স্বভাবের মানুষ থাকে না একধরনের, ওরকম।'

'বুঝতে পারছি। একটা কথা জিজ্ঞেস করি, কিছু মনে করবেন না। শ্বেতাঙ্গদের অহমিকা নেই তো আপনার মধ্যে—কালো দেখলে নাক সিটকানোর স্বভাব?'

জোরে জোরে মাথা নাড়লেন জেনারেল। 'একটুও না। প্রচুর নিগ্রো আর ইণ্ডিয়ান বন্ধু আছে আমার,' চট করে মুসার দিকে তাকিয়ে নিলেন তিনি একবার। 'সারা জীবন বিদেশীদের সঙ্গে কাটিয়েছি। এতটা নাক উঁচু হলে পারতাম না।'

'লোকটাকে যে পছন্দ হয়নি, আপনার ছেলেকে বলেছেন এ কথা?'

'বলেছি। ও কানে তোলেনি। তার ধারণা হুরুমের মত লোক হয় না। অনেক কাজে পারদর্শী। কথা বোধহয় বেশি বলে ফেলছি, তাই না? আসলে সব তথ্যই জানিয়ে রাখতে চাইছি আপনাদের কাজের সুবিধের জন্যে। যাই হোক, লোকটা জানিয়েছে সে নাকি মিডল ইস্টের আর্কিওলজি আর হিস্টরিতে আগ্রহী। ইজিপশিয়ান আর্কিওলজিক্যাল সোসাইটিতে কাজ করেছে। সিওয়া নামে এক মরুদ্যানে গিয়েছিল প্রাচীন নিদর্শন খোঁজার জন্যে। ওখানে এক অসুস্থ আরবী লোকের সেবা করে সুস্থ করে তুলেছিল। পুরস্কার হিসেবে বুড়োর কাছ থেকে শুনেছিল এক অদ্ভুত কাহিনী। আমার ধারণা এই কাহিনীর সঙ্গে পলের নিরুদ্দেশের সম্পর্ক আছে।'

'আপনি বলতে চাইছেন, কিছু খুঁজতে গেছে পল আর হুরুম?'

'হ্যাঁ।'

'কোথায়, কিছু অনুমান করতে পারেন?'

'বুড়ো হুরুমকে যা বলেছিল সেটা আগে শুনুন। সাহারার দক্ষিণ অঞ্চলে সিওয়ার কাছাকাছি কোনখানে আরেকটা মরুদ্যান আছে, ম্যাপে যেটার অস্তিত্ব নেই। এমন হতে পারে, মরুদ্যানটা এখন মরে গেছে, সেজন্যেই দেখানো হয়নি। ওটা রয়েছে বিশাল এক খাদের মধ্যে কোন এক পর্বতের গোড়ায়। এককালে হ্রদ ছিল খাদটা। ওই পর্বতে নাকি আছে বহুকাল আগে হারিয়ে যাওয়া অচেনা এক সভ্যতার ধ্বংসাবশেষ। ওখানে আছে দুর্ধর্ষ টুয়ারেগ উপজাতির রাজা রাস টেনাজার কবর। কবরের কাছে পান্নার খনি, যেখান থেকে প্রচুর মূল্যবান পাথর সংগ্রহ করেছিল রাজা। সেসব কবর দেয়া হয়েছে তার সঙ্গে। পাথরের স্তূপ দিয়ে কবর চিহ্নিত করা হয়েছে। লম্বা, হেলে থাকা একটা পাথরের গোড়ায় রয়েছে কবরটা। ইচ্ছে করেই নাকি ওই পাথরের গোড়ায় কবর দেয়া হয়েছে যাতে পাথর

ধসে পড়লে তার নিচে চাপা পড়ে হারিয়ে যায় ওটা। আশপাশে আরও কবর আছে, কোন কোনটা চিহ্নিত করা। পল এই কাহিনী গোগ্রাসে গিলেছে, কিন্তু আমি এর একবর্ণও বিশ্বাস করিনি।'

'কেন করেননি?'

'আপনি করেছেন?'

ঘুরিয়ে জবাব দিল ওমর, 'অনেক উদ্ভট ঘটনা ঘটেছে সাহারাতে, আজব আজব জিনিস আবিষ্কৃত হয়েছে। আরও একটা হলে অবাক হব না। জায়গাটা কোনখানে বলেছে হুরুম, মিশরে না লিবিয়ায়?'

'ঠিক জানে না ও। সিওয়া পড়েছে মিশরীয় সীমান্তের ভেতরে। তার ধারণা মরুদ্যানটা আছে সীমান্ত আর সিওয়ার মাঝে দু-তিনশো মাইলের মধ্যে, দক্ষিণে অথবা পশ্চিমে। আমি তাকে বললাম, সে যদি এতই শিওর হয় যে ধ্বংসাবশেষটা আছে ওখানে, তাহলে গিয়ে আবিষ্কার করে কৃতিত্বটা নিজে নিয়ে নিচ্ছে না কেন? জবাব দিল, উটের মিছিল নিয়ে এ ধরনের অভিযানে যাওয়া অনেক খরচের ব্যাপার। তার অত টাকা নেই। বললাম, মিশরীয় কিংবা লিবিয়ান সরকারকে জানাচ্ছে না কেন? তাহলে ওরাই তো খরচ দেবে।'

'কি বলল?'

'বলল তাহলে এ থেকে কিছুই পাবে না সে।'

'এমনিতে নিজে নিজে গিয়ে আবিষ্কার করলেও কিছু পাবে না, সামান্য কমিশন ছাড়া। আইন হলো, যে দেশে পাওয়া যাবে, প্রত্নতাত্ত্বিক আবিষ্কারের সমস্ত জিনিস ওই দেশের সরকার নিয়ে নেবে। এই আইন খুব কড়াকড়ি ভাবে পালিত হচ্ছে আজকাল। শর্ত মেনে নিয়েই খোঁড়াখুঁড়ি করতে যাচ্ছে প্রত্নতাত্ত্বিকরা।'

'আমি এ কথা জানতাম না। পল জানে কিনা তাতেও সন্দেহ আছে আমার।'

'সত্যি সত্যি আর্কিওলজিস্ট হলে এটা নিশ্চয় জানে হুরুম। পলের কাছে গোপন করে থাকলে তার অসৎ উদ্দেশ্য আছে। দামী দামী জিনিস যা পাবে সেগুলো সরকারের কাছে জমা না দিয়ে নিজে মেরে দেবার ইচ্ছে।'

'তার কথায় এই সন্দেহটাই করেছি আমি। যা পাওয়া যাবে তার অর্ধেক পলকে দিয়ে দেয়ার অঙ্গীকার করেছে। মনে হয় না পল জিনিসের ব্যাপারে আগ্রহী, ও চেয়েছে একটা দুর্দান্ত অ্যাডভেঞ্চার। যাই হোক, আগের কথায় আসি। হুরুম বলেছে, প্লেনে করে ওখানে উড়ে যাওয়াটা সবচেয়ে সহজ। প্রথমে যাবে উপকূলীয় শহর মার্সা ম্যাট্রুতে, ওখান থেকে সিওয়ায়। ল্যাণ্ডিং গ্রাউণ্ডও নাকি আছে, নামতে অসুবিধে হবে না।'

'আছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ব্যবহার হয়েছিল।'

'আমি জানতে চাইলাম, মরুভূমিতে ওড়াওড়ি করার জন্যে ভিসা আর বিশেষ অনুমতি লাগে। সেসব? ও বলল, ওগুলো জোগাড় করা কোন ব্যাপারই নয়।'

'সুতরাং ওরা চলে গেল?'

'হ্যাঁ। পুরো ব্যাপারটাই আমার কাছে বোকামি আর ভয়ানক বিপজ্জনক মনে হয়েছে। কিন্তু ঠেকাতে পারিনি।'

'কতদিন আগের ঘটনা এটা?'

'দুই মাস।'

'এরপর ওদের কোন খোঁজ পেয়েছেন?'

'পেয়েছি, তবে ওদের কাছ থেকে নয়। পল বলে গিয়েছিল ফিরতে একমাসের বেশি দেরি করবে না। নিয়মিত খবর পাঠাবে। মার্সা ম্যাট্রু থেকে লিখেছিল নিরাপদেই পৌঁছেছে ওখানে। পরদিন সিওয়া রওনা হবে। সেখান থেকে ম্যাপে চিহ্নিত একসারি মরুদ্যান ধরে ক্রমশ দক্ষিণে সরে যাবে। মাসখানেক আর কোন খোঁজ পেলাম না। উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলাম। আরও এক হপ্তা অপেক্ষা করে আমেরিকায় মিশরীয় দূতাবাসে গিয়ে যোগাযোগ করলাম। সব কথা খুলে বললাম। খুব সহযোগিতা করল ওরা। দ্রুত খোঁজ নেয়ার ব্যবস্থা করল। জানা গেল পলের প্লেনটার মত একটা প্লেন দেখা গেছে সিওয়াতে। তিন দিন ওখানে থেকে চলে গেছে। কোথায় গেছে কাউকে বলে যায়নি। বুঝলাম, বেআইনী ভাবে গেছে। ভিসা আর অনুমতি নিলে স্পষ্ট করে লিখতে হত কোথায় কতদিনের জন্যে যাচ্ছে। আরও একটা তথ্য জানলাম, যাতে দুশ্চিন্তা অনেক বেড়ে গেল আমার। হুরুম বলেছিল সে ইজিপশিয়ান আর্কিওলজিক্যাল সোসাইটিতে কাজ করেছে। কিন্তু ওখানকার অফিস জানাল, ওই নামের কেউ কখনও ওদের ওখানে ছিল না। তারমানে শুরু থেকেই লোকটার ওপর যা সন্দেহ ছিল আমার, সেটাই ঠিক হলো, ও একটা মিথ্যুক। ভাবতে লাগলাম কি করি? একবার মনে হলো একটা প্লেন ভাড়া করে চলে যাই সিওয়াতে। তারপর মনে হলো আমি একা গিয়ে কোন সুবিধে করতে পারব না। এমন কারও যাওয়া দরকার, যে ওই এলাকা চেনে। এক পার্টিতে দেখা হলো ডেভিসের সঙ্গে। কথায় কথায় আমার দুঃখের কথা বললাম ওকে। ও সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিল। সেজন্যেই আজ আমি এখানে হাজির হয়েছি।'

অনেকক্ষণ চুপচাপ থাকার পর মুখ খুললেন চিত্রপরিচালক। ওমরের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'সব তো শুনলে। কি মনে হয় তোমার? পলের বেঁচে থাকার সম্ভাবনা কতখানি?'

সন্দেহ ফুটল ওমরের চোখের তারায়, 'ঠিক কোনখানে গেছে ও, রসদপত্র কতখানি কি নিয়ে কিভাবে তৈরি হয়ে গেছে না জেনে বলা মুশকিল। সাহারায় এমন দুর্গম জায়গাও আছে, যেখানে কয়েক হাজার মাইলের মধ্যে কোন মরুদ্যান নেই, একটি ক্যারাভানের চিহ্ন চোখে পড়বে না। উত্তরে সিওয়া, দক্ষিণে জিলফ কেবির মালভূমি আর পুবে খারগা মরুদ্যান। ম্যাপে দেখানো আছে, বিশাল ওই এলাকার মধ্যে কেবল এল আরিগ নামে একটা জায়গায় রয়েছে একটি মাত্র ওয়াটার-হোল, যাতে পানি পাওয়া যায়। পলের প্লেনটা ওখানে কোথাও পড়ে গিয়ে থাকলে খুঁজে বের করতে একশো বছর লেগে যাবে।'

'আমার ধারণা, পল যেখানে যেতে চেয়েছে সেই জায়গাটা সিওয়ার আশপাশেই কোথাও,' জেনারেল বললেন। 'খুঁজতে হলে এর কাছাকাছিই খোঁজা উচিত।'

পরিচালক বললেন, 'জেনারেলকে আমি বলেছি এটা বিরাট খরচের ব্যাপার। কত খরচ হবে, জানতে চেয়েছেন তিনি। অবশ্য তোমরা যদি পলকে খুঁজতে যেতে

রাজি না থাকো, তাহলে আর এ সব আলোচনা করে লাভ নেই।'

কিশোরের দিকে তাকাল ওমর। চোখে চোখে কথা হয়ে গেল দুজনের। জেনারেলকে বলল ওমর, 'কিছু বলার আগে আমরা নিজেরা একটু আলোচনা করে নিতে চাই। কাল এ সময়ে আপনাকে জানাব।'

পরিচালকের দিকে তাকালেন জেনারেল। তারপর ওমরের দিকে ফিরলেন। গম্ভীর স্বরে বললেন, 'ঠিক আছে। তবে অনুরোধ করছি, "না" বলবেন না। আপনাদের সব রকম সাহায্য দিতে রাজি আছি আমি। শুধু আমার ছেলেকে খুঁজে এনে দিন।'

তিন

মনে হচ্ছে চকচকে ইস্পাত রঙের আকাশের নিচে ঝুলে রয়েছে খেজুরগাছগুলো। গায়ে যেন হাতুড়ির বাড়ি মারছে ভয়াবহ উত্তাপ। কুচকুচে কালো সানগ্লাসের ভেতর দিয়ে দূরে তাকিয়ে আছে রবিন। মাথায় সবুজ কানাওয়ালা সান হ্যাট। প্রচণ্ড রোদ থেকে চোখ বাঁচানোর জন্যে পরতে হয়েছে এ সব।

বিশাল এক গর্তের কিনারে গজিয়ে উঠেছে এই এল আরিগ মরুদ্যান—সভ্যজগতের শেষ চিহ্ন। এরপর যতদূর চোখ যায় শুধুই বালি আর বালি। ভয়াল এক বালির সমুদ্র, শূন্য, নিস্তব্ধ, বৈচিত্র্যহীন। ছায়া নেই কোথাও, পানি নেই, নেই প্রাণের কোন চিহ্ন। একনাগাড়ে তাকিয়ে থাকলে পীড়া দেয় চোখে। দিগন্তে জ্যান্ত প্রাণীর মত নাচানাচি করছে গরম বাতাস, দেখা যায়।

বই পড়ে অনেক কিছুই জেনেছে রবিন। দূর থেকে সমান মনে হলেও সে জানে দিগন্ত বিস্তৃত ওই বালিরাশির ওপরটা মোটেও সমতল নয়। বাতাসে ক্রমাগত গড়াতে থাকে বালি, সাগরের ঢেউয়ের মতই সৃষ্টি করে বালির ঢেউ। সাহারার এই ভয়াবহ অঞ্চলের আরেক নাম ল্যাণ্ড অভ ডেভিলস বা শয়তানের এলাকা। মরুভূমির সবচেয়ে দুর্ধর্ষ বেদুইন উপজাতি টুয়ারেগরাও পারতপক্ষে এদিকে ঘেঁষতে চায় না। ওরা বলে, এখানে মানুষ তো দূরের কথা, কোন প্রাণীই বাস করতে পারে না, শয়তান ছাড়া।

এখান থেকে দেখা না গেলেও ওর জানা আছে দিগন্তের ওপারে বালি ফুঁড়ে গজিয়ে উঠেছে চারশো মাইল লম্বা এক কালো পাথরের পর্বত। তাতে রয়েছে অসংখ্য গিরিখাত, কবরের নীরবতা বিরাজ করে সেগুলোতে। বাতাসে ওড়ে বালির কণা। অনবরত সেসবের ঘর্ষণে ক্ষয়ে যায় পর্বতের চূড়া, পর্বতের গা থেকে আলাদা হয়ে গিয়ে বিশাল পাথরের স্তম্ভের মত দাঁড়িয়ে থাকে, দূর থেকে মনে হয় যেন কোন দৈত্যের ভেঙে যাওয়া পচা কালো দাঁতের গোড়া।

বিরাট গর্তের মত নিচু জায়গা আছে অনেক। গর্তের চেহারা দেখে মনে হয় প্রকাণ্ড বাটি দিয়ে চেপে দাবিয়ে দেয়া হয়েছে বালি। সমুদ্র-সমতল থেকে শত শত ফুট নিচু সেসব গর্তের তলায় বালি নেই, আছে শুকিয়ে পাথরের মত শক্ত হয়ে যাওয়া কাদা, এককালে হ্রদ কিংবা জলাশয় ছিল ওগুলো। কিছু হ্রদ এখনও টিকে

আছে, পানি লবণাক্ত, অবাক করা সৌন্দর্য ওগুলোর। হয়তো আশপাশের বিবর্ণ রুক্ষতার মধ্যে ঠাঁই নিয়েছে বলেই এত সুন্দর লাগে। তবে পাহাড়ের কোন সৌন্দর্য নেই, আছে শুধুই বালি আর পাথর।

অনেক ইতিহাস লুকিয়ে আছে সাহারার ওই বালির নিচে। খ্রীষ্টপূর্ব ৫২৫ সালে পারস্যের শাসনকর্তা সাইরাসের ছেলে ক্যামবিসেস মিশর দখল করে। মন্দিরের দেবদেবীর মূর্তি ধ্বংস করার জন্যে খেপে ওঠে সে। সামনে যা পায় ভেঙেচুরে তছনছ করে। তারপর মিশরের খারগা মরুদ্যান থেকে সিওয়া রওনা হয় ওখানকার বিখ্যাত জুপিটার-আমনের মন্দিরের মূর্তি ধ্বংস এবং প্রচুর ধনসম্পদ লুটের আশায়। দূরত্ব চারশো মাইল, যেতে হবে ভয়ঙ্কর বালির সমুদ্র পাড়ি দিয়ে। তার সঙ্গে ছিল পঞ্চাশ হাজার সৈন্যের এক বিরাট বাহিনী। কিন্তু মন্দিরে পৌঁছতে পারল না কেউ। সমস্ত মানুষজন তাদের পোষা জন্তু-জানোয়ার আর লটবহর সহ হারিয়ে গেল মরুভূমিতে। কোন চিহ্নই রইল না আর। কি ঘটেছিল? কেউ জানে না। ধারণা করা হয়, ঝড় উঠেছিল বালির সমুদ্রে। মিশরিয়রা শুনে বলে, দেবতারা রুষ্ট হয়ে নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছে হামলাকারীদের। টুয়ারেগরা বলে একটা নয়, তিনটে সেনাবাহিনীর কবর হয়েছে ওই বালির তলায়। বাকি দুটো কাদের, ঐতিহাসিকদের জানা নেই।

বহু প্রাচীন কিংবদন্তী আর কাহিনী ছড়িয়ে আছে ওখানকার আদিবাসীদের মধ্যে, আজও লোকের মুখে মুখে ফেরে সেসব। সেখানে নাকি সভ্যতা ছিল খ্রীষ্টের জন্মের তিন লক্ষ বছর আগে। সেই মানুষেরা কারা, কি তাদের পরিচয়, জানা যায়নি তেমন। কোথাও কোথাও দেখা যায় অতি প্রাচীন মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ, ভাষাবিদদের অপরিচিত, দুর্বোধ্য শিলালিপি। বাতাসে ক্ষয়ে গিয়ে প্রাচীন কবরও বেরিয়ে পড়ে মাঝেসাঝে। তাতে পাওয়া যায় হাজার হাজার বছরের পুরানো রোদে-শুকনো মানুষের হাড়।

প্রশ্ন জাগতে পারে, মরুভূমিতে মানুষ বাস করত কি করে? ভৌগোলিকদের মতে আজকের সাহারা এককালে ছিল সুজলা-সুফলা, এখনকার মত মরুভূমি নয়। সাহারা এসেছে আরবী শব্দ সাহ্'রা থেকে। এর অর্থ, মরুভূমি। নীল নদের মত বড় বড় নদী বইত এর বুক চিরে। কোন্ অজানা কারণে সেসব নদী শুকিয়ে যেতে থাকে। শুরু হয় মরুকরণ প্রক্রিয়া। এশিয়ার মরুভূমি থেকে বাতাসে উড়ে আসা বালিতে ছেয়ে যেতে থাকে বিশাল অঞ্চল। সৃষ্টি করে নতুন আরেক মরুভূমি।

রোদের ভয়াবহ উত্তাপ তো আছেই এখানে, তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে বাতাস। প্রচণ্ড গরমে যখন-তখন যেখানে-সেখানে তৈরি হচ্ছে ঘূর্ণিঝড়। কোন রকম জানান না দিয়ে আসে। আচমকা দেখা যাবে ঘুরে ঘুরে ওপরে উঠতে শুরু করেছে হলুদ বালি, তীব্র গতিতে ধেয়ে চলেছে কোনও একদিকে। ঘূর্ণির ভেতরটা এত গরম, চুল্লির গনগনে তাপকেও হার মানায়। সেই বাতাসের ছোঁয়া লাগলে গায়ের চামড়া পুড়ে যায়, চোখ অন্ধ হয়, শ্বাস নেয়া যায় না। পাহাড়ের ওপর দিয়ে বয়ে যাবার সময় ধোঁয়া উঠতে থাকে। পাথর পুড়ে, গুঁড়িয়ে, ধুলো হয়ে যায়। এর মধ্যে পড়লে বাঁচার সাধ্য নেই কারও, মৃত্যু অবধারিত। বিকৃত রূপ নেয় তখন সূর্যের চেহারা, অদৃশ্য হয়ে যায় ধুলিঝড়ের আড়ালে। অদ্ভুত এক বাদামী অন্ধকারে ঢেকে যায়

মরুভূমির একাংশ।

ঝড় থেমে গেলে বাতাসে উড়তে থাকা বালি নেমে আসে নিচে। নতুন ফাঁদ তৈরি করে মানুষের জন্যে। বালি চাপতে সময় লাগে, তুষারের মত নরম হয়ে থাকে আলগা বালি। তাতে পা দিলেই দেবে যায় হাঁটু পর্যন্ত, গাড়ি চালাতে গেলে চাকা বসে যায়। এই অবস্থায় ওখানে প্লেন নামাতে যদি বাধ্য হয় কোন পাইলট, কপালে সীমাহীন দুঃখ আছে তার। একবার নামলে কোনমতেই ওই বালির ফাঁদ থেকে আর বিমান তুলে আনতে পারবে না। সঙ্গের পানি ফুরিয়ে যাবার চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে মৃত্যু ঘটবে তার, শরীর শুকিয়ে যাবে শুকনো ঝরা পাতার মত।

সাহারার সবচেয়ে বিখ্যাত মরুদ্যানগুলোর একটা সিওয়া। লম্বায় একশো পঁচিশ মাইল। মাঝে বড় বড় হ্রদ আছে। আর আছে পাথুরে পাহাড়ের সারি। সেগুলোর গোড়াতে গড়ে উঠেছিল প্রাচীন সভ্যতা। তৈরি হয়েছে জুপিটার-আমনের মন্দির খ্রীষ্টপূর্ব ১৩৮৫ সালে। দু'হাজার বছর কিংবা তারও আগে থেকে চুম্বকের মত টেনে নিয়ে গেছে সেখানে বড় বড় রাজা, রথী-মহারথী আর ভ্রমণকারীদের। তাদের প্রধান আকর্ষণ ছিল ওই মন্দির। ভবিষ্যৎ বলার জন্যে ওখানে থাকত একদল পুরোহিত। আগুরমি পাহাড়ের কোলে ওই মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ এখনও দেখা যায়। কাছেই রয়েছে প্রাচীন রাজা আমোনিয়ার প্রাসাদ আর বিরাট নগর-তোরণের ধ্বংসাবশেষ। সিকি মাইল দূরে পাওয়া যাবে ফাউন্টেইন অভ দ্য সান, খ্রীষ্টপূর্ব পাঁচ-শতকে যে ঝর্নার কথা উল্লেখ করেছিলেন হেরোডোটাস, যার কথা লিখে গেছেন প্রাচীন ঐতিহাসিকরা।

দিগ্বিজয়ী আলেকজান্ডারও গিয়েছিলেন ওই মন্দিরে, পুরোহিতের কাছে জানার জন্যে—তিনি কি মানুষ, না দেবতা? এ রকম ভাবার কারণ ছিল তাঁর। বিশাল সাহারায় পথ হারিয়েছিলেন তিনি। পানি ফুরিয়ে গিয়েছিল। বাঁচার কোন আশাই ছিল না। অথচ যে অঞ্চলে তিনশো বছর ধরে বৃষ্টি হয় না, সেখানে বৃষ্টি হলো। বেঁচে গেলেন তিনি। যে পাহাড়ের কাছে ঘটেছিল এ ঘটনা সেটার নামকরণ হলো তাঁর নামে। ভূমধ্যসাগর উপকূলে অবস্থিত মার্সা ম্যাট্রু থেকে ওটা একশো নব্বই মাইল দূরে, হেঁটে যেতে কম করে হলেও দশ দিনের ধাক্কা।

দিগন্তের দিকে তাকিয়ে এ সব কথা খেলে গেল রবিনের মনের পর্দায়। তার মনে হতে লাগল, পুরানো সেই ঘটনাগুলো যেন চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছে। চড়চড় করছে চামড়া। ঘাম বেরোনোর সঙ্গে সঙ্গে বাষ্প হয়ে উড়ে যায় প্রচণ্ড গরমে। ঘুরে রওনা হলো সে। ফিরে চলল 'উয়াড়ি'তে, গর্তের নিচে, যেখানে খেজুর গাছের ছায়া আছে। গাছের জটলার মধ্যে কালো পলিথিন দিয়ে ঢেকে রাখা হয়েছে একটা বিমান। ওটাতে চড়েই এখানে এসেছে ওরা। খেজুর ছাড়াও কিছু অ্যাকাশে গাছের ঝোপ আছে নিচে। এ সব জন্মাতে পারার কারণ, বালির সমতলের অনেক নিচে গর্তের বুক। সেখান থেকে পানি পাওয়ার জন্যে মাটির খুব বেশি গভীরে শেকড় নামাতে হয় না গাছগুলোকে। সেই প্রাচীনকাল থেকেই এ তথ্যটা জানা ছিল মানুষের। তাই কোন্খানে খুঁড়লে পানি পাওয়া যাবে বুঝতে পারত ওরা। এল আরিগিও এর ব্যতিক্রম নয়। এখানেও মাটি অল্প খুঁড়েই বের করে আনা যায় টলটলে মিষ্টি পানি। গর্তের তলায় তাঁবু খাটানো হয়েছে। তার ছায়ায়

বসে গল্প করছে ওমর, মুসা আর কিশোর।

রবিনকে আসতে দেখে মুখ তুলে তাকাল ওমর, 'কেমন দেখে এলে?'

'ভয়ঙ্কর!' কাছে এসে ধপ করে বসে পড়ল রবিন। 'এতটা খারাপ ভাবিনি। তাকাতেই ভয় লাগে।'

'আমারও।'

'কি করব তাহলে? ফিরে যাব?'

'না। একেবারেই কিছু না করে ফিরে যাওয়া উচিত হবে না। জেনারেলের সামনে দাঁড়িয়ে বলতে পারব না ভয় পেয়ে পালিয়ে এসেছি আমরা।'

'পলটার বোধহয় মাথা খারাপ,' মন্তব্য করল মুসা। 'নইলে এমন জায়গায় আসে? আমার তো ভাবতেই পেটের মধ্যে হাত-পা সেঁধিয়ে যাচ্ছে!'

'আমারও ধারণা,' সিগারেট ধরাল ওমর, 'ওটা পাগল। তবে মানুষকে পাগল বানানোর এক অদ্ভুত ক্ষমতা আছে মরুভূমির। একবার এখানে এলে যেন নেশা ধরে যায় রক্তে, বেশিদিন আর দূরে থাকতে পারে না, বার বার ফিরে আসে এখানে। এটাকে রোগও বলতে পারো। মরু-জ্বর। সবাইকে অবশ্য ধরে না। তবে যাদের ধরে, পাগল বানিয়ে ছাড়ে। হতে পারে ওসব লোক খুব শান্তিপ্রিয়। শব্দ ওদের একেবারেই পছন্দ নয়, তাই শান্তির লোভে চলে আসে মরুভূমিতে।'

'পলের তো আর মরু-জ্বর হয়নি, আগে কখনও আসেওনি এখানে যে ওই রোগে ধরে টেনে নিয়ে আসবে,' শান্তকণ্ঠে বলল কিশোর। 'পল বা হুরুম, দুজনের কাউকেই পাগল মনে হয় না আমার। একজন এসেছে অ্যাডভেঞ্চারের লোভে, আরেকজন সোনা আর ধনরত্ন। ওমরভাই, আপনার কি মনে হয়?'

'তাই হবে।'

'গুপ্তধনের খোঁজে গেছে?' মুসার প্রশ্ন।

'যেতে পারে, অসম্ভব নয়।'

'সত্যি আছে গুপ্তধন?'

'তা বলতে পারব না। অনেক ধরনের গুজব ছড়ায় এখানে। আর গুজব সাধারণত যা হয়, মুখে মুখে ছড়াতে ছড়াতে তিল হয়ে যায় তাল। তবে গুপ্তধন পাওয়া গেলেও অবাক হওয়ার কিছু নেই। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর পর এক লোক এক ব্যাগ পান্না নিয়ে চলে গিয়েছিল সভ্যজগতে। বলেছিল টিন-হিনানের গুপ্তধনের সন্ধান পেয়েছে সে। কথিত আছে, সাহারা যখন মরুভূমি ছিল না, তখন এই অঞ্চলের সম্রাজ্ঞী ছিল টিন-হিনান। মৃত্যুর পর তার সঙ্গে কবরে দিয়ে দেয়া হয় অনেক ধনরত্ন, সোনাদানা, অলঙ্কার। লোকটার কথায় কেউ গুরুত্ব দেয়নি, একজন ফরাসী অভিযাত্রী বাদে। মরুভূমি সম্পর্কে অসাধারণ জ্ঞান ছিল তার, টুয়ারেগদের মাঝে বাস করেছেন বহুদিন। লোকটার কথা শুনে উনিশশো সাতাশ সালের একদিন বেরিয়ে পড়েন টিন-হিনানের কবর আবিষ্কারের আশায়।'

'নিশ্চয় খামোকা ঘুরে মরেছেন তিনি,' মুসা বলল, 'পাওয়া যায়নি কিছুই।'

'গেছে। টুয়ারেগদের সহায়তায় খুঁজে বের করেন তিনি সেই কবর। এত বেশি জিনিস পাওয়া গেছে, কল্পনাও করতে পারবে না। সোনা-রূপা আর দামী পাথরের নানা রকম গহনার স্তূপ, মূল্যবান পাথর, আরও অনেক কিছু। সাড়া ফেলে দিয়েছিল

এই আবিষ্কার।'

'টুয়ারেগরা আগেই লুট করেনি কেন ওই কবর?'

'ভয়ে। ওদের কুসংস্কার আছে, কবরের কাছ থেকে দূরে থাকাই নিরাপদ। মৃতের শান্তি নষ্ট করলে আত্মা অভিশাপ দেয়।'

'নিশ্চয় গুপ্তধনের এ সব গল্প হুরুম আর পলও শুনেছে,' কিশোর বলল, সেজন্যেই বেরিয়েছে আরেকটা ওরকম কবরের সন্ধানে।'

'ওদের খোঁজ পেলেই সেটা জানা যাবে,' নড়েচড়ে বসল ওমর। 'আজ বিশ্রাম। কাল থেকে পুরোদমে খোঁজা শুরু করব।'

'পলের বেঁচে থাকার সম্ভাবনা কতখানি?' রবিনের প্রশ্ন।

'খুব সামান্য।'

'তাহলে কি খুঁজব আমরা?'

'ওর প্লেনটা। বালিতে নামাতে বাধ্য হলে কিংবা ধসে পড়লে ওদের বেঁচে থাকার কোন সম্ভাবনা নেই। সেক্ষেত্রে শুকিয়ে মমি হয়ে যাওয়া দুটো লাশ পাব কেবল আমরা...'

'যদি আলেকজাণ্ডারের মত অলৌকিক কোন উপায়ে বেঁচে গিয়ে না থাকে,' কিশোর বলল।

'হ্যাঁ।'

'কিন্তু একটা কথা বুঝতে পারছি না, পলকে পাকড়াও করল কেন হুরুম?' আবার প্রশ্ন করল রবিন।

জবাব দিল কিশোর, 'পাইলট দরকার ছিল। তাকে এখানে উড়িয়ে আনার জন্যে।'

'শুধু কি তাই?'

'হয়তো প্লেনটাও তার দরকার ছিল। একটা প্লেনের অনেক দাম। কেনার মত টাকা ছিল না ওর। তাই পটিয়ে-পাটিয়ে পলকে রাজি করিয়েছে।'

'পলকেই কেন? আর কাউকে পেল না?'

'কারণ পলের বয়েস কম, তর্ক করবে না, বেশি যুক্তি দেখাবে না, অ্যাডভেঞ্চারের লোভে সহজেই রাজি হয়ে যাবে। হুরুম কোনভাবে কারও কাছ থেকে জেনেছে পল প্রত্নতত্ত্বে আগ্রহী। অ্যাডভেঞ্চার পছন্দ করে। পলকে গিয়ে বলেছে সাহারায় প্রাচীন কবর আবিষ্কার করতে যেতে চায় সে। আমার তো ধারণা, শুনেই লাফিয়ে উঠেছে পল। এক কাপড়ে বেরিয়ে পড়েছে হুরুমের সঙ্গে।'

চুপ হয়ে গেল মুসা। খানিক নীরবতার পর জিজ্ঞেস করল, 'আপনি এদিকে আসার কথা ভাবলেন কেন, ওমরভাই?'

'কারণ ওদের যেদিকে যাওয়ার কথা, সেদিকে যেতে হলে কাছাকাছি পানির উৎস এখানে ছাড়া আর কোথাও নেই।' রবিনের দিকে ফিরল ওমর, 'রবিন, চা বানাও। হাঁটাহাঁটি করে অনেক পানি উড়িয়ে দিয়েছি শরীর থেকে, কিছুটা অন্তত পূরণ করা দরকার।'

চার

পরদিন ভোররাতে ঘুম থেকে উঠল ওরা। আকাশে তারা জ্বলছে তখনও, তবে উজ্জ্বলতা কমে এসেছে। আগুন জ্বেলে কফি বানাতে বসল রবিন। বিমানের পলিথিনের চাদর সরিয়ে ওটাকে বের করতে গেল অন্য তিনজন।

সিক্সটি থ্রী মডেলের একটা মারলিন। যখনকার তৈরি, সে আমলের জন্যে খুবই আধুনিক জিনিস। ভেতরে জায়গা অনেক। নানা রকম সুযোগ-সুবিধা আছে। এমনকি একটা রেফ্রিজারেটরও বসানো আছে। তা ছাড়া তেলের ট্যাংকটা বড় বলে দূর পাল্লার যাতায়াতেও বেশ সুবিধা।

এটা কেনার পুরো টাকা দিয়েছেন জেনারেল হেনরি কাস্টার। নতুন, আধুনিক জিনিস না কিনে পুরানো জিনিস কেনার ব্যাপারে আগ্রহী কেন, জানতে চেয়েছিলেন তিনি। ওমর বলেছে, আধুনিক জিনিসের অনেক দাম। এতবড় একটা বিমান কিনতে অন্তত তিনগুণ টাকা বেরিয়ে যেত। দরকার কি অত খরচের? যদিও টাকাটা দিতে অরাজী ছিলেন না জেনারেল।

এই মারলিন কেনার আরেকটা বড় কারণ হলো, জিনিসটা পুরানো ছিল। বিমান বাহিনীর বাতিল মালের গুদাম থেকে অল্প দামে কিনেছে ওকিমুরো কর্পোরেশন। মেরামত করার কথা ভাবছিল, এই সময় ডাক পড়েছে চিত্রপরিচালক ডেভিস ক্রিস্টোফারের কাছ থেকে। জেনারেলের ছেলেকে খুঁজে বের করার দায়িত্বটা পেল ওরা। সুযোগ বুঝে মারলিনটা মেরামত করে বিক্রি করল জেনারেলের কাছে। তাতে তাঁরও লাভ, ওদেরও লাভ। তিনি একটা কাজের জিনিস পেলেন তিন ভাগের একভাগ দামে, আর ওরা করল ব্যবসা। লাভ ভালই হয়েছে। তিনি বলে দিয়েছেন, তাঁর ছেলেকে খুঁজে বের করতে পারলে বিমানটা ওদেরকে দিয়ে দেবেন তিনি। পুরস্কার হিসেবে ওরা নিতে রাজি না হলে পারিশ্রমিক হিসেবে ধরবেন। কর্পোরেশনের চার পার্টনারই সন্তুষ্ট। এ ভাবে চলতে থাকলে ব্যবসাটাকে দাঁড় করাতে বেশিদিন লাগবে না।

'সূর্য বেশি ওপরে উঠে যাওয়ার আগেই ফিরে আসতে হবে,' ওমর বলল। 'তা না হলে বাতাস এত গরম হয়ে যায়, ফোসকা পড়ে যাবে শরীরে।'

'আসলে কি খুঁজতে যাচ্ছি আমরা, ওমরভাই?' জানতে চাইল কিশোর।

'বালি ছাড়া অন্য যা কিছু। আস্ত প্লেন, অথবা প্লেনের যে কোন অংশ। চাকার দাগ, ল্যাণ্ড করার চিহ্ন। যদিও আকাশ থেকে ওসব চোখে পড়ার কথা নয়। পড়লে ভাগ্যবান মনে করব।'

'আর কিছু?'

'আর কি? হুরুমের কথা ঠিক হলে সামনে একটা পাহাড় দেখতে পাব। তবে ঠিক হওয়ারই কথা। ওর কথা যা শুনেছি তাতে লক্ষ্যহীনভাবে কোন কিছুর জন্যে বেরিয়ে পড়ার লোক নয় ও। পাহাড়টা পেলে ফিরে আসব।'

'পাহাড়টা কত দূরে হবে বলে মনে হয় আপনার? দুশো মাইল?'

'জানি না। অতিরিক্ত দূরে হলে সঙ্গে তেল যা এনেছি, তাতে খুব বেশি বার যাতায়াত করতে পারব না।'

'বালিতে প্লেনটা দেখলে কি করবেন?' মুসার প্রশ্ন। 'নামবেন?'

'উচিত হবে না। বালি নরম হলে ওদের প্লেনটার অবস্থাই হবে আমাদেরও। আর নেমে কি করব? ভেতরে কেউ থাকলে এতদিনে মরে শুঁটকি হয়ে গেছে। অনর্থক রিস্ক নিতে যাব।'

'তা বটে।'

কফি খাওয়া শেষ করল ওরা। বাড়তি যে বারো ক্যান তেল এনেছে, তার অর্ধেক বিমান থেকে নামিয়ে একটা খেজুর গাছের গোড়ায় বালি চাপা দিয়ে রাখল। অহেতুক বোঝা নিতে চাইল না ওমর।

কিশোর বলল, 'জিনিসপত্র পাহারা দেয়ার জন্যে একজন থেকে যাব নাকি?'

'না,' ওমর বলল।

'অসুবিধে কি?'

'বাই চান্স যদি মরুদ্যানটা পেয়ে যাই যেখানে এখনও বেঁচে আছে পল আর হুরুম, এখানে আর ফিরে আসব না। ওদের তুলে নিয়ে সোজা সিওয়া রওনা হয়ে যাব। একসঙ্গে থাকাই ভাল আমাদের।'

কয়েক মিনিট পর দিগন্তরেখার কাছ থেকে আলোর আভা কোণাকুণি ছড়িয়ে পড়ল ওপর দিকে। ভোর হওয়ার খানিক আগে এই আলো দেখা যায়, একে বলে ফলস ডন বা মিথ্যে ভোর। উয়াড়ির নিচে গাছপালার কিনার থেকে শুরু করে অনেকটা জায়গার বালি শক্ত হয়ে বসে গেছে। সেটাকে রানওয়ে হিসেবে ব্যবহার করে বিমান নেমেছিল। এখন আবার সেটা ব্যবহার করেই চলতে শুরু করল। এখানে যে নামা যায়, সেটা সিওয়া থেকেই জেনে নিয়ে নিশ্চিত হয়ে এসেছিল ওমর। ভুল তথ্য দেয়নি ওরা।

মরুভূমিতে দিনে যেমন ভয়ানক গরম পড়ে, রাতে তাপমাত্রা দ্রুত নেমে গিয়ে হয়ে যায় কনকনে ঠাণ্ডা। বাতাস এখনও ঠাণ্ডাই আছে। তবে ওরা জানে, এই অবস্থা বেশিক্ষণ থাকবে না। সূর্য উঠলেই গরম হয়ে যাবে বাতাস অস্থির হয়ে যাবে, সাগরের ঢেউয়ে নৌকার যে অবস্থা হয় বিমানটারও সেই অবস্থা হবে। ক্রমাগত দুলতে থাকবে, ঝাঁকুনি খাবে। মরুভূমির ওপরের গরম বাতাসের মধ্যে বিমান ওড়াতে গেলে ঘটবেই এ সব, বাম্প থেকে মুক্তি নেই।

তবে আপাতত সেসবের কোন ভয় নেই। মারলিনকে পাঁচ হাজার ফুট ওপরে তুলে আনল ওমর। সামনের দিকে নজর রেখেছে সে। দুই পাশে দেখার ভার তিন গোয়েন্দার ওপর। জানালার কাছে বসেছে ওরা। আকাশ এত পরিষ্কার এখন, যে কোনও দিকে পঞ্চাশ মাইল দূরে নজর চলে। কম্পাসের দিকে কড়া নজর রাখল ওমর। নিচে এমন কিছুই নেই যেটা দেখে দিক ঠিক রাখা যায়।

সামনে বিছিয়ে আছে বিশাল বালির সমুদ্র। সেদিকে তাকিয়ে মনের মধ্যে কেমন করে উঠবে না, এত দুঃসাহসী মানুষ খুঁজে পাওয়া কঠিন। একনাগাড়ে তাকিয়ে থাকতে থাকতে দার্শনিক হয়ে যায় অতিবড় বাস্তববাদীও। নিজেকে বড় ক্ষুদ্র মনে হতে থাকে। জাগতিক সুখ-শান্তি আর অন্যান্য ব্যাপারগুলোকে হাস্যকর,

অর্থহীন মনে হয় তখন।

বালির দিকে তাকিয়ে থেকে ভাবতে গিয়ে আচমকা ভয় পেয়ে গেল কিশোর। পেটের মধ্যে সুড়সুড়ি দেয়া কেমন একধরনের শূন্য অনুভূতি। নাগরদোলায় চড়তে গিয়ে নিচের দিকে নামার সময় অনেকের হয় এ রকম। তার মনে হলো, যদি এখন কোন কারণে বিমানটা নামতে বাধ্য হয় ওই বালিতে, তাহলে কি ঘটবে? বেঁচে ফিরে যাওয়ার কোন আশা নেই। বিমানের এঞ্জিনের ওপর এখন নির্ভর করছে ওদের জীবন। কোন এঞ্জিনই ক্রটিমুক্ত নয়। যদি কোন কারণে গোলমাল দেখা দেয় এখন এঞ্জিনে! গায়ে কাঁটা দিল তার।...আর ভাবতে চাইল না সে। মন অন্যদিকে সরানোর চেষ্টা করল।

ওমরের চোখ অস্থির। চঞ্চল হয়ে ঘুরছে সামনে, ডানে-বাঁয়ে, মাঝে মাঝেই নিচের দিকে তাকিয়ে কন্ট্রোল প্যানেল দেখে বুঝে নিচ্ছে কোন অসুবিধে আছে কিনা।

মুসা আর রবিন তাকিয়ে আছে বাইরের দিকে। ওরাও চুপ। ভয় পাচ্ছে বোধহয় কিশোরের মতই।

ভোর হতে না হতেই দ্রুত আলোকিত হয়ে গেল চারদিক। আকাশটা যেন গাঢ় নীল এক গম্বুজ। বেশিক্ষণ থাকল না এই অবস্থা। পুব দিগন্তে সূর্য উঁকি দেয়ার সঙ্গে সঙ্গে পালিশ করা রূপার মত চকচকে হয়ে উঠল। চারজনের চোখেই কাঁচের ঘন কালো সানগ্লাস। এই কাঁচের ভেতর দিয়েও সূর্যের দিকে তাকানোর সাহস হলো না কারও। জানে, একবার তাকালেই সাময়িক অন্ধ হয়ে যাবে চোখ, জখম হয়ে যেতে পারে চিরকালের জন্যে।

ঢেউয়ে পড়া নৌকার মত দুলতে আরম্ভ করল বিমান। গরম হয়ে উঠছে বাতাস। বাতাসের অবস্থা দেখে আশঙ্কা হলো ওমরের—ঝড় আসতে পারে।

আধঘন্টার মধ্যে ওদের পেছনে মরুদ্যানটা অদৃশ্য হয়ে গেল। সামনে, পেছনে, ডানে, বাঁয়ে এখন শুধুই বালি। আরও কয়েক মিনিট পর শান্তকণ্ঠে ওমর বলল, 'সামনে দিগন্তের কাছে কিছু একটা দেখতে পাচ্ছি। পাহাড়-টাহাড় হবে।'

মুখ বাড়িয়ে সবাই তাকাল সেদিকে।

'কতদূরে?' জিজ্ঞেস করল কিশোর।

'ঠিক করে বলা মুশকিল। মাইল পঞ্চাশেক।'

'পেছনে ফেলে এসেছি একশো মাইল,' হিসেব করে বলল কিশোর, 'সামনে পঞ্চাশ। তারমানে আমাদের বেজ মরুদ্যানটা থেকে দেড়শো মাইল দূরে।'

'হ্যাঁ। খুব একটা দূরে বলা যাবে না।'

দিগন্তের দিকে তাকিয়ে থেকে মুসা বলল, 'পাথরের পাহাড় নাকি?'

'আরেকটু এগোলে বোঝা যাবে,' জবাব দিল ওমর। 'খেজুর গাছ আছে কিনা খেয়াল রাখো। তাহলে বুঝতে হবে মরুদ্যান।'

'ম্যাপে তো নেই,' কোলের ওপর বিছানো একটা ম্যাপের দিকে তাকিয়ে আছে রবিন।

'তাতে কি? সাহারায় কত মরুদ্যান এখনও অজানা রয়ে গেছে!'

'পল আর তার দোস্ত কি ওদিকেই গেছে নাকি?' আনমনে নিচের ঠোঁটে চিমটি

কাটল কিশোর।

'যেতে পারে। জেনারেল কাস্টার তো বলেছেনই এমন একটা মরুদ্যানের উদ্দেশে গেছে ওরা, যেটা ম্যাপে নেই। প্লেনটা না পেলে কিছুই অনুমান করতে পারব না।'

কয়েক মিনিট চুপচাপ। হঠাৎ বলে উঠল মুসা, 'মনে হয় খেজুর গাছ!'

ওমরও দেখতে পেয়েছে। আরও গরম হয়ে উঠেছে বাতাস। বিমানের দুলুনি বেড়েছে। কন্ট্রোল কলাম নিয়ে হিমশিম খাচ্ছে সে। এগিয়ে চলেছে এক গতিতে। ঝড়ের আশঙ্কা বাড়ছে মনে।

সবগুলো চোখ এখন দিগন্তের দিকে। আগের মত আর সমান নয় দিগন্তরেখাটা। উঁচুনিচু, বাঁকাচোরা একসারি ভাঙা দাঁতের মত। ধীরে ধীরে বড় হলো দাঁতগুলো। চোখের সামনে ফুটে উঠল কালো পাথরের পাহাড়।

'মাটির দিকে চোখ রাখো,' নির্দেশ দিল ওমর। 'প্লেনের চিহ্ন আছে কিনা দেখো।' বিমান কিছুটা নামিয়ে এনে কোর্স সামান্য বদল করল সে। 'পাহাড়টার পুব কিনার থেকে খুঁজতে খুঁজতে এগোব। পুরোটা বোধহয় আজ দেখে শেষ করতে পারব না। দেখি কতটা পারি।'

সামনে এক বিচিত্র দৃশ্য। পাথর আর বালির ছড়াছড়ি দেখে মনে হয় না ওটা এই পৃথিবীর কোন অঞ্চল। যেন অন্য কোন মরুগ্রহের পিঠ। বিশাল এক খাদ, যার একপাশ থেকে আরেক পাশটা দেখা যায় না। প্রাচীনকালে সাগর কিংবা বড় নদী ছিল, এখন শুকনো। খাদের নিচে কোথাও পাথরের পাহাড়, কোথাও বালির, কোথাও বা সমতল। কাদা শুকিয়ে সিমেন্টের মত শক্ত হয়ে আছে। ওপর থেকে পাহাড়টাকে লাগছে যেন কাঁটাওয়ালা কুমিরের পিঠ। কয়েকটা খেজুর গাছ দাঁড়িয়ে আছে ইতিউতি, তবে প্রাণ নেই ওগুলোতে। মরে, শুকিয়ে কালো হয়ে আছে। পানির চিহ্নও নেই কোনখানে। ভয়াবহ দৃশ্য।

'খাইছে! এ তো মনে হচ্ছে হরর ছবি!' মুসার গলা কাঁপছে।

'এই গাছগুলোকেই দেখেছিলে,' ওমর বলল। 'এগুলো প্রমাণ করছে কিছুদিন আগেও পানি ছিল এখানে।'

'আরেকটু কাছে যাওয়া যায় না?'

'যায়, কিন্তু এখন পারব না। হাত ব্যথা হয়ে গেছে আমার। তা ছাড়া বাতাসের যা অবস্থা, ঝড়ের গন্ধ পাচ্ছি আমি! সময় থাকতে পালানো দরকার।' বিমানের নাক সামান্য ঘুরিয়ে আরেকটু ওপরে উঠে এসেই অস্ফুট শব্দ করে উঠল ওমর। কোন জিনিস দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে তার।

কি দেখেছে দেখার জন্যে গলা লম্বা করল অন্য তিনজন।

রবিনের চোখে পড়ল প্রথম, 'হরিণ!'

'অরিক্স হরিণ,' ওমর বলল। 'তারমানে পানি আছে এখানে কোথাও।'

ফ্যাকাসে সাদা বড় আকারের ছয়টা হরিণের দিকে তাকিয়ে বিড়বিড় করল কিশোর, 'সেটা পঞ্চাশ মাইল দূরেও হতে পারে। পেটে পানি জমিয়ে রাখার ব্যাপারে উটের চেয়ে কম নয় অরিক্স।'

'নিচে তো শক্ত মাটি আছে মনে হয়। নেমে দেখবেন নাকি?' উত্তেজিত

চেহারায় ওমরের দিকে তাকাল মুসা।

'কি দরকার?' ওমর বলল, 'আমরা তো পানি খুঁজতে আসিনি। প্লেনটা দেখলে নাহয় চেষ্টা করতাম। একদিনের জন্যে যথেষ্ট হয়েছে। লাল রঙের ওই একলা চূড়াটাকে চিহ্ন রাখো। কাল ফিরে এসে আবার এখান থেকে খোঁজা শুরু করব।'

আঙুল তুলে দেখিয়ে মুসা জিজ্ঞেস করল, 'ওই সাদা জিনিসগুলো কি?'

ভাল করে দেখে ওমর বলল, 'উটের হাড়। উট এসেছিল, তারমানে মানুষ এসেছিল এদিকে।'

'কি করে জানলেন?' রবিন বলল, 'বুনো উটেরও তো হতে পারে?'

'বুনো উট নেই এদিকে,' জবাব দিল ওমর। 'আর পোষা উট নিজে নিজে মরুভূমি পাড়ি দিয়ে অহেতুক কষ্ট করতে আসবে না এতদূরে।'

আপাতত আর কিছু দেখার নেই এদিকে। ফিরে যাওয়ার জন্যে নাক ঘুরাল ওমর। দিগন্তের দিকে চোখ পড়তেই চমকে গেল, 'ওই দেখো!'

বিশাল কালো একটা স্তম্ভের মত কি যেন উঠে গেছে আকাশে।

'খাইছে!' আঁতকে উঠল মুসা, 'হাবুব নাকি?'

'না, ঘূর্ণিঝড়। তাকিয়ে থাকো ওদিকে। দেখবে কাণ্ড।'

খানিক পর আরও একটা স্তম্ভ তৈরি হয়ে গেল ভোজবাজির বলে। তারপর আরেকটা। আরও একটা। গরম বাতাসে তৈরি হচ্ছে একের পর এক ঘূর্ণি। টান দিয়ে বালি তুলে নিচ্ছে। দেখাচ্ছে স্তম্ভের মত। সমুদ্রেও এই জিনিস দেখেছে মুসা। তফাৎ শুধু ওখানে থাকে পানি, এখানে বালি। এর কোন একটাতে পড়লে কি অবস্থা হবে ওদের, আন্দাজ করে শিউরে উঠল।

ওগুলোকে কাটানোর জন্যে বেশ খানিকটা সরে এসে ঘুরপথে রওনা হলো ওমর। নিচে দেখা গেল একসারি মরুদ্যান। কিংবা বলা যায় মরুদ্যানের কঙ্কাল। মরে শুকিয়ে গেছে।

অর্ধেক পথ আসার পর আচমকা চিৎকার করে উঠল কিশোর, 'ওগুলো কি? ওই যে, উত্তরে!'

বহুদূরে আকাশে অনেক বড় বড় ছয়টা প্রাণী দেখা গেল একসারিতে এগিয়ে চলেছে। উটের মত লাগল। পিঠে সওয়ারী নিয়ে চলেছে।

'উটের মিছিল,' ওমর বলল। 'যেখানে দেখছি সেখানে নেই ওগুলো, সম্ভবত দিগন্তের ওপারে। মরীচিকা। এ ধরনের দৃশ্য হরহামেশা দেখা যায় এ অঞ্চলে।'

'কারা চলেছে এই ভয়ানক জায়গায়?'

'আল্লাহ্‌র ভুলে যাওয়া মানুষেরা।'

'মানে?' বুঝতে পারল না মুসা।

হাসল ওমর। 'আরবরা এই নামেই ডাকে টুয়ারেগদের। ভয়ঙ্কর লোক ওরা। যুদ্ধের সময় ফরাসীরা সাহারা দখল করার পর টুয়ারেগদের নিয়ে মহাবিপদে পড়েছিল। অনেক চেষ্টা করেও বশ মানাতে পারেনি।'

'কিন্তু চলেছে কোথায় ওরা?' চিন্তিত ভঙ্গিতে বলল কিশোর। 'আমরা যে পাহাড়টা দেখে এলাম এখন, সেখানে নয়তো?'

'মনে তো হয় সেদিকেই যাচ্ছে,' ওমরও চিন্তিত হলো। 'বুঝতে পারছি না

ওখানে কি? যদ্দূর জানি, এদিকে তেমন আনাগোনা নেই টুয়ারেগদের।'

বিমান আরও খানিকটা ওপরে তুলে আনল সে। অদৃশ্য হয়ে গেল মরীচিকা। জানোয়ারগুলোকে চোখে পড়ল না আর।

'অবাক কাণ্ড!' বিড়বিড় করল সে।

'উত্তরে এগিয়ে দেখবেন নাকি?'

'দরকার নেই। উটের মিছিল দেখতে আসিনি আমরা।'

চুপ হয়ে গেল কিশোর। বার বার চিমটি কাটতে লাগল নিচের ঠোঁটে। টুয়ারেগদের কথা বোধহয় দূর করতে পারছে না মন থেকে।

পাঁচ

নিরাপদেই ল্যাণ্ড করল মারলিন। ট্যাক্সিইং করে এগিয়ে এসে থামল খেজুর গাছের জটলার কাছে। এখান থেকে ক্যাম্পটা পঞ্চাশ গজ দূরে।

'আগে পানি খাওয়া দরকার,' ওমর বলল, 'তারপর ঢাকা যাবে এটাকে।

বিমান থেকে নেমে হাঁটতে শুরু করল ওরা।

সবার আগে চলতে চলতে থমকে দাঁড়াল মুসা। মাটির দিকে আঙুল তুলে দেখাল, 'কেউ এসেছিল! উটের চিহ্ন!' এদিক ওদিক তাকাতে বলল, 'গেল কোথায়?'

'আমাদের খাবার লুট করতে আসেনি তো?' উদ্বিগ্ন হয়ে বলল কিশোর।

'মনে হয় না,' মাথা নাড়ল ওমর। 'নেহায়েত প্রয়োজন না হলে টিনের খাবার চুরি করতে আসবে না টুয়ারেগরা।'

আরও কয়েক পা এগিয়ে আবার দাঁড়িয়ে গেল ওরা। তাকিয়ে আছে হাঁ করে। তাঁবুটা যেখানে ছিল সেখানে এখন কালো ছাই। সবার আগে দৌড় দিল মুসা। ওদের সমস্ত জিনিসপত্র পুড়িয়ে দেয়া হয়েছে, এমনকি বিমান ঢাকার পলিথিনটা পর্যন্ত।

পুরো একটা মিনিট কেউ কোন কথা বলল না। অবশেষে অসহায় কণ্ঠে বিড়বিড় করল ওমর, 'কিছু বুঝতে পারছি না!'

গরমে নষ্ট হওয়ার ভয়ে বালির নিচে লুকিয়ে রাখা কয়েক টিন খাবার বাদে আর সব গেছে। যে পুড়িয়েছে সে ওগুলো খুঁজে পায়নি। নইলে ওগুলোও নষ্ট করত।

'পেট্রোলের কি অবস্থা?' শুকনো গলায় বলল কিশোর।

খেজুর গাছের গোড়ায় ক্যানগুলো পুঁতে ওপরে খেজুর পাতা চাপা দিয়ে রাখা হয়েছিল। সেদিকে ছুটল ওরা। দূর থেকে দেখে ওমর বলল, 'হাত দিয়েছে বলে তো মনে হয় না।'

নিচু হয়ে পাতা সরিয়ে ক্যান বের করতে যাচ্ছিল রবিন। এক ধাক্কায় ওকে সরিয়ে দিল ওমর।

অবাক হয়ে গেল রবিন।

নীরবে আঙুল তুলে দেখাল ওমর। কিছু বলার প্রয়োজন হলো না।

খুব ধীরে শরীর বাঁকিয়ে বাঁকিয়ে গাছের গোড়ার কাছ থেকে বেরিয়ে এল একটা সাপ। বড় না, মাত্র দুই ফুট লম্বা। চ্যাপ্টা, প্রায় চারকোণা মাথা। দুই চোখের মাঝখানে কপালে চামড়ার নিচে ছোট একটা বাঁকা হাড়, শিঙের মত হয়ে আছে।

মুখ থেকে রক্ত সরে গেল রবিনের। চিনতে পেরেছে সাপটাকে। চিড়িয়াখানায় দেখেছে। বইতে পড়েছে এর কথা।

একটা শুকনো ডাল তুলে নিয়ে পাতাগুলো টান দিয়ে ছিঁড়ে ফেলে এক বাড়িতে সাপটার কোমর ভেঙে ফেলল ওমর। তারপর পিটিয়ে মারল। ডালের মাথা দিয়ে তুলে ছুঁড়ে ফেলল দূরে। 'আস্ত ইবলিস!' খসখসে কণ্ঠে বলল সে। 'বেঁচে গেলে, রবিন। কামড় খেলে দশ মিনিটের মধ্যে দল থেকে একজন কমে যেত আমাদের।'

'কি সাপ ওটা?' মরা সাপটার দিকে তাকিয়ে আছে মুসা।

'ভাইপার!' ফিসফিস করে বলল রবিন। 'হর্নড ভাইপার! কপালের শিংটার জন্যে ওরকম নাম। ভয়ানক বিষাক্ত।'

'কিছু বের করতে হলে এখানে সাবধানে হাত দিতে হবে আমাদের। গাছের গোড়ায় কি করছিল?'

'ছায়া দেখে ঢুকেছিল। চুপচাপ পড়ে থাকে এই সাপ। কোন্‌খান থেকে যে হুট করে বেরিয়ে আসবে, কেউ বলতে পারে না। বালির মধ্যেও গা ডুবিয়ে থাকে। বিরক্ত না করলেও ছোবল মেরে বসে। বিস্‌করা মরুদ্যানের কাছে একটা পাহাড়ে এই সাপের অসংখ্য গর্ত আছে। আরবরা জায়গাটার নাম দিয়েছে অভিশপ্ত এলাকা। ওরা বলে, বিকেলের পর রোদ পড়ে গেলে নাকি হাজারে হাজারে সাপ বেরিয়ে আসে। ওই পাহাড়ের ধারেকাছে যায় না কেউ।'

'সিন্দবাদ নাবিকের গল্পে ওই পাহাড়ের কথাই বলা হয়েছিল নাকি?'

'হতে পারে,' কিশোর বলল। 'সিন্দবাদকে যে পাহাড়ে নিয়ে গিয়ে ফেলেছিল রক পাখি, ওটাতেও সন্ধ্যার সময় হাজারে হাজারে সাপ বেরিয়ে আসত। আমার কেন যেন মনে হয় সিন্দবাদের ওসব গল্প নিছক রূপকথা নয়, এর মধ্যে সত্য আছে।'

'থাকুক আর না থাকুক,' দুহাত নেড়ে বলল মুসা, 'আমি বাপু ওই পাহাড়ের ধারে কাছে যাচ্ছি না।' গাছের গোড়ার দিকে তাকিয়ে বলল, 'ক্যানগুলো যখন লুকালাম তখন তো এই সাপটা ছিল না এখানে।'

'আমরা চলে যাওয়ার পর এসেছে হয়তো,' কিশোর বলল। 'পেট্রোলের কি অবস্থা, দেখা দরকার।'

অতি সাবধানে একটা একটা করে ডাল সরাল ওমর। বালি সরাতে একটা ক্যানের হাতল দেখা গেল। টান দিয়ে তুলে আনল সেটা। ওজনই বলে দিল কি অবস্থা। 'খালি! ফেলে যাওয়া একদম উচিত হয়নি!'

'ভাগ্যিস বাকি ছয়টা সঙ্গে করে নিয়ে গিয়েছিলাম,' এমন ভঙ্গিতে বলল কিশোর, যেন সে জানত এ রকমই কিছু ঘটবে।

'শয়তানিটা করল কে?' এদিক ওদিক তাকাতে লাগল মুসা, যেন শয়তানটাকে দেখতে পাবে।

'মরীচিকা!'

'আহ্, নাটক কোরো না তো এখন! কি বলতে চাও খুলে বলো।'

'টুয়ারেগদের মিছিল দেখলাম না। ওরাই নিশ্চয় এসেছিল এখানে। অকাজটা করে রেখে গেছে।'

'কিন্তু আমি মানতে পারছি না। টুয়ারেগরা এ কাজ করবে না। ওদের মধ্যে একটা অলিখিত চুক্তি আছে—অন্যের জিনিস নষ্ট করবে না। এটা ওরা কড়াকড়ি ভাবে মানে, তা নাহলে টিকে থাকতে পারবে না এই ভয়াল মরুতে,' বাকি ক্যানগুলো তুলে আনল ওমর। সব খালি। 'কাজটা অন্য কারও।'

ওগুলোর দিকে তাকিয়ে থেকে রবিন বলল, 'খালি করে আবার রেখে দিল কেন?'

'প্লেনে যা পেট্রল আছে ফুরিয়ে যাবার আগে যাতে আমরা টের না পাই। হঠাৎ করে বিপদে ফেলতে চেয়েছে আমাদের।'

কিশোর বলল, 'আরও একটা কারণে রাখতে পারে। সাপটাকে হয়তো দেখেছে সে। ক্যান তুলতে গিয়ে আমরা যাতে সাপের কামড় খেয়ে মরি সেজন্যে রেখেছে।'

'এ কথাটা অবশ্য ভাবিনি। তাহলে ধরে নিতে হবে, লোকটা শুধু শয়তানই নয়, খুনীও।'

'কিন্তু বুঝতে পারছি না,' মুসা বলল, 'সাপটা ওকে কামড়ায়নি কেন?'

'সাপ নিয়ে অবিশ্বাস্য কাণ্ড করে কিছু কিছু আরব,' ওমর বলল। 'সাপকে ডেকে নিয়ে আসে। এ সাপটাকেও নিশ্চয় ডেকে এনেছিল। এতে বোঝা যায়...'

'টুয়ারেগরাই কাজটা করেছে,' বাক্যটা শেষ করে দিল কিশোর।

'না, টুয়ারেগরা করেনি। করলে কাফেলার মধ্যে থেকে এমন কেউ করেছে যে আরব হলেও টুয়ারেগ নয়।'

'কে সেই লোক?'

'সেইটাই প্রশ্ন।'

'জিনিসপত্র নষ্ট করে তার কি লাভ, এটা জানা গেলেই অনুমান করা যেত লোকটা কে হতে পারে?'

'আপাতত সেটা জানার কোন উপায় নেই। জানতে হলে কাফেলার লোকজনের সঙ্গে কথা বলতে হবে।' রোদ এসে পড়ছে গায়ে। হাত নেড়ে যেন তাড়ানোর চেষ্টা করে বলল ওমর, 'গরম লাগছে। ছায়ায় চলো।'

তাঁবু নেই। খেজুর গাছের ছায়ায় সরে এল ওরা। আগের কথার খেই ধরে প্রশ্ন করল কিশোর, 'কে হতে পারে লোকটা?'

'ওই কাফেলার সর্দার,' মুসা বলে উঠল।

'সেই সর্দারটা কে?' নিজে নিজেই জবাব দিল কিশোর, 'এমন কেউ যে আমাদের এখানে আসার উদ্দেশ্য জানে। সে চায় না আমরা এখানে থাকি। তাই প্রথম সুযোগেই জিনিসপত্র নষ্ট করে দিয়ে আমাদের তাড়াতে চেয়েছে।'

রবিন বলল, 'তোমার ধারণা, পল কেন এসেছে এদিকে, সেটাও তার জানা?'

'হ্যাঁ।'

'তাহলে পলকে জীবিত পাওয়ার আশা এখন আমাদের পুরোপুরিই ত্যাগ করা উচিত।'

'বরং উল্টোটাও ভাবা যেতে পারে। পল যদি মৃতই হবে, আমাদের তাড়াতে চাইবে কেন লোকটা? এমনও হতে পারে, পলকে আটকে রাখতে চাইছে সে। পল যাতে আমাদের হাতে না পড়ে, সেজন্যে বিদেয় করতে চাইছে আমাদের।'

'হুরুম ছাড়া আর কেউ না!' মুসা বলল।

'হতে পারে। কিন্তু কাফেলায় ঢুকল কি করে সে, সেটাই প্রশ্ন। অবশ্য যদি হুরুম হয়ে থাকে।'

'তাছাড়া আর কে?'

'জিনিসপত্র তো দিল সব নষ্ট করে,' দাঁত দিয়ে নখ কাটল মুসা। ওমরের দিকে তাকাল, 'এখন আমরা কি করব? ফিরে যাব?'

'না,' মাথা নাড়ল ওমর। 'যা তেল আছে তাতে আরও দুবার ঘুরে আসতে পারব পর্বত থেকে। পল ওখানে গিয়ে থাকলে খুঁজে বের করা যাবে। না গেলে আর কিছু করার নেই। সারা মরুভূমি তো আর চুঁড়ে বেড়াতে পারব না। এখন থেকে রেশন করে খাবার খেতে হবে আমাদের। ভাগ্যিস ওয়াটার-হোলটা নষ্ট করে দিয়ে যায়নি। পানি না পেলে চলে যাওয়া ছাড়া আর কোন উপায় থাকত না আমাদের।'

'করেনি ওদের নিজের স্বার্থেই,' কিশোর বলল। 'এদিক দিয়েই ফিরতে হবে। তখন পানি দরকার হবে ওদের।'

'এটা অবশ্য ঠিকই বলেছ।'

'আরেকটা প্রশ্নের জবাব পাচ্ছি না, পর্বতের দিকেই যদি গিয়ে থাকে ওরা, তাহলে আসার পথে আকাশ থেকে আসল মানুষগুলোকে না দেখে শুধু ছায়া দেখলাম কেন?'

'পর্বতটা অনেক লম্বা। আমরা যেদিক থেকে এসেছি ওরা নিশ্চয় সেদিকে যায়নি, গেছে আরেক মাথার দিকে। আশা করছি, কাল দেখা পেয়ে যাব। এই রোদের মধ্যে আজ আর বেরোব না।'

'কালও ভোররাতেই?' জানতে চাইল মুসা।

'হ্যাঁ। কাল পাহাড়ের আরেক জায়গায় গিয়ে খুঁজব। কাফেলার আগেই চলে যেতে পারব আমরা। উটে চড়ে দেড়শো মাইল পথ পাড়ি দিতে চার-পাঁচ দিন লেগে যাবে ওদের। পথে কোন মরুদ্যান পাবে না, জানে ওরা, যা আছে সব মৃত, তাই উটের পিঠে যতটা সম্ভব বোঝাই করে নিয়েছে পানি। জিনিসপত্র তো আছেই। এত বোঝা নিয়ে চলতে গেলে গতি হয়ে যাবে ধীর।'

'শুনেছি, মরুভূমিতে রাতের বেলা চলাচল করে আদিবাসীরা। তারা দেখে দিক ঠিক করে। দিনে চলবে কি করে?'

'আমিও সেই কথাটাই ভাবছি,' মাথা দোলাল ওমর। 'এর একটাই জবাব, কম্পাস আছে ওদের কাছে। আরবরা কম্পাস ব্যবহার করে না। তারমানে কোন বিদেশী আছে ওদের সঙ্গে, কোন সন্দেহ নেই।'

'মরুঝড়ের ভয় করছে না? হাবুব? উঠলে তো শেষ।'

'ঝুঁকি নিয়েই যাচ্ছে। এর একটাই অর্থ, বিরাট কোন লাভের আশা আছে।'

'টাকা!' বলে উঠল কিশোর।

ঝট করে ওর দিকে ঘুরে গেল দুই জোড়া চোখ—মুসা আর রবিনের।

ভুরু কুঁচকে মুসা বলল, 'ডাকাতির টাকা লুকানো আছে ভাবছ নাকি ওখানে?'

'না, নগদ টাকা নয়, গুপ্তধন।'

মুচকি হেসে সিগারেট বের করল ওমর। কিশোরের দিকে চোখ।

'আগে ছিল অনুমান,' কিশোর বলল, 'এখন আমার দৃঢ় বিশ্বাস, রাজা রাস টেনাজার কবর খুঁজতে যাচ্ছে হুরুম একটাই উদ্দেশ্যে—জানে প্রচুর ধনসম্পদ পাওয়া যাবে। সেগুলো লুট করবে সে।'

উত্তেজিত হয়ে পড়ল রবিন, 'আমরাও তো গুপ্তধন উদ্ধারের চেষ্টা করতে পারি?'

'না, পারি না,' সিগারেটে টান দিয়ে ধোঁয়া ছেড়ে ওমর বলল। 'টাকা খরচ করে জেনারেল আমাদের পাঠিয়েছেন তাঁর ছেলেকে খুঁজে বের করার জন্যে। গুপ্তধন নয়।'

কিছুক্ষণ চুপচাপ থাকার পর ওমরের দিকে তাকাল কিশোর, 'আচ্ছা, পান্নার খনিটার ব্যাপারে কি ধারণা আপনার? সত্যি আছে?'

'থাকা সম্ভব। কারণ আশেপাশে যতগুলো কবর আবিষ্কার হয়েছে, সবগুলোতে পান্নার ছড়াছড়ি ছিল। খনি না থাকলে এত পাথর পাবে কোথায় ওরা? মরুভূমি পার হয়ে গিয়ে অন্য কোনখান থেকে বয়ে এনেছে, এটা হতে পারে না।'

'তারমানে হুরুমের আসার পেছনে আরও একটা কারণ যোগ হচ্ছে,' আনমনে বলল কিশোর, 'পান্না। গুপ্তধনের খোঁজ করবে, সেই সঙ্গে চালাবে খনি আবিষ্কারের চেষ্টা। দ্রুত বড়লোক হওয়ার সহজতম উপায়।'

ছয়

পরদিন ভোরে আবার রওনা হলো ওরা। এবারে কোর্স বদল করে নিল কিছুটা। পর্বতের মাঝামাঝি জায়গায় পৌছার ইচ্ছে, আগের দিন যেখান থেকে খোঁজা শেষ করে ফিরে গিয়েছিল।

কাফেলার দেখা পাওয়া যাবে—ঠিকই অনুমান করেছিল ওমর। পনেরো মিনিটের মাথায় সামনে দেখা গেল দলটাকে। সারি দিয়ে পর্বতের দিকে এগিয়ে চলেছে ছয়টা উট। বিমানের শব্দ পেয়েও থামল না। গতি বাড়ানোরও চেষ্টা করল না।

'নিশ্চয় আমাদের দেখেছে,' পাঁচ হাজার ফুট ওপর থেকে নিচে তাকিয়ে বলল রবিন। 'থামছে না কেন?'

'থামার কোন কারণ নেই,' জবাব দিল কিশোর। 'গতিও বাড়াচ্ছে না, তার কারণ খুব ভাল করেই জানে, প্লেনের সঙ্গে পারবে না। যদি বুঝেও থাকে আমরা পর্বতে যাচ্ছি, কিছু করার নেই ওদের।'

কাফেলার মাথার ওপর দিয়ে পার হয়ে এল বিমান। দূরবীন চোখে লাগিয়ে

দেখছে রবিন। মুসা জিজ্ঞেস করল, 'কি দেখছ?'

'পাঁচটা উটে পাঁচজন আরোহী। আরেকটা উটে শুধুই মালপত্র।'

'ওপরে তাকাচ্ছে?' জানতে চাইল কিশোর।

'মনে হয় না।'

'বিদেশী কাউকে চোখে পড়ছে?'

'বুঝতে পারছি না। এমন করে মাথা আর মুখ ঢেকে রেখেছে, কিছুই বোঝার উপায় নেই।'

'টুয়ারেগ তো, তাই। অন্য কেউ হলে এ কাজটা করত না। সব সময় এ ভাবে মুখ ঢেকে রাখে ওরা। খাওয়ার সময়ও সরায় না। খাবার মুখে পোরার জন্যে কাপড়ের নিচের দিকটা সামান্য একটু ফাঁক করে কেবল।'

কিশোরের দিকে তাকাল মুসা, 'টুয়ারেগরা কি আরব নাকি?'

'না। ওরা আলাদা উপজাতি। বিশেষজ্ঞদের মতে মরুভূমির আদিমতম বাসিন্দাদের রক্ত রয়েছে ওদের শরীরে। সাহারা যখন সুজলা-সুফলা ছিল, তখন থেকে এই অঞ্চলে বাস করে আসছে ওদের পূর্বপুরুষেরা। দুর্ধর্ষ যোদ্ধা ওরা, দুর্দান্ত অভিযাত্রী। থাকারও কোন ঠিকঠিকানা নেই। আজ এখানে তো কাল ওখানে। বেপরোয়া, স্বাধীন। বিশ্বযুদ্ধের সময় ফরাসীদের সঙ্গে টক্কর লেগেছিল ওদের। ফরাসী বাহিনীর পুরো একটা সেনাদলকে ধ্বংস করে দিয়েছিল ওরা। ফরাসীরা ওদের কিছুই করতে পারেনি।'

'খাইছে! ওদের সঙ্গে আমাদের টক্কর না লাগাই ভাল।'

ঘন নীল আকাশের গম্বুজের নিচ দিয়ে একগতিতে উড়ে চলেছে বিমান। দিগন্তে পর্বতটা নজরে এল, যেন বিশাল কোন প্রাগৈতিহাসিক সরীসৃপের শিরদাঁড়া।

ওমরকে জিজ্ঞেস করল কিশোর, 'পর্বতেই যদি যাবে, এল আরিগে থেমেছিল কেন কাফেলাটা, বলুন তো?'

'হয়তো এল আরিগই ছিল ওদের জন্যে সবচেয়ে কাছের মরুদ্যান।'

'তা কেন হবে? ম্যাপে দেখছি উত্তরে আরও মরূদ্যান রয়েছে। সেগুলোতে প্লেন নামানোর জায়গা নেই, কিন্তু উটের পিঠে চড়ে যেতে বাধা কোথায়?'

'তাহলে হয়তো লোকের চোখে পড়া এড়ানোর জন্যে নির্জন এল আরিগ হয়ে এসেছে। এসব এলাকায় খবর ছড়ায় খুব দ্রুত, আর অনেকদূর পর্যন্ত। সেটা যাতে না ঘটে, তাই এই সতর্কতা।'

'হ্যাঁ, এইটা হতে পারে।'

পর্বতে পৌঁছে গেল বিমান। আগের দিন যে রকম দেখেছিল, সেই একই রকম বিষণ্ণ চেহারা প্রকৃতির, কোন পরিবর্তন নেই। চূড়াগুলো তিন-চারশো ফুট উঁচু। কোনটাকেই পর্বতের চূড়া বলা চলে না। তবে খাদের বুক থেকে গজিয়ে উঠেছে বলে আসল উচ্চতার চেয়ে বেশি উঁচু দেখায় বলেই হয়তো পাহাড় না বলে এটার নাম হয়েছে পর্বত।

পানির কোন চিহ্ন নেই এখানে। জীবন নেই। গাছপালা, ঝোপঝাড়, এমনকি একটা ঘাসের ডগাও চোখে পড়ে না। শুধুই বালি, পাথর, আর সিমেন্টের মত শক্ত কাদা। কিচ্ছু নেই আর।

আগের দিন যেখানে শেষ করেছিল, সেখান থেকে খোঁজা শুরু করল ওরা। রোদে পুড়ে, ফেটে, ভেঙে খসে গেছে পাথরের নরম অংশগুলো। বালি মেশানো বাতাস সেগুলোকে ঘষে ঘষে মসৃণ করে দিয়েছে। বিচিত্র সব চেহারা চূড়াগুলোর। কোনটা শাঙ্কব আকৃতির, কোনটা লম্বা থামের মত, কোন কোন থামের মাথা দূর থেকে দেখে মনে হয় টুপি বসানো। সবচেয়ে বেশি আছে ব্যাঙের ছাতার মত থাম। গোড়া ক্ষয় হতে হতে সরু হয়ে গেছে, মাথার ওপরে বিশাল এক ছাতা। দেখে মনে হয় ছোঁয়া লাগলেই ধসে পড়বে। পড়েও অনেক। মাথার ভার সইতে না পেরে ধসে পড়েছে।

সাদা রঙের কিছু জিনিস ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে এদিক ওদিক। হাড়, বোঝা যাচ্ছে। তবে মানুষের না জানোয়ারের, ওপর থেকে বোঝার উপায় নেই।

ওমর বলল, 'এখনকার মত এতটা খারাপ ছিল না অবস্থা। তাহলে প্রাণী আসত না এখানে।'

'সেটা কোনকালের কথা?' জিজ্ঞেস করল মুসা।

'জানি না।'

বিড়বিড় করে কিশোর বলল, 'হেলানো স্তম্ভের দিকে নজর রাখা দরকার।'

হেসে ফেলল ওমর, 'গুপ্তধনের চিন্তা দূর করতে পারছ না মাথা থেকে। ওসব বাদ দিয়ে বরং পলের প্লেনটা খোঁজো।'

যতটা সম্ভব বিমান নিচে নামিয়ে আনল ওমর। সাংঘাতিক ঝুঁকি নিয়ে উড়ে চলল বিচিত্র চেহারার স্তম্ভগুলোর ফাঁক দিয়ে। সতর্ক রইল যাতে ধাক্কা না লাগে। কোনভাবে ওগুলোতে ডানা সামান্য একটু ছোঁয়া লাগলেই দেখতে হবে না আর।

'হরিণগুলো গেল কোথায় আজ?' চঞ্চল হয়ে খুঁজছে কিশোরের চোখ। 'আশেপাশেই কোথাও থাকার কথা।'

'পাহাড়ের কোন খাঁজে লুকিয়ে আছে হয়তো,' ওমর বলল। 'অনেক হয়েছে। আর দু'তিন মাইল দেখেই চলে যাব আজ। বাকিটা কাল। পেট্রল যা আছে তাতে পাহাড়টা পুরো দেখা যাবে, কিন্তু মরুভূমিতে খোঁজা যাবে না। ফিরে যেতে হবে আমাদের।'

রোদের তাপ বেড়েছে। গরম হয়ে উঠেছে নিচের পাথর, দ্রুত আগুন করে দিচ্ছে বাতাসকে। বাম্পিং শুরু হয়েছে বিমানের। ভীষণ ঝাঁকুনি।

মুসা জিজ্ঞেস করল, 'কাফেলাটা কি জন্যে আসছে দেখবেন না?'

'না, আমার কোন আগ্রহ নেই। গুপ্তধন উদ্ধার করতে পারলে করুক, না পারলে নেই। আমি ওসবে নাক গলাচ্ছি না।'

কয়েক মিনিট পর ফিরে যাওয়ার জন্যে বিমানের নাক ঘোরাচ্ছে ওমর, এই সময় চিৎকার করে উঠল রবিন, 'এক মিনিট!' দূরবীন চোখ থেকে সরাচ্ছে না সে। 'সামনে ধোঁয়া দেখতে পাচ্ছি!'

'ধোঁয়া দেখবে কোত্থেকে? নিশ্চয় বালি উড়ছে। ঘূর্ণি নাকি দেখো।'

'না, ধোঁয়াই!' জোর দিয়ে বলল রবিন। 'সামনের দিকে এগোন আরেকটু।'

কয়েক সেকেণ্ড পর ওমরও স্বীকার করতে বাধ্য হলো, ধোঁয়াই।

'ধোঁয়া মানে মানুষ,' কিশোর বলল। 'তারমানে কেউ আছে এখানে।'

'তাই তো মনে হচ্ছে।'
'ধোঁয়া কেন?' মুসার প্রশ্ন।
'হয় খাবার রান্না করছে,' জবাব দিল কিশোর, 'নয়তো প্লেন দেখে সঙ্কেত দিচ্ছে।'
'অর্থাৎ আমাদের দেখেছে।'
'কিংবা এঞ্জিনের শব্দ কানে গেছে। দেখাটা কঠিন। কারণ এদিকে তাকাতে হলে সূর্যের দিকে চোখ পড়বে। শেষ হয়ে যাবে চোখ।'
'কাফেলার লোক?'
'না, ওরা না। ওদের পৌঁছতে কম করে হলেও আরও আটচল্লিশ ঘণ্টা লাগবে।'
'ওই যে, দেখতে পাচ্ছি ওকে!' আবার চিৎকার করে উঠল রবিন।
পাথরের আড়াল থেকে ছুটে বেরিয়ে এল একজন মানুষ। হাত-পা ছুঁড়ে উন্মাদের মত নাচতে শুরু করল। আশপাশে পুরো এলাকায় সবই স্থবির, কেবল ওই একটা নড়াচড়া প্রকট হয়ে চোখে পড়ে।
ওমরের দিকে তাকাল কিশোর, 'কি করবেন?'
'নামতে হবে।'
'লোকটা কি শ্বেতাঙ্গ?'
'কি করে বুঝব? এখানে যে কোন শ্বেতাঙ্গের কালো হতে বেশিদিন লাগবে না। আমাদের নিজের চামড়ার দিকেই তাকিয়ে দেখো।'
'পল নাকি?' লোকটার দিকে তাকিয়ে আছে রবিন।
'হতে পারে,' জবাব দিল ওমর।
নিচে চারপাশে খুঁজছে মুসার চোখ, 'ওর প্লেনটা কোথায়?'
'ওকে জিজ্ঞেস করলেই জানা যাবে। তোমরা চারদিকে কড়া নজর রাখো। নামলে মরব কিনা ল্যাণ্ড করার আগেই ভালমত বুঝে নেয়া দরকার।'
বিমান থেকে ওকে দেখতে পেয়েছে বুঝে আকাশের দিকে হাত তুলে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে এখন লোকটা।
আরও কয়েক ফুট নামিয়ে এনে ওর মাথার ওপর দিয়ে উড়ে গেল ওমর। লোকটার দিকে তাকাচ্ছে না সে, চোখ সামনের চূড়াগুলোর ওপর স্থির। একটু এদিক ওদিক হলেই ধ্বংস হয়ে যাবে।
লোকটার দিকে তাকিয়ে আছে তিন গোয়েন্দা।
'শ্বেতাঙ্গই মনে হচ্ছে,' কিশোর বলল।
'আমার কাছে তো লাগছে আরবদের মত কালো,' বলল মুসা। 'শার্ট-প্যান্টের অবস্থা দেখো। কিছুই নেই বলতে গেলে।'
'হুঁ, ছিঁড়ে সব ফালাফালা,' রবিন বলল। 'আর চুল কত লম্বা দেখো। টারজান সেজে আছে।'
'হবেই,' কিশোর বলল। 'দুমাস চুল না কাটলে তোমার চুলও কম লম্বা হবে না।'
'আমি নামছি।' সতর্ক করল ওমর, 'শক্ত হয়ে বসো।'

'পারবেন?'

'চেষ্টা করে দেখি। মাটি শক্তই মনে হচ্ছে। চুপ করে থাকো সবাই। আমার মনযোগ নষ্ট কোরো না।'

নামার জায়গা নির্দিষ্ট করে ছোট একটা চক্কর দিয়ে এল ওমর। নীরব হয়ে আছে সবাই। ভয়ানক ঝুঁকি নিতে যাচ্ছে। কোন একটা ফাটলে যদি চাকা আটকায়, কোন পাথরে ধাক্কা খায় ডানা কিংবা প্রপেলার, বিমানের ক্ষতি হয়, আর উড়তে না পারে; তাহলে কি ঘটবে ভেবে দুরুদুরু করছে বুক।

নিরাপদেই ল্যাণ্ড করল বিমান। প্রচুর ঝাঁকি আর দুলুনি সহ্য করতে হলো, তবে বিমানের কোন ক্ষতি হলো না। শক্ত মাটিতে কিছুদূর দৌড়ে এসে মানুষটার কাছাকাছি পৌঁছে দাঁড়িয়ে গেল। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল সবাই।

'টলছে কেমন দেখো,' প্রথম কথা বলল ওমর। 'ওকে তো অসুস্থ লাগছে।'

'এই নরকে থাকতে গেলে কে অসুস্থ হবে না,' কিশোর বলল।

ওরা যাওয়ার আগেই ধপ করে বসে পড়ল লোকটা। তবে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল না।

বিমানের দরজা দিয়ে লাফিয়ে নামল ওমর। দৌড় দিল লোকটার দিকে। পেছনে তিন গোয়েন্দা।

পরিষ্কার ইংরেজিতে দুর্বল কণ্ঠে বলে উঠল লোকটা, 'থ্যাংক গড, আপনারা এসেছেন!'

'আপনি কি পল কাস্টার?' জিজ্ঞেস করল ওমর।

'হ্যাঁ। নাম জানলেন কিভাবে?'

'আপনার বাবা আপনাকে খুঁজে বের করে নিয়ে যেতে পাঠিয়েছেন আমাদের। আপনি অসুস্থ?'

'না, আমি ঠিকই আছি। খাবার পাইনি তো, তাই একটু দুর্বল।'

'খাবারের চেয়ে পানি দরকার বেশি আপনার।'

'না, পানির কষ্ট নেই। পানি আছে।'

ওমর অবাক। 'পানি আছে?'

'চলুন, দেখাচ্ছি।'

'না, দরকার নেই। পানি আছে আমাদের কাছে। হুরুম কোথায়?'

'চলে গেছে।'

'মানে?'

'প্লেন নিয়ে চলে গেছে।'

'আপনাকে ফেলে গেছে বলতে চাইছেন?'

'হ্যাঁ।'

'খাবার রেখে যায়নি?'

'কিছুই রেখে যায়নি। আমাকে মরার জন্যে ফেলে গেছে। ও জানে না পানি আছে এখানে। আমিও জানতাম না। ফিরে এসে আমাকে মরা দেখতে চেয়েছে।'

'ফিরে আসবে?'

'আসবে,' তিক্তকণ্ঠে বলল পল। 'ফিরে তাকে আসতেই হবে।'

'থাক, আপনার কষ্ট হচ্ছে, কথা পরেও বলা যাবে। চলুন, প্লেনে, আগে আপনার খাওয়ার ব্যবস্থা করি। তারপর বাড়ি ফিরে যাব।'

'কিন্তু আমি তো যাব না।'

ভুরু কোঁচকাল ওমর, 'কি বললেন?'

'বাড়ি যাব না। অন্তত এখন।'

এই প্রথম খেয়াল করল ওমর, পলের মাথায় হ্যাট নেই। 'রোদের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছেন কি করে? মাথায় গরম লাগছে না?'

'আমার কোন অসুবিধে হয় না, সহ্য হয়ে গেছে। কিছু খাবার দিয়ে চলে যান। জেনে তো গেলেন, আমি কোথায় আছি। বাবাকে বলবেন। পারলে পরে এসে নিয়ে যাবেন আমাকে।'

'আপনার ইচ্ছেটা কি বলুন তো?'

'ওই শয়তান হুরুমকে আমি ছাড়ব না! বাবা ঠিকই বলেছে, লোকটা ভাল না। তখন বিশ্বাস করিনি।'

'এই দোজখে আরও থাকতে ইচ্ছে করছে আপনার?'

'থাকতে হবে, আর ক'টা দিন। এখানে কি ঘটেছে, শুনতে চান? নাকি চলে যাবেন? শুনতে হলে আরও কিছুক্ষণ থাকতে হবে।'

কাঁধ ঝাঁকাল ওমর। তিন গোয়েন্দার দিকে তাকাল। আবার ফিরল পলের দিকে। 'শুনব। আরও ঘণ্টাখানেক থাকা যাবে। খেতে খেতে কথা বলবেন, চলুন। মুসা, ধরো তো পলকে, প্লেনে নিয়ে যাই।'

'পাহাড়ের নিচে একজায়গায় ছায়া আছে,' পল বলল, 'পানিও আছে, ওখানে যাবেন? বেশির ভাগ সময় আমি ওখানেই কাটাই।'

'খুব একঘেয়ে আর বিরক্তিকর লেগেছে আপনার, তাই না?' জানতে চাইল কিশোর।

'না, তেমন একটা লাগেনি। প্রচুর কাজ ছিল আমার।'

অবাক লাগল কিশোরের। বলে কি? এখানে ওর কি কাজ ছিল? ভয়ানক এই জায়গায় একা থাকতে থাকতে মাথা খারাপ হয়ে গেল না তো?

ওমরের দিকে তাকাল সে।

সহানুভূতি দেখানোর ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল ওমর। তাগাদা দিল, 'আর কথা নয়। ধরো ওকে। তোলো, কেবিনে নিয়ে যাই।'

ধরে ধরে বিমানে তোলা হলো পলকে। খোলা রোদের মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকলে চুলার মত গরম হয়ে যাবে কেবিনের ভেতরটা। ছায়ায় নিয়ে যাওয়া দরকার।

এঞ্জিন স্টার্ট দিল ওমর। পলের নির্দেশ মত চালিয়ে এসে পাহাড়ের নিচে ছায়া দেখতে পেল। সেখানে বিমান রাখল সে।

সাত

জায়গাটা বিচিত্র। গিরিখাত, গিরিপথ দুইই বলা যেতে পারে। দুটো পাহাড়ের

দেয়াল গা ঘেঁষাঘেঁষি করে দাঁড়িয়েছে। মাঝখানে ফাঁক খুব সামান্য। নিচের দিকে দুটো দেয়ালই ভেতরের দিকে অনেকটা ক্ষয়ে গিয়ে গুহার মত হয়ে গেছে। সূর্য যখন মাথার ওপরে চলে আসে, তখন দুশো ফুট ওপরের ফাঁক দিয়ে চিলতে রোদ এসে পড়ে ভেতরে, এ ছাড়া বাকি সময়টা ছায়া থাকে। বাতাস চলাচল করতে পারে না বলে ভয়াবহ ভাপসা গরম, তবু গায়ে যে রোদ লাগছে না এটাই স্বস্তি।

গিরিখাতের মুখের কাছে যেখানটা বেশি চওড়া, সেখানে দাঁড়িয়ে আছে কয়েকটা জরাজীর্ণ খেজুর গাছ। দেখে খুশি হলো ওমর। বিমান রাখার এরচেয়ে ভাল জায়গা আর আছে কিনা এখানে সন্দেহ।

'দেখার প্রচুর সময় পেয়েছি,' বিস্কুট আর মাংস খেতে খেতে বলল পল। 'আশপাশে দুই মাইলের মধ্যে যত গর্ত, গুহা আর সুড়ঙ্গ আছে, সব আমার চেনা।'

'তাড়া নেই আমাদের, আস্তে আস্তে খান,' সাবধান করল ওমর, 'নইলে পেট ব্যথা করবে। এতদিন কি দিয়ে চালিয়েছেন?'

'ভাগ্য ভাল, কয়েক টিন খাবার নামিয়েছিলাম। কিছুদিন চালিয়েছি সেগুলো দিয়ে। আর ওই যে খেজুর গাছ দেখছেন, ওগুলোর খেজুর খেয়েছি।'

'ও তো মরা গাছ মনে হচ্ছে।'

'না, মরা নয়। ফলও ধরে। গাছে চড়তে পারি না আমি। নিচে যা পড়ে ছিল কুড়িয়ে নিয়ে মুখে দিয়ে দেখি পুরানো চামড়ার মত শক্ত। পেটের খিদেয় তাই চিবিয়েছি। খাবার নিয়ে ভাবিনি প্রথমে, আমার আসল চিন্তা ছিল পানির।'

'হ্যাঁ, পানি কোথায় পেলেন? এমন জায়গায় পানি আছে আমার তো বিশ্বাসই হচ্ছে না।'

ভেতরের দিকে হাত তুলে দেখাল পল, 'এর শেষ মাথায়। একটা গুহা আছে। তার ভেতরে একটা ছোট ডোবার মত আছে, তাতে পানি। বহুকাল আগে হয়তো বৃষ্টি হয়ে পানি জমা হয়েছিল পাহাড়ের ভেতরে কোনখানে, সেখান থেকে চুঁইয়ে এসে ডোবায় পড়ে।'

বিশ্বাস হলো না মুসার, 'এখানে বৃষ্টি হয়?'

'হয়,' জবাব দিল ওমর, 'কালেভদ্রে। সেটা দুশো-তিনশো বছরে একবারও হতে পারে।'

'মোট কথা, পানি আছে এখানে,' পল বলল। 'বৃষ্টির পানি যদি নাও হয়, পানির অন্য কোন উৎস আছে পাহাড়ের ভেতরে, হয়তো ভূগর্ভ থেকে উঠে আসে। ডোবাটা আমার কাছে প্রাকৃতিক মনে হয়নি। মানুষের খোঁড়া। বহুকাল আগে মানুষ বাস করত এই গুহায়।'

'কি করে জানলেন?' জিজ্ঞেস করল কিশোর।

'ডোবার আশেপাশে মাটির তৈরি ভাঙা পাত্র পড়ে আছে। কিছু অস্ত্র দেখেছি যেগুলো পাথরযুগের মানুষের বানানো। এখানে আসার আগে সাহারা মরুভূমির ওপর প্রচুর পড়াশোনা করেছি আমি। তাই কাদের তৈরি জিনিস ওগুলো, অনুমান করতে কষ্ট হয়নি।'

'ডোবাটার কথা হুরুম জানে?'

'মনে হয় না। ও চলে যাওয়ার পর ওটা আবিষ্কার করেছি আমি।'

'করলেন কি করে? আশ্চর্য!'

'অনেকটা ভাগ্যই বলতে হবে। ও চলে যাওয়ার পরদিন বসে বসে ভাবছি, ধাক্কাটা সামলানোর চেষ্টা করছি, হঠাৎ দেখি কয়েকটা সাদা জানোয়ার এসে হাজির হয়েছে খাতের একমাথায়।'

'অরিক্স!' প্রায় চেঁচিয়ে উঠল রবিন, 'প্লেন থেকে দেখেছি আমরা!'

'হ্যাঁ, অরিক্স। ওগুলোকে দেখেই আনন্দে দুলে উঠল মন। বুঝলাম, পানি আছে। ওগুলো কোনদিকে যায় দেখার জন্যে মরার মত পড়ে রইলাম। আমাকে পার হয়ে খাতের অন্য মাথায় চলে গেল। ঢুকে গেল গুহার ভেতরে। পা টিপে টিপে এগোলাম। আমার গন্ধ পেয়েই বোধহয় হুড়মুড় করে গুহা থেকে বেরিয়ে পালিয়ে গেল ওগুলো। পেয়ে গেলাম ডোবাটা। সেদিন হরিণগুলো না এলে এতদিনে কবে আত্মহত্যা করে বসতাম। পানির কষ্টে তিলে তিলে মরার চেয়ে মাথায় গুলি করে নিজেকে শেষ করে দেয়া অনেক ভাল।'

'বন্দুক আছে নাকি আপনার কাছে?' জানতে চাইল কিশোর।

'পিস্তল। দুর্গম, অচেনা অঞ্চলে যাচ্ছি ভেবে বেরোনোর সময়ই আত্মরক্ষার জন্যে সঙ্গে নিয়েছিলাম।'

'তাহলে খাবারের অভাবে ধুঁকছিলেন কেন?' ভুরু নাচাল মুসা। 'গুলি করে হরিণ মেরে খেলেই পারতেন?'

'তা পারতাম। ডোবার কাছে লুকিয়ে থাকলেই হত। হরিণেরা পানি খেতে এলে মাথায় মেরে দিতে পারতাম।'

'তাহলে মারলেন না কেন?'

হাসল পল। বোকা বোকা দেখাল হাসিটা। 'পারিনি, তার কারণ আমার প্রাণ বাঁচানোর জন্যে ওগুলোর প্রতি কৃতজ্ঞ আমি।'

'একটা মারলে আর কি হত?'

'হত। চোখের সামনে এক সঙ্গীকে মারা যেতে দেখলে বাকিগুলো ভয় পেয়ে যেত, ডোবায় আসার সাহস পেত না আর। এখানে আর কোথাও পানি না থাকলে পানির অভাবে মারা পড়ত সবগুলো জানোয়ার। আমার একটা জীবনের জন্যে এতগুলো জীবন ধ্বংস করা উচিত হত না।'

নতুন দৃষ্টিতে পলের দিকে তাকাল সবাই। ওমর বলল, 'কি হলো, আর খাচ্ছেন না?'

আবার হাসল পল। 'আর পারছি না। গলা পর্যন্ত ভরে গেছে।'

'শরীর কেমন লাগছে এখন?'

'ফাইন।'

'গুড। আশা করি পুরো কাহিনীটা শোনাতে পারবেন এখন। গোড়া থেকে।'

মাথা ঝাঁকাল পল, 'পারব। এখানে আসার আগে সব ঠিকঠাকমতই চলছিল। কোথাও কোন খুঁত ছিল না, অতি সাধারণ একটা ঘটনা ছাড়া। ওই সাধারণ ঘটনাটাকেই যদি তখন গুরুত্ব দিতাম, সাবধান হতাম, তাহলে আজকের এই অবস্থায় আর পড়তে হত না আমাকে। সিওয়াতে তিনদিন ছিলাম আমরা। ওখানে থাকতে রোজ বেরোত হুরুম, একা একা। আমাকে সঙ্গে নিত না, কি করতে

যাচ্ছে তাও বলত না। একদিন জিজ্ঞেস করায় হেসে উড়িয়ে দেবার মত করে বলল কোনপথে গেলে আমাদের সুবিধে হবে খোঁজ নিতে যায়।'

'ওর কথা বিশ্বাস করেছিলেন?' জিজ্ঞেস করল কিশোর।

'না করার কোন কারণ ছিল না। ভেবেছি, সিওয়ার আঞ্চলিক ভাষা ও জানে, আমি জানি না; কোন সাহায্য করতে পারব না ভেবে আমাকে সঙ্গে নেয় না।

আঙুল তুলল ওমর, 'একটা কথা আগে জেনে নিই—হুরুম কি প্লেন চালাতে জানে?'

'অভিজ্ঞ পাইলট বলা যাবে না ওকে, তবে চালাতে পারে। এখন যতটা জানে, আগে, আমার সঙ্গে দেখা হওয়ার সময় তাও জানত না। আমরা যখন আসছি, ভূমধ্যসাগরের ওপর দিয়ে উড়ে আসার সময় হঠাৎ আমাকে বলল, সে চালাতে চায়।'

'অবাক হননি?'

'হয়েছি। জিজ্ঞেস করলাম, সে যে প্লেন চালাতে পারে আগে আমাকে বলেনি কেন? মিনমিন করে বলল, কি করে চালাতে হয়, সেব্যাপারে প্রাথমিক জ্ঞান আছে কেবল, প্র্যাকটিস নেই। সুযোগ পায়নি। দিয়ে দেখলাম, ঠিকই বলেছে। বুঝলাম, নামানো কিংবা ওঠানোর জন্যে তার হাতে ছেড়ে দিলে বিপদ ঘটাবে।'

'কিন্তু আপনি তাকে প্র্যাকটিস করিয়ে অভিজ্ঞ বানিয়ে দিয়েছেন।'

'অনেকটা। ওর ভুলগুলো ধরিয়ে দিয়েছি। দ্রুত শুধরে নিয়েছে সে। ভালমত প্লেন চালানো শেখার জন্যে কেন এত অস্থির হয়েছিল, তার কারণ এখন জানি। আমি ভেবেছিলাম, চালানো শেখা থাকলে যদি কোন জরুরী অবস্থার সৃষ্টি হয়, কাজ চালাতে পারবে। সেজন্যেই শিখিয়েছিলাম।'

অপ্রাসঙ্গিকভাবে জিজ্ঞেস করল কিশোর, 'ওর দেশ কোথায়?'

'মিশরে।'

'ও বলেছে?'

'হ্যাঁ।'

'আপনি বিশ্বাস করেছেন?'

'না করার কোন কারণ নেই। ইজিপশিয়ান আর্কিওলজিক্যাল সোসাইটিতে কাজ করেছে।'

'এটা ওর মুখের কথা।'

ভুরু কুঁচকে গেল পলের, 'মানে?'

'আপনার আব্বা খোঁজ নিয়ে জেনেছেন সোসাইটি ওর নামও শোনেনি কখনও।'

'মিথ্যে কথা বলল কেন হুরুম?'

'আপনাকে বিশ্বাস করানোর জন্যে যে সে একজন শিক্ষিত আর্কিওলজিস্ট। যাই হোক, বলুন এখন আপনার কাহিনী।'

'যা বলছিলাম,' আবার শুরু করল পল, 'এখানে আসার আগে কোন গোলমাল হয়নি। সিওয়া থেকে দক্ষিণে রওনা হলাম আমরা। একসারি মরুদ্যানের ওপর দিয়ে প্রায় দুশো মাইল এগোলাম। শুকিয়ে গেছে মরুদ্যানগুলো, কোনটাতে নামলাম

না। নামার প্রয়োজনও বোধ করিনি। মানুষ তো দূরের কথা, জীবন্ত কোন প্রাণীই চোখে পড়েনি ওসব জায়গায়। পৌঁছলাম এসে এই পাহাড়ে। নামার আগে একটা বিশেষ জিনিস খুঁজতে আরম্ভ করল হুরুম।'

'কি?' গলা কাঁপছে কিশোরের।

'লম্বা একটা হেলানো পাথরের স্তম্ভ, যার গোড়ায় কবর দেয়া হয়েছে এক প্রাচীন রাজাকে।'

'পেয়েছেন?' শান্তকণ্ঠে জিজ্ঞেস করল ওমর।

জবাব শোনার জন্যে আগ্রহে সামনে গলা বাড়িয়ে দিল মুসা।

'অনেক স্তম্ভই দেখেছি, কিন্তু কোনটার গোড়ায় আছে কবর, শিওর হতে পারলাম না। ওভাবে ঘোরাঘুরি করলে অহেতুক পেট্রল পোড়াব ভেবে আমি বললাম, নেমে গিয়ে হেঁটে দেখা দরকার। নামার সময় একটু ভয় ভয় লাগছিল, যদি প্লেনের কোন ক্ষতি হয়? তাহলে ফেরা মুশকিল হয়ে যাবে। তবে কোন অঘটন ঘটল না।'

রবিনের দৃষ্টি তীক্ষ্ণ হয়ে উঠেছে। 'তারপর?'

'প্লেন রাখার জন্যে জায়গা খুঁজে বের করলাম, একটা ছায়া ঢাকা উপত্যকা, দুই পাহাড়ের মাঝখানে। অনেকটা এ জায়গাটার মতই। পানির বোতল আর খাবারের টিন নামালাম। দুদিন থাকার ইচ্ছে ছিল আমাদের। কিন্তু চারপাশে তাকিয়ে দমে গেলাম। এত পাথরের মধ্যে থেকে আসল পাথরটা খুঁজে বের করব কিভাবে?'

'যেখানে নামলেন সেখানে নামার কোন বিশেষ কারণ ছিল?' জানতে চাইল কিশোর।

'নাহ্। জায়গাটাকে প্লেন নামানোর জন্যে ভাল মনে করেছিলাম। কাছাকাছি কিছু খেজুর গাছ আর ঝাশউডের ঝোপ আছে। তবে দেখে মনে হয় না জ্যান্ত। ভেবেছিলাম, গাছ যেহেতু আছে, পানি থাকতেও পারে। আমার বিশ্বাস, এক সময় বেশ কয়েকটা মরুদ্যান ছিল এই পাহাড়ে।'

'হ্যাঁ, তারপর বলুন। প্লেন নামালেন, তারপর?'

'হাঁটতে বেরোলাম। সঙ্গে চলল হুরুম। পুরোপুরি শান্ত রইল। জায়গা নিয়ে কোন মন্তব্য করল না, রাগ বা বিরূপতা দেখাল না। ও-ই খুঁজে বের করল কবরটা।'

ভুরু উঁচু হয়ে গেল ওমরের, 'করেছে!'

'হ্যাঁ, করেছে। যেদিন আমরা নামলাম তার পরদিন। ভোর হওয়ার আগেই বেরিয়ে পড়েছি আমরা। চাঁদের আলো ছিল। বেশ কিছুদূর হেঁটে গেলাম। ভোরের আলো ফুটতে একটা বুদ্ধি বের করল হুরুম। বলল, পাহাড়ের ওপর উঠে গিয়ে দেখবে। উঠে গেল সে। আমি নিচে দাঁড়িয়ে রইলাম। খানিক পর এত জোরে নেমে আসতে লাগল, পিছলে পড়ে যে ঘাড় ভাঙেনি সেটাই আশ্চর্য। নেমে এসে বলল হেলানো স্তম্ভটা দেখতে পেয়েছে। সূর্য উঠছে তখন। বেশি রোদ উঠলে যেতে কষ্ট হবে। তাড়াতাড়ি হাঁটতে লাগলাম পাথরটার কাছে যাওয়ার জন্যে।'

'তারপর পেলেন কবরটা?'

'পেলাম। ওপরটা গম্বুজের মত। হাতে কেটে পাথর এমন ভাবে একটার সঙ্গে আরেকটা লাগানো হয়েছে, ফাঁক প্রায় দেখাই যায় না। গায়ে খোদাই করে কিছু লেখা। ওটা যে কোন্ ভাষা, আদৌ কোন ভাষা কিনা, কিচ্ছু বোঝা যায় না। আশেপাশে আরও অনেক পাথর আছে যেগুলোর গায়ে ওরকম খোদাই করা। হতে পারে ওগুলোও কবর, সাধারণ লোকের, পাথরগুলো কবরের ওপরের ফলক। একটা পাহাড় আছে, তাতেও ওরকম খোদাই করা পাথর আছে অনেক। বেশ কিছু গর্ত আছে। উঁকি দিলে দেখা যায় মমি হয়ে যাওয়া মানুষের লাশ। বেশ বড়সড় একটা বসতি ছিল এখানে একসময়।'

হাসল ওমর। 'অনেক তো খেটেছেন। সময় কাটাতে পেরেছেন সেজন্যেই।'

'তা ঠিক। শুধু বসে থাকতে হলে মারা পড়তাম।'

'আর কিছু পেয়েছেন?' জিজ্ঞেস করল মুসা।

'পেয়েছি। একটা পান্নার খনি।'

'খাইছে!'

চোখ বড় বড় হয়ে গেল রবিনের, 'পান্নার খনিও পেয়েছেন?'

'মনে হয়। রাজার কবর থেকে খানিক দূরে একটা পাহাড় আছে। তাতে বিরাট এক গর্ত—একটা সুড়ঙ্গের মুখ। একদিন ঢুকে পড়লাম ভেতরে। কয়েক পা গিয়েই ছুটে বেরিয়ে এলাম। গুহার মধ্যে সাপ কিলবিল করছে। একসঙ্গে এত সাপ আর জীবনে দেখিনি। কি খেয়ে যে বাঁচে ওরা ঈশ্বরই জানে! আমার বিশ্বাস মমি হয়ে যাওয়া মানুষের মাংস খায়। একে অন্যকেও খায় হয়তো।'

'হরিণগুলোই বা কি খায়?' মুসার প্রশ্ন।

হেসে ফেলল রবিন, 'খাওয়ার কথাটা সবার আগে মাথায় আসে তোমার।'

'আসবেই। ওটাই বেঁচে থাকার জন্যে সবচেয়ে জরুরী।'

পল বলল, 'তা ঠিক। হরিণগুলো কি খেয়ে বাঁচে, সেটাও একটা রহস্য। পাহাড়ের ভেতরে কোথাও হয়তো আছে ওদের খাবার।'

'খাবার নিয়ে ভাবছি না এখন,' কিশোর বলল। 'গর্তটাকে পান্নার খনি মনে হলো কেন আপনার, সেটা বলুন?'

'বাইরে পাথর পড়ে থাকতে দেখেছি। বোঝা যায় সুড়ঙ্গের ভেতর থেকেই বের করা হয়েছে। একটা পাথর নিয়ে এসেছি আমি।' পকেট থেকে বের করে দিল পল, 'এই দেখো।'

পাথরটা হাতে নিল কিশোর। বাকি তিনজনও ঝুঁকে এল দেখার জন্যে। খুব হালকা সবজে আভা বেরোচ্ছে পাথরটা থেকে। ভেতরে দাগ আছে। এর মানে ভাল জিনিস না। খুব কম দামী।

পলের দিকে তাকাল ওমর, 'খনিটার কথা জানে হুরুম?'

'মনে হয় না। ও যাওয়ার কয়েক দিন পর ওটা আবিষ্কার করেছি আমি। শুধু এই না, আরও একটা জিনিস পেয়েছি,' আবার পকেটে হাত ঢোকাল পল। বের করে আনল একটা মালা। মারবেলের মত গোল গোল গুটি দিয়ে বানানো। গুটিগুলো হলুদ ধাতুর তৈরি। ওমরের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বলল, 'ওজনটা দেখুন। সোনা।'

হাত বাড়াল ওমর। বিমূঢ়ের মত বলল, 'এটা কোথায় পেলেন?'

'গর্তের মধ্যে একটা মমির গলায়। এখানে লাশ পচে না। ভয়াবহ গরম আর শুকনো আবহাওয়ার কারণে শুকিয়ে মমি হয়ে যায়।'

মালাটা হাতের তালুতে রেখে ওটার দিকে তাকিয়ে রইল ওমর। বিড়বিড় করল, 'সোনাই!'

পল বলল, 'আমার ধারণা এ রকম আরও অনেক সোনা আছে ওই পাহাড়ে।'

'আমি ভাবছি অন্য কথা—যেখানে ধোঁয়া সেখানে আগুন,' আনমনে বলল ওমর। 'ঠিক তেমনি যেখানে সোনা সেখানে গণ্ডগোল!' পলের দিকে তাকাল, 'যাকগে, বলুন আপনার কাহিনী—কবরটা খুঁজে বের করার পর কি করলেন আপনি আর হুরুম?'

'এর পর থেকে হুরুম কি রকম বদলে গেল। আমার সঙ্গে কথা বলল না, তাকাল না, কি যেন ফন্দি আঁটতে লাগল মনে মনে। আমাকে খালি বলল, কবরটা ভাঙতে হবে। যন্ত্রপাতি দরকার।'

'যন্ত্রপাতি আনেননি সঙ্গে?'

'এনেছিলাম। এ রকম কিছু দেখতে পাব, ভাবিনি। তাই কেবল একটা হালকা গাঁইতি, একটা বেলচা আর একটা শাবল নিয়েছিলাম। বোঝার ভয়ে বেশি জিনিস নিইনি। প্লেনে ছিল ওগুলো। ও বলল, নিয়ে আসা দরকার। আমি যেতে চাইলাম। ও বলল, আমাকে থাকতে, ও-ই গিয়ে নিয়ে আসতে পারবে। প্রায় জোর করেই আমাকে রেখে আনতে গেল ও।'

'প্লেন থেকে কতদূরে ছিলেন তখন?' জানতে চাইল ওমর।

'মাইলখানেক।'

'ওর আচরণে সন্দেহ হয়নি আপনার?'

'হলে কি আর দাঁড়িয়ে থাকতাম। ওর আচরণ বদলে যেতে দেখে তখন ভেবেছি কবর আবিষ্কারের উত্তেজনায় অমন করছে। একটা মুহূর্তের জন্যে মনে হয়নি ও আমাকে ফেলে চলে যাবে। প্লেনটা যখন আকাশে উড়ল, নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারলাম না। যখন বুঝলাম, সত্যি আমাকে ফেলে চলে গেছে, অসুস্থ বোধ করতে লাগলাম। এখানে এভাবে আমাকে ফেলে যাওয়া আর গুলি করে মেরে রেখে যাওয়া একই কথা। ও আমার পানি আর খাবার বন্ধ করে নিষ্ঠুর ভাবে খুন করতে চেয়েছিল। ভাবতে পারেন?'

মাথা ঝাঁকাল ওমর, 'পারি। ওরকম লোক আছে দুনিয়ায়। নিজের স্বার্থের জন্যে করতে পারে না হেন কাজ নেই।' সিগারেট বের করল সে।

নড়েচড়ে বসল কিশোর, 'ফেলে যাওয়ার পর কি করলেন আপনি?'

'গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে। প্রথমে পানির বোতল থেকে পানি খেলাম। প্লেনটা যেখানে ছিল সেখানে গিয়ে দেখি খাবারের টিনগুলো পড়ে আছে। তুলতে গেলে দেরি হয়ে যাওয়ার ভয়ে ওগুলো নেয়নি হুরুম। খাবার দেখে খুশি হলাম না। ভাবলাম, ওতে আর কি হবে? মরতে কয়েক দিন দেরি হবে, এই যা। সঙ্গে পিস্তল আছে। গুলি করে নিজেকে শেষ করে দেয়ার কথা ভাবলাম। কিন্তু পারলাম না। মনে হলো, খাবার আর পানি আগে শেষ হোক। যখন যন্ত্রণা আর সহ্য করতে

পারব না, তখন দেখা যাবে। খুঁজে বের করলাম এই জায়গাটা। জিনিসপত্র সব নিয়ে এলাম এখানে। হরিণগুলো যখন পানির সন্ধান দিল, তখন আশা বাড়ল। মনে হলো, বেঁচে গেলেও যেতে পারি। খুব অল্প অল্প করে টিনের খাবার খেতে লাগলাম। সেই সঙ্গে খেজুর। দরকার হলেই ঢিল মেরে গাছ থেকে পেড়ে নিই। সেটাও রেশন করে খাই। রোজ কয়েকটার বেশি পাড়ি না। দুর্বল হয়েছি খাবারের অভাবেই।'

সিগারেটের ধোঁয়া ছেড়ে মুচকি হাসল ওমর, 'ভয়ানক দুঃসাহস আপনার, স্বীকার করতেই হবে। অন্য কেউ হলে আত্মহত্যা করাটাকেই বেছে নিত।'

নড়েচড়ে বসল কিশোর, 'একবারও মনে হয়নি আপনার, হুরুম আবার ফিরে আসতে পারে?'

'আমি শিওর, সে আসবেই। আসার জন্যেই গিয়েছে। নইলে আমাকে মরার জন্যে ফেলে যাবে কেন?'

'হুঁ, বুঝতে পারছি। ধনসম্পদ যা পাবে সব একাই ভোগ করার ইচ্ছে। ঝামেলা সরিয়ে দিতে চেয়েছে। ফিরে এসে গুপ্তধন তুলে নিয়ে হাওয়া হয়ে যাবে। সরকারকে জানাবেও না। আমার বিশ্বাস, সিওয়াতে কালোবাজারে ওসব জিনিস বিক্রি করে দেয়ার জন্যে লোক ঠিক করেই রেখে এসেছে সে, সেজন্যেই আপনাকে ফেলে একা একা বাইরে বেরোত। বিক্রির ব্যবস্থা পাকা করতে।'

মাথা ঝাঁকাল পল, 'এখন আমারও তাই ধারণা।'

'কি ভাবে ফিরে আসবে ও, প্লেনে করে? আপনার কি মনে হয়?'

'না, প্লেনে করে এলে লোকজন আনতে পারবে না। একা কবর ভেঙে মাল তুলে নিয়ে যেতে অসুবিধে হবে ওর। আমি নিশ্চিত, কাফেলা নিয়ে আসবে।'

দুই বন্ধুর দিকে তাকাল কিশোর। ওমরের দিকে ফিরল। মরুভূমিতে দেখে আসা কাফেলাটাই যে হুরুমের, এ কথা ভেঙে বলতে হলো না আর ওদের কাউকে।

আট

আরেকটা সিগারেট ধরিয়ে পলের দিকে তাকিয়ে হাসল ওমর, 'অনেক কাজ সেরে রেখেছেন আপনি, অনেক ভেবেছেন।'

'সময়ও পেয়েছি অনেক, সেটা ভুলে যাচ্ছেন কেন?' পল বলল। 'আর কিছু করার ছিল না আমার, তাহলে তাও করতাম। একমাত্র কাজ বাকি এখন কবরটা ভেঙে দেখা ভেতরে কি আছে। যন্ত্রপাতি থাকলে চেষ্টা করে দেখতাম।'

নিচের ঠোঁট কামড়াল কিশোর। আচমকা যেন ছুঁড়ে দিল প্রশ্নটা, 'নেই, কি করে জানলেন?'

'প্লেন থেকে নামাইনি, তাই নেই।'

'আপনি নামাননি। কিন্তু হুরুম তো নামাতে পারে? কতগুলো ভারি যন্ত্রপাতি কেন বয়ে নিয়ে গিয়ে আবার ফেরত আনবে, যেগুলো এখানে দরকার?'

'তাই তো! এ কথাটা কিন্তু ভাবিনি।'

'আপনার কি মনে হয় প্লেনটা যেখানে ছিল তার আশেপাশে কোথাও লুকিয়ে

রেখে গেছে?'

'জানি না। হুরুম বলেছে, ওই কবর ডিনামাইট ছাড়া ভাঙা যাবে না। এবার আসার সময় নিয়ে আসবে, জানা কথা।'

'তারপরেও শাবল-বেলচার দরকার হবে।'

'তা হবে।'

'এবার একা ও আসবে না,' ওমর বলল।

'তাও জানি।'

'তারপরেও আমাদের বিদেয় করে দিয়ে একা থাকতে চান?'

'চাই।'

'ও এলে কি করবেন?'

'লুকিয়ে থেকে অপেক্ষা করব। ও জানে না আমি বেঁচে আছি। সতর্ক হবে না। সুযোগ পেলেই গুলি করে মারব ওকে।'

'ওই খাটাশটাকে মারাই উচিত,' পলের সুরে সুর মেলাল মুসা।

'না উচিত না,' ওমর বলল, 'তাতে আইন নিজের হাতে তুলে নেয়া হয়।'

'আইন? কিসের আইন?' জ্বলে উঠল পল। 'এই জায়গায় আইন বলতে কিছু নেই। হুরুম যখন আমাকে খুন করার জন্যে ফেলে যেতে দ্বিধা করেনি, আমি কেন করব?'

'করবেন তার কারণ, আপনি ওর মত খুনী নন, অসভ্য নন।' সিগারেটে দুবার টান দিল ওমর। নাকমুখ দিয়ে ধোঁয়া ছেড়ে বলল, 'সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলুন, কি করবেন? খুব শীঘ্রি ওদের সঙ্গে দেখা হচ্ছে আপনার!'

স্থির দৃষ্টিতে ওমরের দিকে তাকিয়ে রইল পল, 'কাদের?'

'ছয়টা উটের কাফেলা নিয়ে এদিকেই আসছে ওরা এখন।'

'আপনি জানলেন কি করে?'

'আসার সময় দেখে এলাম।'

'ওরাই আমাদের শত্রু, কি করে জানলেন?'

'জানি। এল আরিগে আমাদের তাঁবু আর জিনিসপত্র সব পুড়িয়ে দিয়েছে। পেট্রল নষ্ট করেছে। তখন শিওর ছিলাম না কার কাজ। এখন জানি। পথের কাঁটা ভেবে আমাদের সরিয়ে রাখতে চেয়েছে।'

'হুরুম ছাড়া আর কেউ না!' মুঠো শক্ত হয়ে গেল পলের। 'আসতে দিন ওকে, তারপর দেখাব মজা! যত তাড়াতাড়ি আসে ততই ভাল।'

'অত ঝুঁকি না নিয়ে, যা ঘটেছে সব ভুলে গিয়ে আমাদের সঙ্গে আপনার বাড়ি চলে যাওয়াটাই কি ভাল না?'

'আমাকে কি এতটা কাপুরুষ মনে করেছেন আপনি!

'বাস্তবতা বোঝার চেষ্টা করুন। হুরুম যদি সঙ্গে করে একদল গলাকাটা তুয়ারেগ ডাকাতকে নিয়ে আসে?'

'যাকে খুশি আনুক, আমি কেয়ার করি না। আমি ওকে ছাড়ব না।'

'আমার মনে হচ্ছে,' কিশোর বলল, 'আরেকটা দিন অন্তত আমাদের থেকে যাওয়া দরকার। হুরুম যে আশায় আসছে—গুপ্তধন, সেটা বের করে সরিয়ে

ফেলতে পারলে ওর উচিত শিক্ষা হবে। তারপর শাস্তি দিতে পারলে ভাল, না পারলে নেই।' দুই সহকারীর দিকে তাকাল সে, 'তোমরা কি বলো?'

মুসা সঙ্গে সঙ্গে রাজি হয়ে মাথা নাড়ল, 'ঠিক।'

রবিনও মাথা ঝাঁকাল।

মুচকি হাসল ওমর, 'তাহলে আমিই বা আর বিদেয় হই কেন?' পলের দিকে তাকাল, 'আপনাকে পেয়েও এখানে ফেলে গেছি শুনলে আমার ওপর মোটেও খুশি হবেন না আপনার বাবা।'

রাগ চলে গেল পলের। হাসি ফুটল মুখে। 'ছয়টা উটে কজন লোক আসছে?'

'পাঁচজন,' জবাব দিল ওমর। 'একটা উটকে দিয়ে বোঝা বওয়াচ্ছে।'

'কখন পৌঁছবে মনে হয়?'

'কাল বিকেলের আগে পারবে না।'

'অনেক সময় পাব,' কিশোর বলল, 'এক কাজ করা যায়।'

ওর দিকে তাকাল পল, 'কি?'

'কাল ভোরে আবহাওয়া ঠাণ্ডা থাকতে থাকতে আমাদের কবরটা দেখাতে নিয়ে যাবেন। দেখা যাক কিছু করা যায় কিনা?'

'যন্ত্রপাতি থাকলে চেষ্টা করা যেত...'

'আছে কিনা খুঁজে দেখতে হবে। আমি শিওর, ওগুলো নিয়ে যায়নি হুরুম। চলুন, দেখব।'

হাত তুলল ওমর, 'দাঁড়াও। এখানে আমাদের থেকে যাওয়ার অর্থ হচ্ছে, হুরুমের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা। সতর্ক থাকতে হবে আমাদের। টক্কর লাগলে যাতে না মরি, তার জন্যে তৈরি থাকতে হবে। আমাদের প্রথম কাজ হবে প্লেনটাকে নিরাপদ রাখা। এটার কিছু হলে মহাবিপদে পড়ে যাব। দ্বিতীয় কাজ, পানির উৎস আটকে দেয়া। কি করব, বলি। প্লেনটা নিয়ে গিয়ে রেখে দেব গুহার মুখে। ওখানে বসে থাকব আমরা। তাতে প্লেন এবং পানি, দুটোই একসঙ্গে পাহারা দেয়া হবে।'

একমত হয়ে কিশোর বলল, 'সেটাই ভাল হবে। চলুন তো গুহার ভেতরটা দেখে আসি।'

ওদেরকে নিয়ে গেল পল। মাঝারি আকারের একটা গুহা। মেঝেতে একটা ডোবা, চৌবাচ্চা বলাই ভাল। দশ ফুট লম্বা, পাঁচ ফুট চওড়া আর ফুটখানেক গভীর। তাতে টলটলে পানি। পাথরের ফাটল দিয়ে পানি চুঁইয়ে এসে জমা হয় ওখানে।

ভাল করে দেখে ওমর বলল, 'অনেক পুরানো চৌবাচ্চা। তারমানে টুয়ারেগরা জানে এটার কথা। ওরা যেখানে বাস করে তার আশেপাশে কয়েকশো মাইলের মধ্যে কোথায় পানি আছে, জেনে রাখাটা ওদের জন্যে জরুরী।'

প্লেনটা নিয়ে এসে গুহামুখের কাছে আড়াআড়ি দাঁড় করিয়ে রাখল ওমর। তারপর সবাই মিলে রওনা হলো যন্ত্রপাতিগুলো আছে কিনা খুঁজে দেখার জন্যে।

খুব একটা ওপরে ওঠেনি সূর্য। কিন্তু এখনই ভয়াবহ গরম। ছায়ার বাইরে বেরোতেই গায়ে যেন ধাক্কা মারল রোদের আঁচ। কেউ কথা বলল না। সবারই জানা আছে, শরীরের আর্দ্রতা ধরে রাখতে হলে মুখ খোলা চলবে না।

আধঘন্টা একনাগাড়ে চলার পর থামল পল। 'এসে গেছি। এখানেই প্লেন নামিয়েছিলাম।'

দেখার কিছুই নেই। মাটিতে বিমানের চাকার আবছা দাগ। খানিক দূরে কয়েকটা খেজুর গাছ, দেখে মনে হয় মৃত। কয়েকটা শুকনো, বিবর্ণ ঝোপ আছে। এ ছাড়া চারপাশে প্রচুর যা রয়েছে, তা হলো পাথর আর বালি। সব কিছু ধুলোয় ধূসর।

পুরো একটা মিনিট চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল কিশোর। চোখ দুটো কেবল চঞ্চল হয়ে ঘুরতে লাগল এদিক ওদিক। স্থির হলো একটা ঝোপের ওপর। দীর্ঘ একটা মুহূর্ত তাকিয়ে থেকে পায়ে পায়ে এগিয়ে গেল সেদিকে। উবু হয়ে বসে উঁকি দিল ভেতরে। ছোট একটা বালির ঢিবি হয়ে আছে কিনারে। ওপরের বালি সরিয়ে ভেতরে হাত ঢুকিয়ে দিল। উজ্জ্বল হলো মুখ। ভেতর থেকে টেনে বের করে আনল একটা শাবল। পলের দিকে ফিরে তাকিয়ে হাসল।

বেলচা আর গাঁইতিটাও বেরোল ঢিবির ভেতর থেকে।

পল বলল, 'সত্যিই তো! এ কথাটা মাথায়ই ঢোকেনি আমার। তাহলে অনেক আগেই এগুলো খুঁজে বের করে কবর ভাঙার চেষ্টা করতাম।'

হেসে বলল রবিন, 'ভালই হলো। একসঙ্গে ভাঙব আমরা এখন।'

'যদি এই জিনিস দিয়ে ভাঙা সম্ভব হয়।'

যন্ত্রপাতিগুলো নিয়ে ফিরে চলল ওরা।

গুহায় এসে পানি খেয়ে ছায়ায় বসল। আগের প্রসঙ্গ তুলল পল, 'ওই কাফেলায় হুরুম থেকে থাকলে নিশ্চয় আপনাদের দেখেছে।'

'তা তো দেখেছেই,' ওমর বলল।

'ফিরে যেতে যেহেতু দেখেনি, ও বুঝতে পারছে আপনারা এখানে রয়ে গেছেন।'

'হয়তো।'

'আপনারা কেন এসেছেন, সেটা আন্দাজ করে ফেলবে।'

'তা তো করবেই। তবে একটা কথা ভুলেও ভাববে না, আপনি এখনও বেঁচে আছেন। সে ভাববে, আপনার মৃতদেহ খুঁজে পেয়েছি আমরা। সেটা নিয়ে যাওয়ার জন্যে দেরি করছি।'

কথা বলে বলেই দিনটা পার করে দিল ওরা। এত রোদের মধ্যে আর কিছু করারও নেই। পশ্চিম দিগন্তে নানা রঙের জন্ম দিয়ে অস্ত গেল সূর্য। রঙের এত বৈচিত্র আর উজ্জ্বলতা একমাত্র মরুভূমির আকাশেই সম্ভব। এরপর দ্রুত নামতে শুরু করল তাপমাত্রা। তবে খাদের ভেতরের বদ্ধ বাতাস অত তাড়াতাড়ি শীতল হলো না। হতে হতে রাত শেষ হয়ে যাবে।

খাবার বের করল রবিন। অল্প অল্প করে দিল সবাইকে।

বিশাল চাঁদ উঠল। মনে হচ্ছে রূপার তৈরি। তারাগুলোও অনেক বড় আর ঝকঝকে। সাংঘাতিক নীরব চারদিক। এত নৈশব্দ কল্পনাও করা যাবে না সভ্যজগতে। মনোযোগ দিয়ে লক্ষ করতে গেলে অস্বস্তি লাগে। কেমন ভয় ভয়ও।

বালিতে চেপে সিগারেটের আগুন নেভাল ওমর। 'আবহাওয়া গরম থাকতে

থাকতে ঘুমিয়ে নিই। ভোররাতে জাগার জন্যে ভাবনা নেই। ঠাণ্ডাই জাগিয়ে দেবে।'

নয়

ভোরের খানিক আগে ঘুম ভেঙে গেল রবিনের। শব্দ, নাকি ঠাণ্ডা, কোনটা ঘুম ভাঙিয়েছে ওর বলতে পারবে না। হয়তো দুটোই। উঠে বসল। শক্ত হয়ে গেছে শরীর। ওপরের চিলতে ফাঁকটা দিয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখল, ভোর হয়নি তখনও, তবে চাঁদের আলো নেই। তারাগুলোও উজ্জ্বলতা হারিয়েছে। স্পিরিট স্টোভে চা বসিয়েছে ওমর। পানি ফোটার মৃদু গুঞ্জন ছাড়া আর কোন শব্দ নেই।

'উফ্, যা ঠাণ্ডা!' গুঙিয়ে উঠল সে। 'কেন যে কম্বল ফেলে এলাম বাড়িতে। দিন, চা দিন, হাড়গুলোকে একটু গরম করি।'

হেসে ফেলল ওমর, 'হোটেল মনে করেছ নাকি এটাকে? উঠতে ইচ্ছে করছে না?'

রবিনও হাসল, 'সরি। থাক, আমিই উঠে আসছি।'

এক এক করে উঠে পড়ল সবাই। সংক্ষিপ্ত নাস্তা সেরে কবর দেখতে যাওয়ার জন্যে তৈরি হলো। মিথ্যে ভোরের আলোর আভা তখন ছড়িয়ে পড়েছে মরুভূমিতে।

'শাবল-বেলচাগুলো নেব?' জিজ্ঞেস করল মুসা।

পলের দিকে তাকাল ওমর, 'কদ্দূর যেতে হবে?'

'বেশি না। এই মাইল দেড়েক।'

'তাহলে আর নেয়ার দরকার নেই। দেখার পর যদি মনে হয় লাগবে, দৌড়ে এসে নিয়ে নেয়া যাবে। পল, এখনও ভেবে দেখুন যাবেন কিনা? নাকি সময় থাকতে থাকতে ওসব বেকার খাটুনি বাদছাদ দিয়ে বাড়ি রওনা হবেন?'

'ভাবনার কিছু নেই। আমি যাব।'

হাল ছেড়ে দেয়ার ভঙ্গি করল ওমর। 'বেশ, চলুন। আপনি আগে আগে হাঁটুন।'

রওনা হলো দলটা। সবার কাঁধে একটা করে পানির বোতল ঝোলানো।

একজায়গায় ধসে পড়েছে পাহাড়ের খানিকটা। পাথরের স্তূপ হয়ে আছে। পাথরের ওপর দাঁড়ালে ফাঁক দিয়ে মরুভূমি দেখা যায়। মুসাকে দেখে আসতে বলল ওমর।

ওপরে উঠে গেল মুসা। তাকাল ওরা যেদিক থেকে এসেছে সেদিকের মরুভূমির দিকে। মাইলের পর মাইল বিছিয়ে আছে বালি। কোথাও নড়াচড়ার কোন চিহ্নও নেই। ফিরে এসে জানাল সেকথা।

ওমর বলল, 'ওদের আসতে আসতে কমপক্ষে সন্ধ্যা।'

মাইলখানেক যেতে না যেতেই দিগন্তরেখা ভেঙে দিয়ে বেরিয়ে এল সূর্যের একটা কিনার। আগুনের মত রঙ। নদীর শুকনো বুক মাড়িয়ে হেঁটে চলল ওরা। ডানে বালির পাহাড়। ওপরটা চ্যাপ্টা। দেখে মনে হয় ছুরি দিয়ে পোঁচ মেরে কেটে

নেয়া হয়েছে চূড়াটা।

একটা পাহাড়ের ঢালের কাছ দিয়ে যাওয়ার সময় হাত তুলে দেখাল পল, হাঁ হয়ে থাকা একটা গুহামুখ। আগে নিশ্চয় অত বড় ছিল না, মানুষে কেটে বড় করেছে। মুখের কাছে স্তূপ হয়ে আছে মাটি আর পাথর। মুচকি হেসে বলল, 'ওটাই আমার পান্নার খনি।'

আরও কিছুটা এগিয়ে আবার হাত তুলে দেখাল। পাহাড়ের ঢালে অসংখ্য গর্ত। গায়ে গায়ে প্রায় লেগে আছে মৌচাকের খোপের মত। 'ওগুলো কবর। লাশগুলোকে ঠেলে কেবল ভেতরে ঢুকিয়ে দেয়া হয়েছে, মাটি চাপা দেয়নি। জানত, পচে বাতাস বিষাক্ত করবে না, শুকিয়ে যাবে।'

'ওখানেই সোনার মালাটা পেয়েছিলেন নাকি?' জানতে চাইল রবিন।

'হ্যাঁ।'

'তারমানে আরও আছে।'

'কোন সন্দেহ নেই। কৌতূহল হয়েছিল, তাই একটা গর্তে উঁকি দিয়েছিলাম। মালাটা সবে বের করেছি, অমনি হিসহিস করে বেরোতে শুরু করল সাপ। কে যায় কামড় খেতে। তাড়াতাড়ি পালিয়ে এসেছি।'

এগিয়ে চলল ওরা। মাঝে মাঝে হাত তুলে দেখায় পল, পাথরের গায়ে খোদাই করা বিচিত্র লেখা।

অবশেষে চোখে পড়ল হেলানো স্তম্ভটা। সূর্য তখন দিগন্তরেখার নিচ থেকে বেরিয়ে পড়েছে। আকাশের রঙ ঘন নীল।

স্তম্ভের আরও কাছে এসে দাঁড়াল ওরা। অনুমান করল কিশোর, পঞ্চাশ ফুট উঁচু হবে। গোড়ার চেয়ে ওপর দিকটা ভারি। বালি আর বাতাসের ক্রমাগত অত্যাচারে নিচের দিকটা ক্ষয়ে দুর্বল হয়ে গেছে। আকাশের দিকে মাথা তুলে রেখেছে যেন ওটা নীরব হুমকির মত। যেন বলতে চাইছে—খবরদার, বেশি কাছে এসো না, গায়ের ওপর ধসে পড়ব কিন্তু!

স্তম্ভের গোড়ায় একটা পাথরের গম্বুজ। বেড় বিশ ফুট মত হবে, উচ্চতা তার অর্ধেক। পাথর কেটে চুন-সুরকি বাদেই একটার সঙ্গে আরেকটা লাগিয়ে এমনভাবে জোড়া দেয়া হয়েছে, ফাঁক দেখা যায় না। ওস্তাদ কারিগরের কাজ। দরজা-জানালা-ফোকর কিচ্ছু নেই, যার ভেতর দিয়ে কবরে ঢোকা যায়।

'খাইছে!' চোখ বড় বড় করে তাকিয়ে থেকে বলল মুসা, 'এ তো আস্ত একখান পাথর মনে হচ্ছে!'

'পাথরই,' পল বলল, 'তবে ভেতরটা ফাঁপা।' ওমরের দিকে তাকাল সে, 'কি মনে হয়? ঢোকা যাবে?'

ধীরে ধীরে মাথা নেড়ে জবাব দিল ওমর, 'শাবল আর গাঁইতি দিয়ে ভাঙার প্রশ্নই ওঠে না। ঠিকই বলেছে হুরুম, ডিনামাইট দরকার।'

'তবে স্তম্ভটাকে আমার শক্ত মনে হচ্ছে না,' চিন্তিত ভঙ্গিতে তাকিয়ে থেকে বলল কিশোর। 'নাড়া লাগলেই যেন খসে পড়বে। পল, আপনি হাত দিয়েছেন?'

'না।'

'তারমানে ঠেলাটেলা দেননি?'

'না।'

'তুমি কি ভাবছ ঠেলেই ফেলে দেয়া যাবে এতবড় একটা পাথর?' মুসা বলল, 'এতই নরম?'

ওর কথার জবাব দিল না কিশোর। আনমনে বলল, 'এ রকম একটা বাজে জায়গায় কেন কবর দেয়া হলো? কি কারণ?' বলতে বলতে ওমরের দিকে তাকাল সে।

দুহাত নেড়ে ওমর বলল, 'আমার দিকে তাকিয়ে লাভ নেই। আমি জবাব দিতে পারব না। তা ছাড়া এই কবরের প্রতি আমার বিন্দুমাত্র আগ্রহ নেই। এখানে এসেছিলাম আমি পলকে খুঁজে বের করতে, তাকে পেয়েছি, অতএব আমার কাজ শেষ। আমি এখন ফিরে যেতে পারলে খুশি হই। ওই একশো টন পাথর নাড়াচাড়া করতে গিয়ে তার তলায় চিড়েচ্যাপ্টা হওয়ার ইচ্ছেও আমার নেই।'

হাসল পল, 'আমাদের সাহায্য করার ইচ্ছে নেই মনে হচ্ছে আপনার?'

'না, নেই। সাহায্য করতে গিয়ে যদি মারা পড়ি, কবরের ভেতর থেকে অন্য কেউ সোনার বালতি ভরে ধনরত্ন বের করে আনলেও আমার কোন উপকারে আসবে না। বরং কেউ যদি বলে এখন ভেতরে ঢুকলে একবাক্স গরম বারগার পেয়ে যাব, তাহলে মাথার ঘাম পায়ে ফেলতেও রাজি আছি।'

চড়াৎ করে নিজের উরুতে চাপড় মারল মুসা, 'ঠিক আমার মনের কথাটা বলেছেন, ওমরভাই। এখানে আসার পর থেকে আধপেটা খেয়ে থাকতে থাকতে আর ভাল্লাগছে না।'

'আমার অবস্থাটা বোঝো তাহলে,' পল বলল, 'প্রায় দুটো মাস কি কষ্টই না করেছি আমি।'

'সেটাই তো আমার মাথায় ঢুকছে না, এই কষ্ট করার পরও আবার এখানে থাকতে চাইছেন কেন?'

'ভুলে যাচ্ছ, আমি একজন আর্কিওলজিস্ট। আবিষ্কারের নেশায় আমার কোন কষ্টকেই কষ্ট মনে হয় না।'

'তা তো বুঝলাম,' কিশোর বলল, 'ঢুকবেন কি করে, ভাবছেন কিছু?'

পল জবাব দেবার আগেই রবিন বলে উঠল, 'আচ্ছা, এক কাজ করলে হয় না? মাটি খুঁড়ে সুড়ঙ্গ করে ভেতরে ঢুকে যেতে পারি আমরা।'

মাথা নাড়ল কিশোর, 'অসম্ভব! মাটি খুঁড়তে হলে কোদাল লাগবে। একটামাত্র গাঁইতি আর শাবল সম্বল করে এই গরমের মধ্যে সুড়ঙ্গ খোঁড়ার চেষ্টাটাই হবে আহাম্মকি। কাজের কাজ কিচ্ছু হবে না, স্রেফ মারা পড়ব।'

চুপ হয়ে গেল রবিন। বুঝতে পেরেছে, কিশোরের কথা ঠিক।

'এখানে দাঁড়িয়ে কোন উপায় বের করা যাবে না,' ওমর বলল। 'গরম কি, বাপরে বাপ! দাঁড়িয়ে থাকলে পায়ের তলায় ফোসকা পড়ে যাবে।'

ভয়াবহ গরমের মধ্যে পাহাড়ের ঢালের গোড়া ধরে গুহায় ফেরার পথে হঠাৎ বলে উঠল কিশোর, 'অরিক্সগুলো কোথায়? একবারও তো আসতে দেখলাম না পানি খেতে? এত মানুষ দেখে আসতে সাহস পাচ্ছে না বোধহয়।'

'ওদের কথা ভাবা লাগবে না,' পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে বলল ওমর,

'প্রতিকূল পরিবেশে কি করে টিকে থাকতে হয় খুব ভালই জানা আছে ওদের। হয়তো এই পাহাড়ে আরও কোথাও পানি আছে। মরুভূমি পার হয়ে কোন মরুদ্যানে চলে গেলেও অবাক হব না। পানি ছাড়া দীর্ঘদিন বেঁচে থাকতে পারে ওরা।'

গুহায় ফিরে আগে পেটভরে পানি খেয়ে নিল সবাই। তারপর বেরিয়ে এসে বসল গিরিখাতের ছায়ায়। শুরু হলো আলোচনা। মোটামুটি একজায়গাতেই সীমাবদ্ধ রইল প্রসঙ্গ: প্রত্নতত্ত্ব এবং প্রাচীন কবর।

'তাহলে বুঝতে পারছেন তো,' পল বলল, 'কবরটা পাওয়ার পরও ওতে ঢুকতে না পারায় কি মানসিক কষ্টেই না ছিলাম আমি। কারও মাথায় কোন বুদ্ধি আসছে না, না?'

মাথা নাড়ল ওমর, 'না। মাথা আমি ঘামাচ্ছিও না। আমি ভাবছি হুরুমের কথা। গলাকাটা টুয়ারেগগুলো হামলা চালালে কি করে ঠেকাব।'

হাত নেড়ে তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে পল বলল, 'আগে আসুকই না, তারপর দেখা যাবে।' তিন গোয়েন্দার দিকে তাকাল সে, 'তোমরা কোন বুদ্ধি বের করতে পারলে?'

'আমার মাথায় কিছুই আসবে না,' জানিয়ে দিল মুসা। 'যদি কেউ পারে,' কিশোরকে দেখাল সে, 'একমাত্র ও পারবে।'

কিন্তু কিশোরকে দেখে মনে হলো না ওদের কথায় কান আছে তার। চুপচাপ চিমটি কাটছে নিচের ঠোঁটে, আর ভাবছে।

রসিকতার ঢঙে বলল রবিন, 'জশুয়ার সেই গল্পটার কথা মনে আছে? সব সময় ভেরী নিয়ে যে ঘুরে বেড়াত। ভেরী বাজিয়ে ধসিয়ে দিত কত কিছু। তার ভেরীর শব্দে দেয়াল ধসে পড়েছিল জেরিকোর। ওরকম একটা যন্ত্র পেলে হত। কবরটা ধসিয়ে দিতে পারতাম।'

ভাবনায় ছেদ পড়ল কিশোরের। মুখ তুলে তাকাল, 'না, পারতাম না। জেরিকোর দেয়ালের চেয়েও ওই কবর শক্ত। ডিনামাইটই দরকার। তবে এক কাজ করতে পারি আমরা।'

ঝট করে সবগুলো চোখ একসঙ্গে ঘুরে গেল তার দিকে। ওমরের নিরাসক্ত চোখেও আগ্রহ দেখা দিল।

'কি?' অধৈর্য হয়ে জানতে চাইল পল।

'কবরটা আবার খুঁজে বের করতে দেরি করিয়ে দিতে পারি হুরুমকে।

'তাতে লাভ?'

'কবরটা সে খুঁজে না পেলে, কিংবা দেরি করে ফেললে এ যাত্রা আর ভাঙতে পারবে না। কারণ সঙ্গে করে এত খাবার কিংবা পানি আনতে পারবে না ওরা যে অনির্দিষ্ট কালের জন্যে থেকে যাবে। বড়জোর দু'তিন দিন, তারপরেই রসদ ফুরাবে। আনার জন্যে এখান থেকে চলে যেতেই হবে ওদের। আমরা তখন কবরে ঢোকার প্রচুর সময় পাব।'

'আমাদের পানির অভাব নেই, এটা ঠিক, কিন্তু খাবার?'

'ভুলে যাচ্ছেন, আমাদের কাছে একটা প্লেন আছে। হুরুমরা এক মাইল যেতে

যেতে আমরা একশো মাইল চলে যেতে পারব। ওদের অনেক আগেই গিয়ে সিওয়া থেকে খাবার আর অন্যান্য জিনিস নিয়ে আসতে পারব।'

'কিন্তু ওদের দেরি করাবে কি করে?' উত্তেজিত হয়ে উঠেছে পল।

'নিশানাটা নিশ্চিহ্ন করে দিয়ে। কবরটা যাতে সহজে খুঁজে না পায়

'তা তো বুঝলাম। করবে কিভাবে?'

'স্তম্ভটা ধসিয়ে দেব।'

দীর্ঘ একটা মুহূর্তের জন্যে স্তব্ধ হয়ে গেল সবাই। তারপর জিজ্ঞেস করল ওমর, 'ঠেলে ফেলবে নাকি গিয়ে?'

ভারি স্বরে কিশোর বলল, 'আমি সিরিয়াস, ওমরভাই, রসিকতা করছি না। পাহাড়ের ঢালে ওপর দিকে বড় বড় পাথর আছে স্তম্ভটা সই করে গড়িয়ে দেব। ধাক্কা লাগলেই পড়ে যাবে ওটা।'

'কিন্তু যদি কবরের ওপর পড়ে? ঢোকা আরও কঠিন হয়ে যাবে।'

'সেটা হুরুমের জন্যেও হবে। যখন বুঝবে, ঢুকতে পারবে না, নতুন করে ভাবতে বসবে সে। যদি মনে করে জিনিসপত্র আর লোকজন যা সঙ্গে এনেছে, তাতে কুলাবে না, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আবার ফেরত যাবে আনার জন্যে। তাতে আমাদেরই সুবিধে।'

লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল পল, 'চলো, এখুনি!'

শান্তকণ্ঠে ওমর বলল, 'আপনার মাথা খারাপ হয়ে গেছে। এখন বেরোতে পারবেন নাকি? এই রোদের মধ্যে গিয়ে পাথর ঠেলা শুরু করলে নির্ঘাত মারা পড়ব।'

তাই তো! প্রচণ্ড উত্তেজনায় ভুলে গিয়েছিল। হতাশ ভঙ্গিতে ধপ করে বসে পড়ল পল। মিনমিন করে বলল, 'কিন্তু যদি আর সময় না পাই? তার আগেই হুরুম চলে আসে?'

'এলে কিছু করার নেই।'

দশ

কোনমতে কেটে গেল সারাটা দিন। সূর্য ডোবার পর গোধূলির ছায়া নামলে গিরিখাত থেকে বেরোল ওরা। একটা পাহাড়ের চূড়ায় উঠে গেল রবিন। অনেকক্ষণ ধরে তাকিয়ে রইল মরুভূমির দিকে। নেমে এসে জানাল, কাফেলা দেখা যাচ্ছে না।

তারমানে আসতে আরও দেরি হবে হুরুমের—অনুমান করল ওমর। প্রচণ্ড রোদে দিনে চলা অসম্ভব বুঝে কোনও মরা মরুদ্যানে তাঁবু খাটিয়ে দিন পার করে রাতে রওনা হবে আবার। ঠাণ্ডার মধ্যে পথ চলবে।

তখনই স্তম্ভ ভাঙতে যেতে চাইল পল। কিন্তু ওমর রাজি হলো না। এ সব পরিশ্রমের কাজ করার জন্যে একমাত্র উপযুক্ত সময় ভোরবেলা। তাপমাত্রা তখন সহনীয় থাকে। বলল, 'গরমের যা অবস্থা, হাবুব না শুরু হয়।'

ভয় পেয়ে গেল মুসা, 'কেন, সেরকম মনে হচ্ছে নাকি?'

'বুঝতে পারছি না। তবে গরমের লক্ষণ ভাল না।'

'এলে কতক্ষণ লাগে থামতে?'

'তার কোন ঠিকঠিকানা নেই। অনেক সময় এমন হয়, থামতেই চায় না, আটচল্লিশ ঘন্টা ধরে চলে একনাগাড়ে। আর সে যে কি ঝড়, না দেখলে বুঝবে না। প্লেন ওড়ানো মানেই তখন আত্মহত্যা। গুহার বাইরে বেরোনো তো দূরের কথা, ভেতরে থাকাও কঠিন। বাতাসে বালি ওড়ে। দম নেয়া যায় না। যেখানেই ফাঁক পায়, ঢুকে পড়ে বালি। প্লেনের এঞ্জিন বাঁচানোও মুশকিল হয়ে যাবে।'

গম্ভীর হয়ে গেল পল, 'বিপদেই ফেললাম আপনাদের! প্লীজ, ওমর সাহেব, কাল সকালেই আমাকে রেখে আপনারা চলে যান।'

মাথা দুলিয়ে ওমর বলল, 'হুঁ, তারপর আপনার বাবাকে গিয়ে বলি টুয়ারেগরা জবাই করার জন্যে ফেলে রেখে এসেছি আপনার ছেলেকে। আমাদের ওপর খুব খুশি হবেন আপনার বাবা।'

'তাহলে কি করতে চান?'

'যা করছি। থেকে যাব। বাধা এলে মোকাবেলা করব। আপনাকে নিয়ে একসঙ্গেই বাড়ি ফিরব। আসুক হুরুম, ওর মত একটা শয়তানকে শায়েস্তা না করে ফিরে যাওয়াটা ঠিক হবে না, আপনার কথাই মেনে নিচ্ছি।'

পরদিন ভোরে উঠে যন্ত্রপাতি নিয়ে বেরোল ওরা। আরও তিনটে জিনিস সঙ্গে নিল। পিস্তল। একটা নিল ওমর, আরেকটা মুসা। প্রয়োজন হতে পারে ভেবে আমেরিকা থেকেই সঙ্গে নিয়েছিল ওমর। বিমানে রেখে দিয়েছিল। তৃতীয় পিস্তলটা পলের, আগে থেকেই আছে ওর কাছে।

কবরের কাছাকাছি এসে একটা পাহাড়ের চূড়ায় উঠে গিয়ে দেখে আসতে বলা হলো রবিনকে। দেখে নেমে এল ও। জানাল কাফেলার দেখা নেই। এবার আর ব্যাপারটা স্বাভাবিক মনে হলো না ওমরের কাছে। রহস্যজনক! যত দেরিই করুক, এতক্ষণে চলে আসার কথা ওদের। তবে কি বিমানটাকে ফিরতে না দেখে ভয় পেয়ে চলে গেল হুরুম? না, সেটাও বিশ্বাস করা যায় না। সঙ্গে একদল গলাকাটা টুয়ারেগ থাকতে এ ভয় অন্তত পাবে না লোকটা।

কবরের কাছে ঢালের গোড়ায় এসে দাঁড়াল কিশোর। ওপরে তাকিয়ে অনুমান করার চেষ্টা করল কোন পাথরটা ফেললে স্তম্ভে আঘাত হানবে। তারপর সবাইকে নিয়ে উঠে গেল ওপরে।

অনেক বড় একটা গোল পাথর বেছে নিয়েছে। তার কাছে এসে দাঁড়াল। সাবধান করল পল, 'দেখে হাত দিয়ো। কাঁকড়াবিছে থাকতে পারে। কামড় খেলে চিত হয়ে যাবে।'

চাড় মারার জন্যে পাথরের নিচে শাবল ঢুকিয়ে দিল মুসা। অন্যেরা হাত রেখে দাঁড়াল। তারপর কিশোরের নির্দেশে ঠেলতে আরম্ভ করল একসঙ্গে। 'মারো জোয়ান হেঁইও হেঁইও' বলা লাগল না বটে, তবে খুব একটা সহজও হলো না পাথরটাকে নড়ানো।

নড়ে উঠল ওটা। গড়াতে শুরু করল। যতই ঢালের দিকে নামল, বেড়ে যেতে লাগল গতি। কিন্তু স্তম্ভের কাছ থেকে বেশ কিছুটা দূরে থাকতেই বুঝে গেল ওরা,

স্তম্ভে আঘাত হানবে না ওটা। পাশ দিয়ে চলে যাবে। হতাশ হলো। ভেবেছিল এক পাথরেই কাজ হয়ে যাবে, কিন্তু হলো না। আরেকটা ঠেলতে হবে।

ওদেরকে অবাক করে দিয়ে অদ্ভুত একটা কাণ্ড ঘটল। স্তম্ভে আঘাত হানল না পাথরটা, পাশ দিয়েই গেল। কিন্তু যাওয়ার সময় মাটিতে যেটুকু কম্পন সৃষ্টি হয়েছে, তাতেই টলে উঠল ওটা। ভারসাম্য হারিয়ে বিকট শব্দে ধসে পড়ল। নীরবতার মাঝে মনে হলো কামান ফাটল কয়েকটা। ধুলোর ঝড় উঠল।

ধুলো নেমে গেলে দেখার জন্যে পা বাড়াল সবাই।

পল বলল, 'সাবধান! এ সব প্রাচীন কবরে নানা রকম ভয়ঙ্কর ফাঁদ পাতা থাকে। কোনটাতে যে গিয়ে পড়ব ঠিকঠিকানা নেই।'

গর্ত থেকে বেরিয়ে এসেছে কয়েকটা সাপ। একটা কাঁকড়াবিছেকেও দেখা গেল সুড়ুৎ করে দৌড়ে গিয়ে একটা পাথরের আড়ালে লুকাতে। ওগুলোকে এড়িয়ে নিচে এসে দাঁড়াল ওরা।

দুই টুকরো হয়ে ভেঙে পড়েছে স্তম্ভটা। কবরের ওপর পড়েনি। একটা টুকরোর ঘষা লেগে সামান্য দাগ পড়েছে মাত্র। আর কোন ক্ষতি হয়নি কবরটার। কি পরিমাণ শক্ত করে তৈরি হয়েছে, তার আরও প্রমাণ মিলল। শাবল আর গাঁইতি দিয়ে এ জিনিস ভাঙার কথা ভাবাটাও হাস্যকর।

হতাশ কণ্ঠে পল বলল, 'আমি আশা করেছিলাম ধসে পড়ে ওটা কবরটাকে ভাঙবে। কিছুই তো হলো না।'

'কবর ভাঙার কথা ভেবে তো ধসাইনি,' মনে করিয়ে দিল কিশোর। 'হুরুমকে দেরি করাতে চেয়েছি।'

হঠাৎ দূরে একটা বালির পাহাড়ের দিকে চোখ পড়তে বলে উঠল রবিন, 'সর্বনাশ! ওরা এসে গেছে!'

চরকির মত পাক খেয়ে ঘুরে গেল অন্যরা। দেখতে পেল পাহাড়ের ওপাশ থেকে বেরিয়ে আসছে একটা উট। পিঠে সওয়ারী।

এক এক করে বেরিয়ে এল ছটা উট।

'নোড়ো না কেউ, একদম স্থির,' বলে উঠল ওমর। 'দেখে ফেলবে আমাদের।'

এগারো

কেউ নড়ল না। তাকিয়ে আছে।

দাঁড়িয়ে গেছে ছয়টা উট, পাশাপাশি প্রায় গা ঘেঁষাঘেঁষি করে। কবরটা থেকে দুই মাইল দূরে। বিমানটা রয়েছে যে গিরিপথে সেটা থেকে তিন মাইল।

'হুট করে এমন বেরোল কোত্থেকে?' বলে উঠল মুসা।

'গিরিপথ আছে হয়তো। মরুভূমি থেকে একপাশ দিয়ে ঢুকে অন্যপাশ দিয়ে বেরিয়েছে,' জবাব দিল ওমর।

হ্যাঁ, এটাই একমাত্র জবাব। মরুভূমিতে কেন দেখা যায়নি ওদের বুঝতে অসুবিধে হলো না আর কারও। রবিন যখন পাহাড়ে চড়েছে দেখার জন্যে, তার আগেই গিরিপথে ঢুকে পড়েছিল কাফেলা। পাহাড় ঘুরে বেরিয়ে আসতে সময়

লেগেছে।

'থামল কেন?'

'নিশ্চয় স্তম্ভটা খুঁজছে। ঠিক পথেই এসেছিল হুরুম। এ পাশে বেরিয়ে এসে বোকা হয়ে গেছে। ভুলটা কি করেছে অনুমান করতে চাইছে হয়তো।'

হাসল মুসা, 'এসেছিল তো ঠিকই। কিন্তু কিশোর পাশা যে ওর শত্রু হয়ে দাঁড়াবে, এটা কল্পনা করতে পারেনি।'

নড়ে উঠল উটগুলো। একের পেছনে আরেকটা আবার সারি দিয়ে দাঁড়াল। চলতে শুরু করল কাফেলা। সরে যেতে লাগল কবরের কাছ থেকে আরও দূরে।

'দূরবীনটা থাকলে ভাল হত,' ওমর বলল, 'কোথায় যায় দেখতে পারতাম।'

কিশোর বলল, 'আর কোথায় যাবে। স্তম্ভ খুঁজছে।'

মুসা বলল, 'একদৌড়ে গিয়ে নিয়ে আসব নাকি দূরবীন?'

মাথা নাড়ল ওমর, 'লাভ নেই। তুমি আসতে আসতে ওরা পাহাড়ের আড়ালে চলে যাবে।'

কয়েক মিনিটের মধ্যে পাহাড়ের বাঁকের ওপাশে অদৃশ্য হয়ে গেল কাফেলা। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল সবাই। এবার নড়াচড়া করা যায়।

ওমরের দিকে তাকাল পল, 'ওরা কি করবে বলুন তো?'

'আরও কিছুক্ষণ খোঁজাখুঁজি করবে। রোদ চড়ে গেলে কোথাও ক্যাম্প করে উটগুলোকে বিশ্রাম দেবে। নিজেরাও তাই করবে।'

'আমরা কি করব?' কিশোরের প্রশ্ন।

'যা করছিলাম। স্তম্ভটা ধসে পড়াতে কবরে ঢোকার কোন পথ তৈরি হয়েছে কিনা দেখব। রবিন, তুমি ওই পাহাড়ের দিকে নজর রাখো। কাউকে আসতে দেখলেই জানাবে।'

কবরের চারপাশে ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগল কিশোর আর পল, ওদের দুজনের আগ্রহই বেশি। ওমর সিগারেট ধরাল। মুসা চুপচাপ দাঁড়িয়ে দেখতে লাগল। এ সব পুরানো কবরের ব্যাপারে তার ধারণা ভাল না। নেহায়েত দিনের বেলা বলে ভূতের ভয়টা দমিয়ে রেখেছে।

ছোট্ট ফোকরটা আবিষ্কার করল কিশোরই। একটা ইঁট খসালে যতখানি হবে, তত বড়। অর্ধেক মাটির নিচে, অর্ধেক ওপরে।

'পথ নাকি?' কিশোরকে প্রায় ঠেলে সরিয়ে উবু হয়ে বসে পড়ল পল। ভেতরে উঁকি দিয়ে দেখার চেষ্টা করল।

ভেতরটা অন্ধকার। কিছুই দেখা যায় না।

মুসা আর ওমরও এগিয়ে এল। ওপর থেকে জিজ্ঞেস করল রবিন, 'কিছু পেলে?'

জবাব দিল কিশোর, 'একটা ছোট ফোকর।'

'কবরে ঢোকার পথ?'

'মনে হচ্ছে না...'

কিশোরের কথা শেষ হলো না, তীক্ষ্ণ কণ্ঠে চিৎকার করে উঠল ওমর, 'অ্যাই, কি করেন?'

হাতটা থেমে গেল পলের, 'হাত ঢোকাচ্ছি, দেখার জন্যে, কিছু আছে কিনা?'

'থামুন, ওভাবে ঢোকাবেন না। ফোকরটা এখন ভেঙেছে, না আগে থেকেই ছিল, কে জানে! ওর মধ্যে বিপদ থাকতে পারে। ফাঁদ। আর্কিওলজিস্ট হয়েও ভুলে গেলেন?'

তাড়াহুড়ায় মনে ছিল না। ওমরের কথায় সাবধান হলো পল।

শাবলটা বাড়িয়ে দিল কিশোর, 'নিন, এটা আগে ঢুকিয়ে দেখুন।'

ঢোকাল পল। নেড়েচেড়ে বোঝার চেষ্টা করল কি আছে ভেতরে। 'লাগছে কি যেন। কিন্তু কি জিনিস বুঝতে পারছি না। ফোকর আরও বড় করতে হবে।'

আরও কয়েক সেকেণ্ড নেড়েচেড়ে শাবলটা ধীরে ধীরে বের করে আনল সে। শেষ মাথাটা বেরোতেই স্থির হয়ে গেল হাত। হাঁ করে তাকিয়ে রইল।

গলদা চিংড়ির সমান বড় কালো একটা প্রাণী আঁকড়ে ধরে রেখেছে শাবলের মাথা। বাঁকা লেজটা ঘুরিয়ে হুল ফোটানোর চেষ্টা করছে লোহার গায়ে। বুঝতে কষ্ট হয় না ভয়ানক হিংস্র।

অস্ফুট শব্দ করে উঠল পল। হাত থেকে ছেড়ে দিল শাবলটা। লাফ দিয়ে সরে গেল পেছনে। ঝাঁকি লেগে শাবলের মাথা থেকে খসে পড়ল কাঁকড়াবিছেটা। আকাশে আঁকশি তুলে শত্রুর খোঁজ করল। তারপর ঢুকে গেল আবার গর্তের ভেতর।

'আরেকটু হলেই খাইছিল!' পলের দিকে তাকিয়ে বলল মুসা। 'ভাগ্যিস বাধা দিয়েছিল ওমরভাই!'

মুখ থেকে রক্ত সরে গেছে পলের। কি মারাত্মক বিষাক্ত ওই প্রাণীগুলো, জানা আছে তার। একজন স্বাস্থ্যবান মানুষকেও চিত করে দিতে পারে ওর হুলের বিষ। সাংঘাতিক ভোগায়। দুর্বল মানুষ হলে মরেও যেতে পারে।

'আমি শুনেছি,' মুসা বলল, 'এ সব পুরানো কবর আর গুপ্তধন পাহারা দেয়ার জন্যে সাপ থাকে, আজদাহা হয়ে যায় ওগুলো। কাঁকড়াবিছেও যে হয়, জানতাম না। কত শত বছর ধরে আছে ওটা ওখানে?'

কিশোর বলল, 'আজদাহা বলে কোন কিছু নেই। আর এই বিছেটার বয়েসও কয়েক শো বছর নয়, অত বছর বাঁচে না ওরা। নিশাচর তো, দিনের বেলা অন্ধকারে লুকিয়ে থাকে। রোদ থেকে বাঁচার জন্যেই ওর মধ্যে গিয়ে বসে আছে। আরও বিছে আর সাপ থাকলেও অবাক হব না।'

ফোকরটার দিকে তাকিয়ে আছে পল। বিমূঢ় ভাব অনেকটা কেটেছে। শাবলটা আবার তুলে নিয়ে মাথা ঢুকিয়ে দিল। চাড় দিয়ে দেখল পাথর খসানো যায় কিনা। কিছুই হলো না। কয়েকবার চেষ্টা করে হাল ছেড়ে দিয়ে মাথা নাড়ল, 'হবে না। ভীষণ শক্ত।'

রোদের তাপ বেড়েছে। সহ্যের বাইরে চলে যাবে দ্রুত। ওমর বলল, 'আমাদের কাজ আপাতত শেষ। চলুন, যাওয়া যাক। এখানে আর বেশিক্ষণ থাকলে সানস্ট্রোক হয়ে যাবে।'

রোদের মধ্যে হাঁটা এক কথা, আর দাঁড়িয়ে থাকা আরেক। একজায়গায় বেশিক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকলে মনে হয় গায়ের চামড়া পুড়ছে।

গিরিখাতের দিকে হাঁটতে শুরু করল ওরা। অর্ধেক পথ আসতে একটা খটাখট শব্দ কানে এল। থমকে দাঁড়াল সবাই। ভাবল হুরুমরা আসছে। তাকাল সেদিকে।

দেখল, সেই অরিক্সগুলো। পাহাড়ের বাঁক থেকে বেরিয়ে ছুটতে ছুটতে গিয়ে ঢুকে পড়ল আরেকটা গিরিখাতের ভেতরে।

কিশোর বলে উঠল, 'হুরুমদের দেখে বেরিয়ে এসেছে।'

মাথা ঝাঁকাল ওমর, 'হ্যাঁ। যেখানে লুকিয়ে থেকে বিশ্রাম নিচ্ছিল ওরা, নিশ্চয় সেখানে গিয়ে ঢুকেছে ওরা।'

'তারমানে পানির আরও উৎস আছে পাহাড়ে। তার কাছাকাছিই ছিল ওরা?'

'সেরকমই মনে হচ্ছে। এর নাম টুয়ারেগ। এসেই পানি বের করে ফেলেছে।'

'করে কি করে!' অবাক কণ্ঠে বলল মুসা, 'গন্ধ পায় নাকি?'

'শুনেছি তো পায়। কি করে খুঁজে পায়, জানি না। পানি থাকলে সেটা ঠিকই বের করে ফেলে ওরা। তবে এখানে কোথায় পানি আছে সেটা বোধহয় ওদের আগে থেকেই জানা।'

গিরিখাতের কাছাকাছি এসে বলল পল, 'আপনারা যান। আমি আসছি।'

'কোথায় যাবেন?' জিজ্ঞেস করল ওমর।

'দেখে আসি ওরা কি করছে।'

'যাওয়াটা কি উচিত হবে?'

'কেন হবে না? লুকিয়ে থেকে দেখব।'

'যদি ধরা পড়ে যান?'

'গেলে আর কি। এমন ভান করব, যেন আমি ঘুণাক্ষরেও সন্দেহ করিনি হুরুম আমাকে ফেলে গেছে। যাই করি, করব। ওকে বোঝানোর ভার আমার। আপনি কোন চিন্তা করবেন না।'

'চিন্তা তো করছি অন্য কারণে। হুরুমকে সামনে দেখে যদি মেজাজ ঠিক রাখতে না পারেন? কোন বোকামি করে বিপদে পড়ে যান?'

হাসল পল, 'গুলি করে বসব ভাবছেন তো? আপনাকে কথা দিলাম, তা আমি করব না।'

ওমরকে আর কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে হাঁটতে আরম্ভ করল পল।

পেছন থেকে ডেকে বলল ওমর, 'এই গরমের মধ্যে যেতে পারবেন? শরীর খারাপ হবে তো।'

ফিরে তাকিয়ে পল বলল, 'আপনি ভুলে যাচ্ছেন, প্রায় দুটো মাস এখানে আছি আমি। রোদ আর গরম অভ্যেস হয়ে গেছে। অহেতুক চিন্তা করবেন না। আমার কিছু হবে না।'

বড় বড় পা ফেলে একটা পাথরের চাঙড়ের ওপাশে চলে গেল সে।

সেদিকে তাকিয়ে আনমনে বিড়বিড় করল ওমর, 'কাজটা ভাল করল না! ও যা গোঁয়ার, হুরুমকে দেখে কি করে বসে কে জানে!'

মুসা বলল, 'চলুন না, আমরাও যাই।'

'না, বেশি মানুষ গেলে টুয়ারেগরা টের পেয়ে যাবে। ওদের নাক বড় তীক্ষ্ণ। গন্ধ শুঁকেই অনেক কিছু বুঝে যায়। ও গেছে, যাক। যদি ঠিকমত ফিরে না আসে

তখন দেখা যাবে।'

বারো

গিরিখাত থেকে মাইল পাঁচেক দূরে কয়েকটা শুকনো খেজুর গাছের কাছে পাহাড়ের ঢালে তাঁবু ফেলেছে হুরুমরা। ছোট একটা পাহাড়ের চূড়া থেকে ওদের দেখতে পাচ্ছে পল। ছয়টা উট শুয়ে বিশ্রাম করছে। কাছাকাছি বসে আছে দুজন লম্বা লোক। নীল, ঢোলা আলখেল্লায় ঢাকা শরীর। মাথা, মুখ সব একই কাপড়ে ঢাকা। চোখ দুটো কেবল দেখা যাচ্ছে। হাতের কাছে ফেলে রেখেছে দুটো পুরানো আমলের রাইফেল। ওরা টুয়ারেগ, কোন সন্দেহ নেই। হুরুম আর অন্য দুজন লোককে দেখা গেল না। হয় পানি খেতে গেছে ওরা, নয়তো হেলানো স্তম্ভটা খুঁজতে গেছে।

তাঁবুর কাছে পলিথিন দিয়ে ঢেকে রাখা হয়েছে কোন একটা জিনিস। কি, বোঝা গেল না।

প্রচণ্ড রোদ। লুকিয়ে বসার মত ছায়া দেখতে পেল না পল। বুঝতে পারছে বেশিক্ষণ থাকতে পারবে না এখানে। রোদে পুড়িয়ে দেবে চামড়া।

তবে বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতেও হলো না ওকে। বোতল খুলে পানি খেয়ে সবে ছিপিটা লাগিয়েছে, এই সময় পেছনে শব্দ হতে ঝট করে ফিরে তাকাল সে।

তিনজন লোক দাঁড়িয়ে আছে। কখন যে এসেছে ওরা কিছুই বলতে পারবে না ও। হুরুমকে দেখেই চিনতে পারল। একজনের পোশাক দেখে বুঝতে পারল ওই লোকটা টুয়ারেগ। এর কাঁধেও ঝোলানো পুরানো রাইফেল। পল অনুমান করল, এ লোকটাই তার উপস্থিতি আঁচ করে অন্য দুজনকে নিয়ে এসেছে এখানে। তৃতীয় লোকটা টুয়ারেগ নয়। চামড়ার রঙ দেখে মনে হচ্ছে মধ্যপ্রাচ্যের লোক। মিশরীয় হতে পারে।

পলকে এখানে আশা করেনি হুরুম, তার চোখ আর ভঙ্গি দেখেই বোঝা যাচ্ছে। দীর্ঘ একটা মুহূর্ত চোখে চোখে তাকিয়ে থাকার পর বলল, 'তুমি এখানে!'

বোকার মত প্রশ্ন। কিন্তু এ ছাড়া আর বলবেই বা কি সে? কল্পনাই করেনি পলকে জীবিত দেখতে পাবে।

সতর্ক হয়ে গেল পল। অভিনয় শুরু করল। নিরীহ কণ্ঠে বলল, 'এখানে কি মানে? এখানেই তো ফেলে গেছ। তোমার আসার অপেক্ষায় ছিলাম।'

এই জবাব আরও অবাক করল হুরুমকে। 'তার মানে···তুমি জানতে আমি ফিরে আসব?'

'কি রকম কথা বলছ? জানব না কেন? আমাকে রেখে চলে গেছিলে না কবর ভাঙার যন্ত্রপাতি আনার জন্যে?'

কৈফিয়ত দেয়ার সুযোগ পেয়ে আর ছাড়ল না হুরুম, 'তা ঠিক,' দ্রুত সামলে নিল সে। 'শাবল-গাঁইতি দিয়ে কবর ভাঙা যাবে না বুঝতে পেরে তাড়াহুড়া আর উত্তেজনায় একটা ভয়ানক রিস্ক নিয়ে ফেলেছিলাম। মনে করলাম, প্লেন নিয়ে গিয়ে ডিনামাইট আর অন্যান্য জিনিস নিয়ে আসি। বোকামি করেছিলাম। আমার প্লেন

চালানোর যে কি ক্ষমতা, জানোই তো। তবে তাতে তেমন অসুবিধে হত না, কিন্তু পেট্রল গেল ফুরিয়ে। সিওয়ার কাছে ফাউনটেইন অভ দা সান মরুদ্যানে ক্র্যাশল্যাণ্ড করতে বাধ্য হলাম। খুব দুশ্চিন্তা হচ্ছিল তোমার জন্যে।'

লোকটার মিথ্যে বলা দেখে রাগে ব্রহ্মতালু জ্বলে উঠল পলের। এক চড়ে দাঁতগুলো সব খসিয়ে দেয়ার ইচ্ছেটা দমন করল অনেক কষ্টে। বলল, 'তা তো হবেই।'

পলের কণ্ঠের ব্যঙ্গের সুরটা বোধহয় লক্ষ করল না হুরুম। বলল, 'এখানে রোদের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছি কেন? চলো, তাঁবুতে।'

হাঁটতে হাঁটতে তার কৈফিয়ত দেয়া চালিয়ে গেল সে, 'প্লেন হারিয়ে পড়ে গেলাম মহাবিপদে। উটের কাফেলা ছাড়া ওই মরুভূমি পাড়ি দেয়ার আর কোন উপায় নেই। আমার এই বন্ধুটি, মিস্টার নাসের খারতুগার সাহায্য না পেলে কিছুই করতে পারতাম না। ইনিও একজন আর্কিওলজিস্ট। এখানে আসার খরচাপাতি সব ইনিই দিয়েছেন।'

ওর দিকে তাকিয়ে সামান্য মাথা ঝোঁকাল লোকটা। পলও জবাব দিল। তার সম্পর্কে আর কিছু জিজ্ঞেস করল না। আগ্রহ নেই। মনে হলো, হুরুমের সঙ্গে যখন এসেছে, সেও ওর চেয়ে ভাল কিছু নয়। মগজে ঘুরছে নানা চিন্তা। হুরুমের সমস্ত প্রশ্নের সঠিক জবাব দিতে হবে। ভুল হলেই বিপদ।

'কোথায় গিয়েছিলে?' জিজ্ঞেস করল পল।

'পানি খেতে। আমার এই টুয়ারেগ বন্ধুটি বলল, এখানে পানির একটা ডোবা আছে। গিয়ে দেখি সত্যি আছে। কতগুলো হরিণ শুয়ে ছিল কাছে, আমাদের দেখেই পালাল। ভালই হলো। তাজা মাংস আর পানি পেলে অনেক সময় থাকতে পারব এখানে। সঙ্গে যা এনেছি, তাতে দুদিনের বেশি চলত না। কিন্তু একটা ব্যাপার বুঝতে পারছি না—কবরের কাছের হেলানো স্তম্ভটা কোথায়?'

'ওটা গেছে।'

'গেছে মানে?'

'পড়ে গেছে। আমার চোখের সামনেই ধসে পড়ল।'

'কবরের ওপর?'

'হ্যাঁ।'

'ও, এজন্যেই দেখিনি। কবরটা ভেঙেছে?'

'না, ফাটেওনি একটু। তুমি যে রকম দেখে গিয়েছিলে সেরকমই আছে।'

স্বস্তির লম্বা নিঃশ্বাস ফেলে পলের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল হুরুম, 'তুমিও নিশ্চয় পানির খোঁজ পেয়েছ?'

'পেয়েছি। নইলে এতদিন বাঁচতাম নাকি।'

'ভাগ্য ভাল তোমার। আমি যা রেখে গিয়েছিলাম তাতে তো দুদিনের বেশি চলার কথা নয়। আমি ভেবেছি, একদিনের মধ্যেই ফিরে আসতে পারব। এতদিন যে লাগবে কল্পনাও করিনি। তোমার জন্যে যা দুশ্চিন্তা হচ্ছিল না। পানি কোথায় পেলে?'

হাত তুলে দেখাল পল, 'ওদিকে, এখান থেকে পাঁচ-ছয় মাইল দূরে, একটা

গুহার মধ্যে।'

সন্দেহ দেখা দিল হুরুমের চোখে, 'পানি ফেলে এই রোদের মধ্যে এতদূর এলে কেন?'

'মরুভূমিতে উটের কাফেলা দেখলাম। তারপর দেখলাম এদিকেই ঢুকল। কারা এল দেখতে এসেছিলাম।'

সন্দেহ চলে গেল হুরুমের চোখ থেকে। মাথা ঝাঁকাল, 'স্বাভাবিক। আমি হলেও তাই করতাম। হ্যাঁ, একটা প্লেনকে আসতে দেখেছ নাকি?'

এই প্রশ্নটা আসবে, জানত পল, মনে মনে জবাব রেডি করেই রেখেছে। নিজের নিরাপত্তার কথা ভেবে সত্যি কথাটা বলল, 'এখানেই তো এসেছে।'

হাঁ করে তাকিয়ে রইল হুরুম। 'এখানে? কোথায় নেমেছে?'

'গুহার কাছে।'

'কেন এসেছে?'

'আমার জন্যে।'

অবাক হলো হুরুম। চট করে একবার তাকিয়ে নিল খারতুগার দিকে। 'তোমার জন্যে এসেছে? যায়নি কেন?'

'আমাকে নিয়ে যাওয়ার জন্যে অপেক্ষা করছে।'

'বুঝলাম না!'

'আমার বাবার কথা ভুলে গেছ মনে হয় তুমি। বাবাকে বলে এসেছিলাম, প্রতি সপ্তাহে চিঠি লিখে আমার খোঁজখবর জানাব। দুই মাস ধরে আমার কোন খবর না পেয়ে একটা প্লেন ভাড়া করে আমাকে খুঁজতে পাঠিয়েছে বাবা। পাইলট আমাকে ঠিকই খুঁজে বের করেছে। তখনই বাড়ি নিয়ে যেতে চেয়েছিল। আমি রাজি হইনি।'

'কেন?'

'তোমার অপেক্ষায় ছিলাম।'

'কেন?'

'কেন মানে? এতগুলো টাকা খাটালাম এই অভিযানের পেছনে, শেষ না দেখেই চলে যাব?'

'তুমি এতটাই শিওর ছিলে যে আমি আসব?'

'না থাকার কি হলো। কবরটা খুঁজে পেয়েছি আমরা, ভাঙার জন্যে যন্ত্রপাতি আনতে গেছ তুমি। সুতরাং আসবেই। ওমরকে আমি তাই বললাম।'

'ওমর কে?'

'প্লেনের পাইলট।'

'তোমার বন্ধু?'

'আগে কখনও দেখিওনি।'

খারতুগার দিকে তাকিয়ে কি যেন বলল হুরুম, ভাষাটা বুঝল না পল। ফিরে তাকিয়ে বলল, 'আমার এই বন্ধুটি ইংরেজি তেমন জানে না। তা প্লেনটা কতদিন থাকবে তোমার জন্যে?'

'আমি না যাওয়া পর্যন্ত।'

'কবে যাবে?'

'কবরটা খোলা হলে।'

'ও!' পলের ভঙ্গিতেই বুঝে গেল হুরুম, ও যা বলছে তাই করবে।

'কবর ভাঙার জন্যে কিছু এনেছ?'

'এনেছি।'

তাঁবুর কাছে চলে এসেছে ওরা। পলিথিন দিয়ে ঢেকে রাখা জিনিসটার দিকে হাত তুলল হুরুম, 'ওই যে।'

'কি ওটা?'

'একটা এঞ্জিন। ড্রিল চালানোর।'

'ডিনামাইট আননি?'

'নাহ্। পরে ভেবে দেখলাম, ওই জিনিস দিয়ে ভাঙতে গেলে কবরের ভেতরের অন্যান্য জিনিসও উড়ে যেতে পারে। তাই ওই ভাবনা বাদ দিয়েছি। ড্রিল দিয়ে ভাঙার বুদ্ধি দিয়েছে খারতুগা। ও অভিজ্ঞ লোক। এ সব কাজে ওস্তাদ।'

'ও,' একমুহূর্ত ভাবল পল। জিজ্ঞেস করল, 'আজ বিকেল থেকেই কাজ শুরু করবে নাকি?'

'না, আজ আর পারব না। মরুভূমি পেরিয়ে এসে ক্লান্ত লাগছে। বিশ্রাম নিয়ে কাল ভোররাত থেকে শুরু করব।'

'ভালই হবে তাহলে,' রোদের দিকে তাকাল পল। 'যা গরম, এখন তো আর যেতে পারব না। বিকেলে ঠাণ্ডা পড়লে গুহায় চলে যাব। ওমরকে সব কথা জানাতে হবে। ও নইলে টেনশনে থাকবে।'

যেন হঠাৎ কোনও কথা মনে পড়েছে, এমন ভঙ্গিতে পলের হাত ধরে টেনে একপাশে নিয়ে গেল হুরুম। খারতুগা যাতে শুনতে না পায়, কণ্ঠস্বর নামিয়ে বলল, 'ওই প্লেনটা তুমি চালাতে পারবে?'

'তা পারব। কেন?'

'ভাবছি, এক কাজ করলে কেমন হয়?' চতুর হাসি ফুটল হুরুমের ঠোঁটে। 'অনেক ঝামেলা আর মরুভূমি পেরোনোর কষ্ট বেঁচে যাবে আমাদের, ওই প্লেনটা পেলে।'

শূন্য হয়ে গেল পলের দৃষ্টি, 'বুঝিয়ে বলো।'

কণ্ঠস্বর আরও খাদে নামিয়ে ফেলল হুরুম, 'খুব সহজ হয়ে যায় কাজটা, বুঝলে। কবর থেকে সমস্ত গুপ্তধন তুলে এনে প্লেনে করে চলে যাব আমরা। যারা থাকবে, উটে চড়ে আসুক। আমার কথা মাথায় কিছু ঢুকল?'

হতবাক হয়ে গেল পল। কত্তবড় শয়তান এই লোক! রাগ মাথাচাড়া দিল আবার মগজে। দমন করে বলল, 'ভেবে দেখব।'

'দেখো। আমাদের দুজনের জন্যেই কাজ অনেক সহজ হয়ে যাবে তাহলে।'

'এই টুয়ারেগদের বিশ্বাস করা যায়? উল্টোপাল্টা কিছু করবে না তো?'

'তা জানি না। খারতুগা তো বলল তার সঙ্গে আগেও কাজ করেছে এরা। তবে টুয়ারেগদের কোন বিশ্বাস নেই।'

'তোমার চেয়ে খারাপ না নিশ্চয়!' মনে মনে বলল পল।

তেরো

সারাটা দিন পলের জন্যে অপেক্ষা করল ওমর আর তিন গোয়েন্দা। ফিরল না সে। রাতেও যখন ফিরল না, দুশ্চিন্তা বাড়ল ওদের। ভোররাতে আর অপেক্ষা করতে পারল না ওমর, দেখতে যাওয়ার জন্যে তৈরি হলো।

দ্রুত নাস্তা সেরে নিয়ে পলকে খুঁজতে রওনা হলো ওরা।

গিরিখাতের বাইরে বেরিয়েই দাঁড়িয়ে গেল ওমর। ভোরের আলো ফুটছে। তাড়াহুড়া করে এগিয়ে আসতে দেখল একজন লোককে। ছোটখাট হালকা শরীর। ক্লিন শেভ। হালকা কফি রঙের চামড়া। খাকি শার্ট-প্যান্টের ওপর ঢোলা আরবী আলখেল্লা চাপিয়েছে। পায়ে রোপ-সোল স্যাণ্ডেল। কাছে এসে দাঁড়িয়ে গেল। চোখ বুলাল সবার ওপর। একবার দ্বিধা করে ইংরেজিতে জিজ্ঞেস করল, 'ওমর কার নাম?'

'আমার,' জবাব দিল ওমর। 'আপনি কে?'

'হুরুম।'

'আমার নাম জানলেন কিভাবে?'

'পলের কাছে। ও আমার বন্ধু। আপনিই তার বাবার পাঠানো পাইলট?'

'ও এখন কোথায়?'

'আমাদের ওখানে। সেজন্যেই এলাম। একটা খবর দিতে বলেছে আপনাকে।'

'কি খবর?'

'বলতে বলেছে আপনার আর অপেক্ষা করার দরকার নেই। ইচ্ছে করলে চলে যেতে পারেন। সে কবর ভাঙা দেখে আমার সঙ্গে বাড়ি যাবে।'

চুপ করে রইল ওমর।

জবাব না পেয়ে জিজ্ঞেস করল হুরুম, 'কি ব্যাপার? গোলমাল হয়েছে কিছু?'

'প্রচুর,' রুক্ষস্বরে জবাব দিল ওমর।

হুরুমের সাপের চোখের মত কালো আর শীতল চোখজোড়া ওমরের ওপর স্থির হয়ে আছে। 'আমার কথা আপনি বিশ্বাস করেননি, না?'

'এক বর্ণও না।'

বদলে গেল হুরুমের চেহারার ভাব। ভ্রূকুটি করল। 'আপনি আমাকে মিথ্যেবাদী ভাবছেন?'

'ভাবছি না, আমি জানি।'

'এত কষ্ট করে এতদূর হেঁটে এসে এই ব্যবহার পেলাম!'

'আপনি কি ভেবেছিলেন দুহাত বাড়িয়ে আপনাকে স্বাগত জানাব?'

হাত ওল্টাল হুরুম, 'মিথ্যে বলতে যাব কেন?'

'খুব ভাল করেই জানেন কেন বলতে যাবেন। পলকে কি করেছেন? মিথ্যে বলার চেষ্টা করবেন না, ঠিকই বুঝতে পারব আমি।'

'আমি আবার ওকে কি করব?'

'সেকথাই জানতে চাইছি।'

'আমি কিছু করিনি। আমার ক্যাম্পে গিয়ে হাজির হয়ে বলল, থাকবে। না করি কিভাবে? হাজার হোক, ও আমার বন্ধু। অনেক কাজে সহায়তা করেছে।'

'খবর দিতে সে নিজে এল না কেন?'

'ও কবর ভাঙার কাজে ব্যস্ত।'

'কি দিয়ে ভাঙছে? খালি হাতে?'

'না, যন্ত্রপাতি নিয়ে এসেছি আমি।'

'ওগুলো আনার জন্যেই ওকে এখানে ফেলে গিয়েছিলেন, তাই না?'

'হ্যাঁ।'

'শোনো, হুরুম,' আচমকা লোহার মত কঠিন হয়ে গেল ওমরের কণ্ঠ, 'ফালতু কথা বলে সময় নষ্ট কোরো না। আমি সব জানি। তুমি একটা ডাকাত, খুনী। না বলে পলের প্লেন নিয়ে চলে গিয়েছিলে তুমি। ওকে ফেলে রেখে গিয়েছিলে না খেয়ে মরার জন্যে। ভাগ্য ভাল, তাই বেঁচে গেছে ও। আর যদি কোন ক্ষতি হয় ওর, তোমাকে আমি ছাড়ব না, মনে রেখো কথাটা।'

চোখ কপালে উঠে গেল হুরুমের। 'কি বলছেন আপনি কিছু বুঝতে পারছি না! পল বলেছে নাকি এ সব কথা?'

'ওসব তোমার শোনার দরকার নেই। গিয়ে এখন পলকে আমার কাছে পাঠিয়ে দাও। এক ঘন্টার মধ্যে যদি ফিরে না আসে ও, কেন এল না দেখতে যাব আমি।'

গম্ভীর হয়ে গেল হুরুম। 'ওকাজ না করতে পরামর্শ দেব আমি আপনাকে।'

'তোমাকে ভয় পাই নাকি আমি?'

'আমার ক্যাম্পে কয়েকজন টুয়ারেগ আছে। ওদেরকে পাওয়া উচিত।'

'কেন?'

'ওরা মুসলমান। খ্রীষ্টানদের পছন্দ করে না।'

'নাম শুনেই বোঝা উচিত ছিল তোমার, আমি খ্রীষ্টান নই, ওদের মতই মুসলমান। তোমার অবগতির জন্যে আরও একটা তথ্য জানিয়ে রাখি, আমার বাড়ি মিশরে। দু'চারজন টুয়ারেগের সঙ্গে খাতিরও আছে আমার। চাইলে খুঁজে বের করে ফেলতে পারব ওদের।' হুরুমের চোখে চোখে তাকাল ওমর, 'যাও এখন, ভাল চাও তো পলকে পাঠিয়ে দাওগে। ওকে ছাড়া বাড়ি যাব না আমি।'

হুরুমের কালো চোখে যেন দোজখের আগুন জ্বলে উঠল। আর কোন কথা না বলে ঝটকা দিয়ে ঘুরে হাঁটতে শুরু করল।

সেদিকে তাকিয়ে থেকে সঙ্গীদের বলল ওমর, 'বদলোক অনেক দেখেছি, ওর মত দেখিনি। পলকে কি করেছে আল্লাহই জানে!'

'গিয়ে দেখব নাকি?' মুসার প্রশ্ন।

'এক ঘন্টা সময় তো দিলাম। দেখি।'

'আমার মনে হয় না ও পাঠাবে,' কিশোর বলল।

'পল এল না কেন বুঝতে পারছি না,' মুসা বলল।

'এ তো সহজ কথা। আটকে রেখেছে।'

'এই হুরুমটা হারুম-ধুরুম করতে এল কেন আমাদের কাছে?'

'আমাদের দেখতে এসেছিল,' জবাব দিল ওমর, 'বিশেষ করে আমাকে। ও ভেবেছিল আমি একা। তাহলে পিস্তলের ভয় দেখিয়ে আমাকে দিয়ে কিছু করানোর চেষ্টা করত। চারজনকে দেখে সে সাহস আর হয়নি। বানিয়ে বলে দিয়েছে—পল আমাদের চলে যেতে বলেছে।'

'আমরা এখানে আছি, জানল কি করে?' নিজেকেই যেন প্রশ্নটা করল রবিন।

'নিশ্চয় পল বলেছে। কোন্ পরিস্থিতিতে কেন বলেছে সেটা না গিয়ে দেখলে বোঝা যাবে না। আমার মনে হয় শুধু আমার কথাই বলেছে পল, তোমাদের কথা জানায়নি। তাহলে ওভাবে একা আসত না হুরুম।'

আরও কয়েক মিনিট পর কিশোর বলল, 'এখানে দাঁড়িয়ে অহেতুক সময় নষ্ট করছি আমরা। পলকে পাঠাবে না ও। হুমকিতে ভয় পাওয়ার মানুষই নয়।'

এক মুহূর্ত দ্বিধা করে ওমর বলল, 'বেশ, চলো তাহলে যাওয়া যাক।'

'প্লেনের পাহারায় কারও থাকার দরকার আছে?'

'নাহ্। কবরের ভেতর কি আছে না দেখে এখান থেকে নড়বে না হুরুম। পালানোর চেষ্টা করবে না। তা ছাড়া একসঙ্গে অনেক বেশি মানুষ দেখলে হুট করে গুলি করতে দ্বিধা করবে টুয়ারেগরা।'

সোজা কবরের দিকে হাঁটা দিল ওরা। লুকোছাপার ধারেকাছে গেল না। দুশো গজ দূরে থাকতে কানে এল ডিজেল এঞ্জিনের ভট ভট। সেই সঙ্গে আরেকটা ভারি ঘড়ঘড়ে শব্দ।

কান পেতে শুনতে শুনতে মুসা বলল, 'ড্রিল মেশিন দিয়ে কবর ভাঙছে নাকি?'

'মনে হয়,' হাঁটতে হাঁটতে বলল ওমর।

'হায়রে,' আফসোস করে রবিন বলল, 'রাজা হলে মরেও শান্তি নেই। এ জন্যেই বেশি ধনরত্ন থাকা উচিত না। তাহলে মরা মানুষকে নিয়েও টানাহেঁচড়া।'

আরও কিছুদূর এগিয়ে একটা পাথরের চাঙড়ের অন্যপাশে আসতেই কবরটা চোখে পড়ল। ঠিকই অনুমান করেছে মুসা। পাওয়ার ড্রিল দিয়ে কবরের পাথর ফাটানোর চেষ্টা করছে একজন লোক। খানিকটা দূরে দাঁড়িয়ে সেটা দেখছে হুরুম আর তিনজন টুয়ারেগ। ওদের হাতের রাইফেলগুলো খুঁজতে লাগল ওমরের চোখ। দেখা গেল ওগুলো, একটা পাথরে ঠেস দিয়ে দাঁড় করানো। ঢালের নিচে বেশ খানিকটা দূরে আছে উটগুলো—কয়েকটা বসে, কয়েকটা দাঁড়িয়ে। একটা উটের পিঠে ঝুঁকে বসেছে পল। বসার ভঙ্গিটা অস্বাভাবিক।

তার চোখেই পড়ল ওরা প্রথমে। সোজা হওয়ার চেষ্টা করে পারল না, আগের মতই ঝুঁকে রইল।

'জিনের সঙ্গে বেঁধে রাখা হয়েছে ওকে,' কিশোর বলল।

পিস্তল বের করল ওমর। মুসাকেও বের করতে বলল। রবিনকে নির্দেশ দিল, 'যাও, খুলে দিয়ে এসো ওর বাঁধন। আমরা তোমাকে কভার করছি।'

মাথা নিচু করে পাথরের আড়ালে আড়ালে দৌড় দিল রবিন। একজন টুয়ারেগ দেখে ফেলল ওকে। তীক্ষ্ণ কণ্ঠে কিছু বলল। ঝট করে ফিরে তাকাল হুরুম। এঞ্জিন চালাচ্ছে যে লোকটা তাকে কিছু বলল। উঠে দাঁড়াল ওই লোকটা। বন্ধ করে দিল

এঞ্জিন। স্তব্ধতা নামল কবরের ঢালে।

উদ্যত পিস্তল হাতে আগে বাড়ল ওমর। চাবুকের মত শপাং করে উঠল যেন ওর কণ্ঠ, 'এঞ্জিন বন্ধ করলে কেন? কাজ চালিয়ে যাও।' টুয়ারেগদের দিকে তাকিয়ে আরবীতে বলল, 'রাইফেলের দিকে হাত বাড়ালেই গুলি খাবে।'

'কি চান আপনি?' ঠোঁট চাটল হুরুম।

'কি চাই স্পষ্ট করে বলে দেয়া হয়েছে তোমাকে। আধঘণ্টার মধ্যেই ভুলে গেলে?'

'কিন্তু এক ঘণ্টা সময় দিয়েছিলেন আপনি।'

'দিয়েছিলাম। কিন্তু তোমাকে বিশ্বাস করিনি। না করে যে ভুল করিনি, সে তো দেখতেই পাচ্ছি।'

চোদ্দ

কয়েক সেকেণ্ড উভয় পক্ষেই টান টান হয়ে রইল উত্তেজনা। কিছুই ঘটল না। হয়তো হুরুম ভাবেনি এত তাড়াতাড়ি চলে আসবে ওরা, তাই তৈরি ছিল না, পরিস্থিতির আকস্মিকতায় বোকা বনে গেছে।

নিচু স্বরে এঞ্জিনিয়ারের সঙ্গে দ্রুত কথা বলল হুরুম। পরিস্থিতি বুঝতে পারছে। খোলা জায়গায় মারামারি বাধলে যে কারও গায়ে গুলি লাগতে পারে, তার নিজের গায়েও, এটা বুঝেই আর গুলি করার আদেশ দিল না বোধহয় টুয়ারেগদের।

তবে দিলেও ওরা শুনত কিনা কে জানে। ওদের ভাবভঙ্গি সুবিধের ঠেকছে না ওমরের কাছে। অহেতুক মারামারিতে মনে হচ্ছে আগ্রহ নেই ওদের। রাইফেলের দিকে হাত বাড়িয়ে গুলি খেয়ে মরারও ইচ্ছে নেই।

পলের বাঁধন কেটে দিল রবিন।

লাফ দিয়ে উটের পিঠ থেকে নামল পল। জামার ভেতর থেকে বের করল পিস্তলটা। বাঁধার আগে ওকে সার্চ করা হয়নি বোঝা গেল।

দুটো পিস্তলের হুমকিকেই অগ্রাহ্য করার সাহস হচ্ছিল না হুরুমের। তৃতীয় আরেকটা দেখে যুদ্ধ ঘোষণা করার ইচ্ছে একেবারে উবে গেল ওর। নিচু স্বরে কিছু বলল আবার এঞ্জিনিয়ারকে।

আবার এঞ্জিন চালু করে দিল লোকটা। চলতে শুরু করল ড্রিল মেশিন। গোলাগুলির আশঙ্কা আপাতত নেই আর।

গোয়েন্দাদের দিকে এগিয়ে এল পল।

ওমর জিজ্ঞেস করল, 'ধরা পড়লেন কি করে?'

'লুকিয়ে ওদের ক্যাম্পের দিকে চোখ রাখছিলাম। এক টুয়ারেগ কি করে জানি বুঝে গেল আমি আছি। পেছন থেকে এসে ধরে ফেলল।'

'তারপর?'

'অভিনয় করে গেলাম। হুরুমকে বোঝালাম আমি ওর অপেক্ষায় বসেছিলাম।'

'ও বিশ্বাস করল?'

'জানি না। তবে মনে হয় করেছে। আমি বেঁচে আছি দেখে একেবারে হাঁ হয়ে

গিয়েছিল।'

'হুঁ। হুরুমকে দিয়ে আমার কাছে কোনও খবর পাঠিয়েছিলেন নাকি?'

ভুরু কুঁচকে গেল পলের, 'খবর মানে? আমি ওকে পাঠাইনি। কে বলল?'

'হুরুম।'

'ও, তাহলে ভোরবেলা ওখানেই গিয়েছিল। আপনি বিশ্বাস করেছেন?'

'না।'

'খবরটা কি?'

'আপনি ওদের সঙ্গে থাকছেন। আমি যেন চলে যাই।'

'তারমানে আপনাদের সরাতে চেয়েছিল।'

'আমাদের কথা আপনিই বলেছেন, তাই না?'

'শুধু আপনার কথা বলেছি। তিন গোয়েন্দার কথা বলিনি। ভেবেছি নিজেই গিয়ে আবিষ্কার করুক। এত লোক আছে দেখে চমকে যাক।'

'আমার কথাই বা বলার কি দরকার ছিল?'

'ও আমাকে জিজ্ঞেস করেছে একটা প্লেন আসতে দেখেছি কিনা। বললাম, দেখেছি। ভাবলাম, যদি বলি আমি একা তাহলে আবার আমাকে খুন করতে চাইবে। তাই বললাম, প্লেনটা এখানেই নেমেছে। জানতে চাইল, কেন। বললাম, বাবা আমার খোঁজ নিতে পাঠিয়েছে। আমার নিরাপত্তার কথা আমাকে ভাবতে হয়েছে। অন্যায় করেছি?'

'না। এখন আসল কথাটা বলুন। আপনি কি হুরুমের সঙ্গে থাকতে চান?'

'কোনমতেই না। যদিও কবরের ভেতরে কি আছে দেখার আগ্রহ এখনও আছে আমার।

'হুরুম খুঁজে পেল কি করে কবরটা? আপনি দেখিয়েছেন নিশ্চয়?'

'হ্যাঁ, দেখিয়েছি। এবং তারপর থেকেই শুরু হলো ঝামেলা। আমাদের চুক্তির কথা মনে আছে কিনা জিজ্ঞেস করলাম তাকে। এমন ভান করল যেন সব ভুলে গেছে। মনে করিয়ে দিলাম, কবরে যা পাওয়া যাবে তার আধাআধি বখরা হবে আমাদের। ও বলল, সেটা আর সম্ভব নয়। এখন তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে খারতুগা—উট, লোকজন আর যন্ত্রপাতি সরবরাহ করার বদলে তাকে দিতে হবে অর্ধেক বখরা। শুরু হলো তর্কাতর্কি। শেষে রেগেমেগে বললাম, তার ভাগ থেকে ইচ্ছে হলে সে দিকগে, আমার অর্ধেক আমাকে দিতেই হবে। সেও গেল রেগে। এক পর্যায়ে এতটাই রেগে গেলাম, মাথা আর ঠিক রাখতে পারলাম না। চোর, খুনী বলে তাকে গাল দিয়ে উঠলাম। আমাকে মরার জন্যে যে ফেলে রেখে গেছে এবং আমি সেটা বুঝে ফেলেছি, তাও বলে বসলাম। হুমকি দিলাম, সিওয়ায় ফিরেই আমি তাকে পুলিশে দেব। এখানেই করলাম ভুল। আমাকে বেঁধে ফেলার নির্দেশ দিল ও টুয়ারেগদের। তারপর গেল আপনাদের বিদেয় করতে। ও ভেবেছিল আপনি একা। আপনি চলে গেলে আমাকে খুন করত।' থেমে দম নিল পল। 'এখন কি করতে চান?'

এক মুহূর্ত ভাবল ওমর। 'সেটা এখন আপনার ওপর নির্ভর করে। আর একদিনের বেশি এখানে থাকা সম্ভব হবে না। খাবার ফুরিয়ে গেছে। আজ যদি

কবরটা ভাঙা সম্ভব হয়, তাহলে দেখে যেতে পারব। ভাঙা না হলেও আগামীকাল ভোরে রওনা হতেই হবে আমাদের, যদি ইতিমধ্যে ঝড়টড় না এসে পড়ে। আপনি আমাদের সঙ্গে যাবেন, না থাকবেন, সেটা আপনার ইচ্ছে।'

চোখ তুলে তাকাল পল। এঞ্জিনের শব্দে ওদের কথাবার্তা নিশ্চয় শুনতে পায়নি হুরুম। সেদিকে তাকিয়ে থেকে পল বলল, 'মনে হচ্ছে আজকেই ভাঙা হয়ে যাবে। যদি না-ই পারে, কাল আর আমিও থাকব না, বাড়ি চলে যাব। লোভ করে মরার কোন মানে হয় না।'

'এতক্ষণে বুঝলেন। এদের সঙ্গে থাকলে আজ হোক কাল হোক, মরতেই হবে আপনাকে, নিশ্চিত থাকতে পারেন। এতজনের সঙ্গে একা পারবেন না। খারতুগার ব্যাপারে কতখানি জানেন?'

'প্রায় কিছুই না। আমার সামনে কথা বলে না দুজনে। নিশ্চয় আমার ব্যাপারে ওকে প্রচুর মিথ্যে কথা বলেছে হুরুম।'

'আপনি বলতে চাইছেন আপনার ব্যাপারে সব কথা জানে না খারতুগা?'

'প্রশ্নই ওঠে না। মিনিটখানেকের জন্যে আমার সঙ্গে একা ছিল খারতুগা। আমার প্লেনটা কোথায় জিজ্ঞেস করেছিলাম তাকে। এমন ভঙ্গিতে আমার দিকে তাকাল, বুঝলাম ওটার কথা কিছুই জানে না। হুরুম চলে আসায় আর কিছু জিজ্ঞেস করতে পারলাম না তাকে।'

'হুঁ,' আনমনে মাথা ঝাঁকাল ওমর। 'প্লেনটা কোথায়, হুরুমকে জিজ্ঞেস করেই জেনে নিতে হবে। তবে আমার যা মনে হয়, আপনার প্লেনটাকে খরচের খাতায় ফেলে দিতে পারেন।'

'এত সহজে!' কঠোর হয়ে গেল পলের মুখচোখ। 'ওকে আমি ছাড়ব ভেবেছেন?'

'না ছেড়ে কি করবেন? যদি নষ্ট করে ফেলে থাকে? টাকাও ওর কাছে নেই যে দাম আদায় করবেন।'

পলের সঙ্গে কথা বলছে ওমর, কিন্তু সর্বক্ষণ একটা চোখ রেখেছে হুরুম আর তার সাঙ্গোপাঙ্গোদের দিকে। কবর ভাঙায় উন্নতি হয়েছে অনেকটা। ফোকরের কাছ থেকে ভাঙা শুরু করেছে খারতুগা। একটা পাথর আলগা করে ফেলেছে। টেনে তুলে আনা যাবে ওটা।

খারতুগার কাঁধে হাত রেখে কিছু বলল হুরুম। বোধহয় তাকে সরে যেতে বলল। থেমে গেল এঞ্জিন। পাথরটা তোলার চেষ্টা না করে বরং ঘুরে দাঁড়াল হুরুম। দ্রুত হেঁটে এসে দাঁড়াল ওমরের সামনে। 'কি করবেন ঠিক করলেন কিছু? অনেক সময় দেয়া হয়েছে আপনাকে।'

কঠিন স্বরে জবাব দিল ওমর, 'তুমি আমাকে সময় দেয়ার কে? কি করব না করব সেটা আমার ব্যাপার। কবরটা খোলার আগে আমি নড়ছি না এখান থেকে।'

'যদি আর না খুলি?'

'তোমাকে খুলতে বাধ্য করব আমি,' পিস্তল নাচাল ওমর।

জবাব শুনে থমকে গেল হুরুম। চিন্তা করল এক মুহূর্ত। হুমকিতে কাজ হয়নি। ওমরের বিরুদ্ধে আপাতত কিছু করারও নেই তার। হাল ছেড়ে দেয়ার ভঙ্গি করে

বলল, 'বেশ. তাহলে একটা চুক্তিতে আসা যাক।'

'কিসের চুক্তি?'

'কবরে গুপ্তধন পাওয়া গেলে তার কি হবে?'

'এতে আর নতুন করে কথা বলার কি হলো? পলের সঙ্গে চুক্তি করেই তো ঘর থেকে বেরিয়েছিলে। যা পাওয়া যাবে তার অর্ধেক ওর।'

'কিন্তু আমি ওকে খারতুগার কথা বলেছি…'

'সেটা তুমি বলেছ. পল মেনে নেয়নি। বেশি কথা না বলে যা করছিলে করোগে। যাও।'

ওমরের মুখের দিকে তাকাল হুরুম। তিনটে পিস্তলের ওপর চোখ বোলাল। জিভ দিয়ে শুকনো ঠোঁট চাটল। তারপর হতাশ ভঙ্গিতে ঘুরে রওনা হয়ে গেল কবরের দিকে।

আলগা পাথরটার কাছে হাঁটু গেড়ে বসল ও। দুহাতে কিনার খামচে ধরে এপাশ-ওপাশ, ওপরে-নিচে টানাটানি শুরু করল। খুলে এল পাথরটা। বড় একটা ফোকর তৈরি হলো। তবে মানুষ ঢোকার জন্যে যথেষ্ট নয়। আরও পাথর খুলতে হবে। কিন্তু তর সইল না ওর। ভেতরে কি আছে দেখার জন্যে হাত ঢুকিয়ে দিল। কয়েক সেকেণ্ড পর কি যেন হাতে ঠেকতে বের করে আনল। একটা মানুষের খুলি। বিরক্ত ভঙ্গিতে মুখ বাঁকিয়ে ছুঁড়ে ফেলল সেটা।

'একজন মরা মানুষের সঙ্গে এ রকম দুর্ব্যবহার করা উচিত হচ্ছে না,' ব্যঙ্গ করল মুসা।

জ্বলন্ত চোখে ওর দিকে তাকাল হুরুম, 'ফ্যাচফ্যাচ কোরো না! দেখই না কি বের করি। আরও আছে,' বলে আবার হাত ঢোকাল ভেতরে। হাতড়াতে শুরু করল।

আবার বলল মুসা, 'সাবধান! ভেতরে কিন্তু…'

কথা শেষ হলো না ওর। বিকৃত হয়ে গেল হুরুমের মুখ। এক চিৎকার দিয়ে ঝটকা মেরে বের করে আনল হাতটা। এক আঙুলের মাথা আঁকড়ে আছে একটা বিশাল কাঁকড়াবিছে। পলের শাবলের ডগায় যেটা বেরিয়ে এসেছিল, সেটাও হতে পারে। লেজটা বাঁকা করে চোখা অংশটা চেপে ধরে রেখেছে আঙুলে। পুরো ঢুকিয়ে দিয়েছে হুল।

হাত ঝাঁকি দিয়ে বিছেটাকে ছুঁড়ে ফেলল হুরুম। ছাই হয়ে গেছে চেহারা। আঙুল চেপে ধরে বসে পড়ল মাটিতে। যন্ত্রণায় গোঙাচ্ছে।

ঘটনার আকস্মিকতায় স্তব্ধ হয়ে গেছে সবাই। এত খারাপ লোকটার জন্যেও দুঃখ হতে লাগল কিশোরের। নিজের শরীরে কখনও কাঁকড়াবিছের হুল ফোটেনি ওর, কিন্তু ওই বিষের শিকার যন্ত্রণাকাতর মানুষের ভয়াবহ ভোগান্তি দেখেছে।

'আমাকে বাঁচাও!' চিৎকার করে বলল হুরুম। 'চুপচাপ দাঁড়িয়ে থেকো না সবাই! প্লীজ! কিছু একটা করো!'

খারতুগার দিকে তাকাল ওমর, 'কিছু করতে পারবেন?'

মাথা নেড়ে শুকনো গলায় বলল খারতুগা, 'কি করতে হয় কিছুই জানি না আমি।'

টুয়ারেগেরা দাঁড়িয়ে আছে চুপচাপ। কালো চোখের তারায় কোন ভাবান্তর নেই। এ ধরনের ঘটনা ওরা নিশ্চয় ঘটতে দেখেছে অনেক। কি করতে হয়, হয়তো জানাও আছে। কিন্তু সাহায্যের জন্যে এগিয়ে এল না একজনও।

হুরুমের কাছে গিয়ে বসল কিশোর। আরেক দিক থেকে এগিয়ে এল রবিন। হাতটা তুলে নিয়ে পরীক্ষা করল কিশোর। আঙুলটা ফুলে দ্বিগুণ হয়ে গেছে। হাতের বাকি অংশ ফুলতে আরম্ভ করেছে। তারপর ফুলবে কব্জি। হাতের শিরা বেয়ে বাহুতে উঠে যাবে বিষ। রবিনকে শক্ত করে কব্জি চেপে ধরতে বলে নিজে টিপে ধরল আঙুলের গোড়া। হুরুমকে জিজ্ঞেস করল, 'এ রকম অ্যাক্সিডেন্ট ঘটতে পারে জানতেন না আপনি? ওষুধ-টষুধ কিছু আনেননি?'

'না। তোমাদের কাছে কিছু আছে?' আতঙ্ক আর যন্ত্রণায় থরথর করে কাঁপছে হুরুম।

'না, আমাদের কাছে যা আছে তাতে চলবে না। ডাক্তার দরকার।'

জোরে গুঙিয়ে উঠল হুরুম। মনে হলো চোখ উল্টে দিয়ে পড়ে যাবে।

অসহায় দৃষ্টিতে ওমরের দিকে তাকাল কিশোর। হুরুমের রক্তে ছড়িয়ে পড়তে আরম্ভ করেছে বিষ। কিছু করার নেই তার। এখানে কারোরই কিছু করার নেই। পকেট থেকে রুমাল বের করে হাতের কব্জিতে টর্নিকেট বেঁধে দিল। কাঁধের ওপর দিয়ে ফিরে তাকিয়ে মুসাকে বলল, 'জলদি গিয়ে ফার্স্ট এইড বক্সটা নিয়ে এসো।'

দৌড় দিল মুসা।

কিশোর জানে, খুব একটা লাভ নেই। মুসা আসতে আসতে হুরুমের রক্তে ছড়িয়ে যাবে বিষ। ব্যথা নিরোধক ট্যাবলেট দিয়ে হুরুমের যন্ত্রণা কিছুটা কমানো ছাড়া আর কোন উপকার করতে পারবে না।

নেতিয়ে পড়ছে হুরুম।

চড়া হচ্ছে রোদ। দুটো পাথরের সঙ্গে এঞ্জিন ঢাকার পলিথিনটা টাঙিয়ে দিয়ে অতিসামান্য ছায়ার ব্যবস্থা করা হলো। ধরাধরি করে সেখানে নিয়ে বসানো হলো হুরুমকে।

'এ রকম পরিণতি হবে ওর,' শুকনো গলায় আফসোস করে বলল ওমর, 'কল্পনাও করিনি!'

'সিওয়ায় নিয়ে যাওয়া যায় না?' রবিনের প্রশ্ন।

'সেকথাও ভাবছি। অসুবিধে আছে। নানা রকম প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হবে। পুলিশের পাল্লায় পড়লে জবাব দিতে দিতে জান যাবে।' খারতুগার দিকে তাকাল ওমর, 'আপনি কিছু করতে পারেন না? আপনার দলেরই তো লোক।'

'আমি কি করতে পারি, বলুন? উটে করে সিওয়ায় যেতে পাঁচ-ছয়দিন লেগে যাবে।'

অতদিনে হুরুম হয় শেষ হয়ে যাবে, নয়তো বিষের ক্ষতিকর প্রভাব থেকে আপনাআপনি সেরে উঠতে থাকবে। সুতরাং মরুভূমির ওপর দিয়ে উটে চড়ে দীর্ঘযাত্রা তার কোন উপকারে আসবে না।

সিগারেট বের করে ধরাতে গিয়ে লক্ষ করল ওমর, টুয়ারেগেরা নেই। পলের দিকে তাকাল, 'ওরা গেল কোথায়?'

'আমি জানি না।'

'উটগুলোও তো নেই!'

ছ'টার জায়গায় মাত্র দুটো উট আছে এখন।

সবাই হুরুমকে নিয়ে ব্যস্ত ছিল, টুয়ারেগদের দিকে চোখ ছিল না কারও। এই সুযোগে নিঃশব্দে সরে গেছে ওরা।

'পালিয়েছে,' গম্ভীর হয়ে বলল ওমর।

হাত তুলল রবিন, 'ওই যে, যাচ্ছে ওরা!'

মরুভূমির ওপর দিয়ে দুলকি চালে ছুটে চলেছে চারটে উট। বালির পাহাড়ের ওপাশে হারিয়ে যেতে দেরি নেই।

খারতুগার দিকে তাকাল ওমর। 'ওরা আপনার লোক না?' তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল ওর কণ্ঠ। 'আপনি চলে যেতে বলেছেন?'

'না, আমি বলব কেন?'

'তাহলে যে আপনাকে ফেলেই চলে গেল?'

হতাশ ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকাল খারতুগা। দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, 'আসতে চাইছিল না, প্রায় জোর করে ধরে এনেছিলাম ওদের। কবর ভাঙা ওদের পছন্দ নয়। ভাবে, পাপ হবে। অভিশাপ দেবে মৃতের আত্মা। ওরা নিশ্চয় ভেবেছে, কাঁকড়াবিছেটা কবরের প্রহরী। তাই কামড়ে দিয়েছে হুরুমকে।'

মাথা দুলিয়ে ওমর বলল, 'হ্যাঁ, তাই ভেবেছে। তাহলে আর ফিরে আসবে না ওরা।'

'না।'

'আপনি তো পড়লেন এখন বিপদে। ওই দুটো উট নিশ্চয় আপনার। আমাদের সঙ্গে গেলে ফেলে যেতে হবে।'

'না, আমি আপনাদের সঙ্গে যাব না। উট দুটো আর এঞ্জিনটাই এখন আমার সম্বল, বাকি সব খরচ হয়ে গেছে এই অভিযানে।'

চুপ হয়ে গেল সবাই। চামড়া পোড়াতে আরম্ভ করেছে ভয়ানক রোদ। কিন্তু অনুভব করছে না যেন কেউ। নীরবে তাকিয়ে আছে টুয়ারেগদের দিকে। পাহাড়ের ওপারে এমনভাবে অদৃশ্য হলো ওরা, মনে হলো হজম করে ফেলল ওদের বালির সমুদ্র।

খারতুগার দিকে ফিরল ওমর, আচমকা ছুঁড়ে দিল প্রশ্নগুলো, 'কে আপনি? কোত্থেকে এসেছেন? এর মধ্যে কেন ঢুকলেন?'

জবাবে খারতুগা বলল, 'একই প্রশ্ন তো আপনাদেরও করতে পারি আমি?'

'যেহেতু প্রশ্ন আমি আগে করেছি, আগে আপনি জবাব দিন।'

পনেরো

বেহুঁশের মত পড়ে আছে হুরুম। চোখ বুজে থেকেই গুঙিয়ে উঠল। নিজেদের গায়ের ছায়া দিয়ে আরেকটু ছায়ায় রাখা যায় কিনা ওকে, সেই চেষ্টা করল সবাই

খারতুগা বলল, 'আমার বাড়ি তুরস্কে। মিশরে আছি বহুদিন। ক্যারিয়ার শুরু

করেছিলাম আর্কিওলজি দিয়ে। কিন্তু তাতে টাকা পেলাম না। বহুকষ্টে অল্পস্বল্প যা জমালাম তা দিয়ে অ্যানটিক ব্যবসা শুরু করলাম। সেই সাথে পেশাদার অভিযাত্রী। এ কারণেই আমি এখন এখানে।'

'কবরে যা পাবেন নিশ্চয় রেখে দেবেন?'

'না, তা আমি করব না। অসৎ নই। সেজন্যেই মিশরীয় সরকারের বিশ্বাস আছে আমার ওপর। মূল্যবান কিছু পেলে ওদের দিয়ে দেব।'

'বিনিময়ে?'

'কিছু কমিশন। বিনে পয়সায় বেকার খাটতে যাব কেন? আমারও তো পেট আছে।'

'আপনি থাকেন কোথায়?'

'সিওয়ার কাছে ম্যাসিরে লেকের পাড়ে আমার একটা ছোট বাড়ি আছে। ওখানে লোকে আমার নাম জানে, আমাকে চেনে। কোন অ্যানটিক পেলে আমার কাছে নিয়ে আসে বিক্রির জন্যে। কখনও ঠকাই না আমি ওদের।'

'ওখানেই হুরুমের সঙ্গে পরিচয়?'

'না। দুবছর আগে আপার ইজিপ্টে প্রথম দেখা হয় ওর সাথে। পুরানো একটা ধ্বংস্তূপে খোঁড়াখুঁড়ি করছিলাম তখন। আমার সাথে কিছুদিন কাজ করে ও। তারপর চলে যায়। মাস দুই আগে ম্যাসিরে আমার বাড়িতে গিয়ে হাজির। বলে, কিং রাস টেনাজার কবর খুঁজে পেয়েছে সে। অভিযানের খরচ জোগালে আমাকে ওখানে নিয়ে যেতে পারে। আমার কাছে যাওয়ার কারণ, সে জানত, শক্ত কবর ভাঙার ড্রিল মেশিন আছে আমার।'

পলের দিকে তাকাল ওমর, 'এবার বুঝলেন তো সিওয়ায় আপনাকে একা ফেলে কোথায় যেত সে? আপনার সঙ্গে খাতির করেছিল শুধু আপনার প্লেনটার জন্যে।' আবার খারতুগার দিকে ফিরল সে। 'আপনার মত একই প্রস্তাব পল কাস্টারকেও দিয়েছিল হুরুম—গুপ্তধনের অর্ধেক ভাগ দেবে।'

অবাক হলো খারতুগা, 'বুঝলাম না?'

'কারও সঙ্গে গুপ্তধন ভাগাভাগির ইচ্ছে কখনই ছিল না হুরুমের। যা পাবে সব একা মেরে দেয়ার মতলবে ছিল। আদিবাসীদের মুখে কিংবা যে ভাবেই হোক, রাস টেনাজার কবরটার কথা শুনেছিল সে। ওটা আবিষ্কারের পরিকল্পনা করেছিল। প্রথমে তার দরকার ছিল একটা প্লেন। পল কাস্টারকে পাকড়াও করল। কবরটা আবিষ্কারের পর পরই তাকে বোকা বানিয়ে তার প্লেনটা নিয়ে পালাল। তাকে এখানে রেখে গেল পানি আর খাবারের অভাবে ধুঁকে ধুঁকে মরার জন্যে। সোজা চলে গেল আপনার কাছে, কারণ কবর ভাঙার জন্যে তখন আপনার সাহায্য দরকার তার।' পলকে কিভাবে আমেরিকা থেকে নিয়ে এসেছে হুরুম, তাকে ফেলে গেছে, কিভাবে বেঁচেছে পল, খুলে বলল ওমর।

শুনে শিওরে উঠল খারতুগা, 'বিশ্বাস করুন, আমি এর কিছুই জানতাম না!'

'বিশ্বাস করছি।'

'লোকটা তো একটা ইবলিস।'

'এবং মিথ্যুক। সারাজীবনে কখনও সত্যি কথা বলেছে কিনা আল্লাহ্ জানে!

তাহলে বুঝতে পারছেন এখন,' ওমর বলল, 'প্লেনটার জন্যে পলকে ব্যবহার করেছে। কবর ভাঙার জন্যে টেনে এনেছে আপনাকে। গুপ্তধন পাওয়া গেলে আপনাকেও দিত কিনা সন্দেহ আছে। আপনাকে সিওয়ায় ফিরতে দিত না ও। মিথ্যে কথা বলে টুয়ারেগদের ভাগিয়ে দিত আপনার কাছ থেকে। তারপর আপনাকে খুন করে সমস্ত ধনরত্ন নিয়ে হাওয়া হয়ে যেত।'

'তা সম্ভব,' ধীরে ধীরে মাথা দোলাল খারতুগা। 'এখন মনে পড়ছে, সুযোগ পেলেই আমাকে লুকিয়ে টুয়ারেগদের সঙ্গে ফিসফিস করত সে। অদ্ভুত দৃষ্টিতে তখন আমার দিকে তাকাত ওরা।'

গিরিখাতের দিকে তাকিয়ে কিশোর বলল, 'মুসা আসতে এত দেরি করছে কেন?'

'যেতে-আসতে সময় তো লাগবে,' বলল ওমর। আবার তাকাল খারতুগার দিকে, 'সিওয়ায় আমাদের ক্যাম্পের জিনিসপত্র কে পুড়িয়েছিল, জানেন কিছু?'

'কই, না তো!'

'এল আরিগ মরুদ্যান হয়ে আসেননি আপনারা?'

'হ্যাঁ।'

'তাহলে তো আমাদের তাঁবু নিশ্চয় দেখেছেন।'

'দেখেছি। কিন্তু আমরা ছুঁইওনি কিছু।'

ভ্রূকুটি করল ওমর, 'সত্যি বলছেন?'

'মিথ্যে বলব কেন?' কি যেন ভাবল খারতুগা। লম্বা দম নিল। 'বুঝেছি! হুরুমই পুড়িয়েছে!'

'আপনাদের অগোচরে কি করে পোড়াল?'

'মরুদ্যান পার হয়ে এসেছি আমরা। হুরুম বলল, একটা জরুরী জিনিস ফেলে এসেছে। আমাদের ধীরে এগোতে বলে নিয়ে আসার জন্যে ফিরে গেল।'

'তারপর?'

'কিছুক্ষণ পর তাড়াহুড়া করে ফিরে এল। কি জিনিস আনতে গিয়েছিল, কিছুই বলল না।'

মাথা ঝাঁকাল ওমর, 'হুঁ, আগেই সন্দেহ করেছিলাম আমরা, ওর কাজ।'

দু'তিন সেকেণ্ড চুপ করে থেকে খারতুগা জিজ্ঞেস করল, 'ওকে এখন কি করবেন আপনারা?'

'কিছুই না। ইচ্ছে করলে নিয়ে গিয়ে পুলিশের হাতে তুলে দিতে পারি, কিন্তু তাতে কি লাভ? পলের ঝামেলা বাড়বে, আরও কিছু বাড়তি টাকা খরচ হবে। কে যায় আর ওসব করতে।'

'আপনারা কিছু করেন আর না করেন, আমি ওকে ছাড়ব না,' তিক্তকণ্ঠে বলল খারতুগা। 'মিশরে যাতে আর ঢুকতে না পারে সেই ব্যবস্থা করব। ও সবার জন্যে বিপজ্জনক। কায়রো পুলিশকে জানাব। ওখানে আমার কিছুটা প্রভাব-প্রতিপত্তি আছে।'

'সেটা আপনার ব্যাপার,' হাত নাড়ল ওমর।

কিশোর বলল, 'কবরের মধ্যে কি আছে, এখনও জানি না আমরা। মুসা

আসতে আসতে কিন্তু দেখে ফেলা যায়।'

'ঠিকই বলেছে। তাতে সময়ও বাঁচবে।' আর্কিওলজিস্টের দিকে তাকাল ওমর, 'আপনি কি বলেন, মিস্টার খারতুগা?'

'দেখা যায়,' অমত করল না খারতুগা। 'একটা পাথর তো সরিয়েই ফেলেছি। ফাঁক বড় করতে এখন আর কষ্ট হবে না।'

আবার চালু হলো এঞ্জিন। একের পর এক পাথরের জোড়া আলগা করে খসিয়ে আনতে লাগল খারতুগা। তাকে সাহায্য করল পল, ওমর আর রবিন। হুরুমের কাছে বসে রইল কিশোর।

ভয়াবহ গরমের মধ্যে ড্রিল চালাতে চালাতে বলল খারতুগা, 'তাড়াহুড়া করতে মানা করেছিলাম ওকে আমি। বেশি অধৈর্য হওয়াতেই এই অবস্থা।'

'ভাল হয়েছে,' পল বলল, 'শয়তানের উচিত সাজা।'

বড় একটা ফোকর তৈরি হতেই আশপাশের পাথরগুলো আর ভার ধরে রাখতে পারল না। আপনাআপনি ধসে পড়ল কয়েকটা। খুলে গেল কবর। আরও কয়েক মিনিট পরিশ্রম করে তুলে আনা হলো সেগুলো। ভেতরে কি আছে দেখার জন্যে উঁকি দিল সবাই। কিশোরও দেখার জন্যে উঠে এল।

গুপ্তধনের চিহ্নও নেই। বালির মেঝেতে পড়ে আছে একটা খড়ের মাদুর, একটা কম্বল, আর একটা চাদর। এত পুরানো, রঙই বোঝা যায় না। শতচ্ছিন্ন। তার ওপর পড়ে আছে একটা কঙ্কাল। বড় আকারের হাড়গুলো বাদে বাকি হাড়ও নেই সব, নষ্ট হয়ে গেছে। খুলিটা আগেই বের করে ফেলে দিয়েছে হুরুম।

সিগারেট ধরাল ওমর। পলকে বলল, 'কি বুঝলেন? পেলেন তো আপনার গুপ্তধন?'

খারতুগা বলল, 'বেশির ভাগ সময়ই এ রকম হয়। প্রত্নতাত্ত্বিকের ভাগ্যে জোটে কেবল হতাশা। সেজন্যেই তো অ্যান্টিকের ব্যবসা ধরেছি।'

'কবরটা লুট হয়নি তো?' জিজ্ঞেস করল কিশোর।

'না। একেবারেই আস্ত পেয়েছি। লুট হওয়ার কোন চিহ্ন নেই। কিছুই ছিল না এর মধ্যে। হাতে দেখো, একটা সোনার বালা। এ ধরনের কবরে এ জিনিস প্রায়ই দেখা যায়।' কঙ্কালের গলার কাছে পড়ে থাকা একটা হার তুলে আনল খারতুগা। চামড়ার ফিতেয় কিছু সোনা আর পান্নার গুটি আটকে দিয়ে তৈরি হয়েছে ওটা। 'এটাতে সোনাটুকুরই যা দাম। পান্নাগুলোও ভাল না, প্রচুর খুঁত। বিক্রি হবে না।'

আর একটিমাত্র জিনিস পাওয়া গেল কবরে, একটা তলোয়ার। মরচে পড়ে খেয়ে গেছে। সামান্য চাপ লাগলেই ভেঙে যাবে।

'এবার নিশ্চিন্তে বাড়ি যেতে পারি আমরা,' কবরের কাছ থেকে সরে এল ওমর। পলের দিকে তাকিয়ে সহানুভূতির হাসি হেসে জিজ্ঞেস করল, 'কি, খুব হতাশ লাগছে?'

'না, সত্যি লাগছে না,' খসখসে গলায় জবাব দিল পল। 'সাংঘাতিক কিছু দেখতে পাব আশা করেছিলাম আমি, তা ঠিক। কিন্তু আর্কিওলজিস্ট হিসেবে আমিও জানি, এ রকম নিরাশ হওয়া লাগতে পারে। ফিফটি ফিফটি চান্স।'

'সমস্যা এখন হুরুমকে নিয়ে,' পড়ে থাকা দেহটার দিকে তাকাল ওমর। 'একে

কি করব? ফেলে তো আর যাওয়া যায় না।'

'সেটা আপনার ইচ্ছে।'

এই সময় ফার্স্ট এইড বক্স নিয়ে হাজির হলো মুসা। ওটা খুলে হুরুমের পাশে বসল কিশোর। কাঁকড়াবিছের কামড়ের প্রতিষেধক কি জানা নেই তার, তবে সাপে কামড়ালে কি করতে হয় জানে। সেভাবেই হুরুমের চিকিৎসা করার সিদ্ধান্ত নিল।

আবার গোঙাতে শুরু করেছে হুরুম।

'দেখি, সোজা হন,' গায়ে ঠেলা দিয়ে কিশোর বলল ওকে। 'ভাল করে দেখতে দিন হাতটা।'

চোখ মেলল হুরুম। ওমরের ওপর চোখ পড়তেই দুর্বল কণ্ঠে জানতে চাইল 'আমাকে কি করবেন?'

'কি আর করব? প্লেনে তুলে নেব। মরুভূমিতে নিয়ে ধাক্কা মেরে দেব ফেলে। শুঁটকি হয়ে বালি পাহারা দেবে।'

প্রচুর ব্র্যাণ্ডি সহ হুরুমকে একটা ব্যাথা-নিরোধক ট্যাবলেট খাইয়ে দিল কিশোর। 'হ্যাঁ, হাতটা দিন এবার।'

অনেক কষ্টে গোঙাতে গোঙাতে হাতটা তুলে ধরল হুরুম। বেগুনী হয়ে যাওয়া, কাঁধ পর্যন্ত ফোলা হাতটার দিকে তাকানো যায় না।

কিশোর ডাক্তার নয়। তবু যতটা সম্ভব করল। হুল ফোটানোর জায়গাটা খুঁজে বের করে প্রথমে আয়োডিন মাখাল সেখানে। তারপর ছুরির মাথা দিয়ে গভীর করে চিরে দিল খানিকটা জায়গা। রক্ত দেখে আবার মূর্ছা যাচ্ছিল হুরুম। পারমাঙ্গানেট অভ পটাশের কিছু গুঁড়ো সেখানে ডলে দিয়ে ব্যাণ্ডেজ বাঁধল কিশোর। স্লিং বানিয়ে ঝুলিয়ে দিল হাতটা। আরেক ঢোক ব্র্যাণ্ডি খাওয়াল হুরুমকে। বলল, 'এবার উঠে বসুন।'

'আমি পারছি না!'

'তাহলে শুয়ে থাকুন এখানে। মরুন। রক্ত চলাচল স্বাভাবিক না রাখলে বিষ...'

লাফ দিয়ে উঠে বসল হুরুম।

'নিজের মরার কথা শুনলেই সব ঠিক,' ব্যঙ্গ করে বলল ওমর। 'শোনো, আমি কিছু প্রশ্ন করব, ঠিক ঠিক জবাব দেবে। তবে সবার আগে কবরে কি পাওয়া গেছে সেখবর তোমাকে জানানো দরকার।'

হাঁ করে তাকিয়ে রইল হুরুম। 'পাওয়া গেছে! কি?'

'কয়েকটা পুরানো হাড়গোড়। ভাগাভাগির প্রয়োজন নেই। ইচ্ছে করলে সব নিতে পারো।'

আরেকটা গোঙানি দিয়ে আবার গড়িয়ে পড়ল হুরুম। 'আমি শেষ! আমার সব টাকা এর মধ্যে খাটিয়েছিলাম!'

'অন্য লোকের টাকাও যে গেল, তার কি হবে?' ঝাঁঝাল কণ্ঠে বলল ওমর। 'শিক্ষা হয়েছে তোমার। পলের প্লেনটা কি করেছ?'

দ্বিধা করতে লাগল হুরুম, 'জেনে কি হবে?'

'কি আর হয়? ওর জিনিস ও নিয়ে যাবে।'

'ওটার কথা ভুলে যেতে বলুন।'
'কেন?'
'ক্র্যাশ-ল্যাণ্ড করেছিলাম। আগুন লেগে জ্বলে গেছে।'
'কিন্তু তুমি তো বললে...'
'মিথ্যে বলেছিলাম।'
'জীবনে কখনও একটা সত্যি কথা বলেছ তুমি? কিভাবে লাগল আগুন?'
'অ্যাক্সিডেন্ট...'
'আবার মিথ্যে কথা!' ধমকে উঠল ওমর। 'আসলে কি ঘটেছে আমি বলি। যেই বুঝলে ওটার প্রয়োজনীয়তা শেষ, নিজেই আগুন লাগিয়ে পুড়িয়ে ফেলেছ, যাতে কেউ কোন প্রশ্ন না করে তোমাকে, কোন ঝামেলায় পড়তে না হয়। তাই করেছ না?'
'হ্যাঁ।'
'কোন জায়গায় নিয়ে পুড়িয়েছ?'
'ফাউনটেইন অভ সান।'
'জায়গাটা সিওয়ার দক্ষিণে,' বলে উঠল খারতুগা।
'যাওয়ার পথে তাহলে দেখে যেতে হবে,' পলের দিকে তাকিয়ে বলল ওমর, 'এটাও সত্যি বলেছে কিনা।' আবার ফিরল হুরুমের দিকে, 'একটা সুখবর দিচ্ছি তোমাকে। তোমার দোস্ত টুয়ারেগরা...'
'ওরা আমার দোস্ত নয়।'
'তা বটে। শয়তানও তোমার কাছ থেকে দশ হাত দূরে থাকবে। ওরা উট নিয়ে পালিয়ে গেছে। অতএব হেঁটে বাড়ি ফিরে যাওয়া ছাড়া আর কোন উপায় নেই তোমার।'
চমকে গেল হুরুম, 'আমাকে এখানে ফেলে যাবেন!'
'আর কি করব ভাবছিলে? জামাই আদরে তুলে নিয়ে যাব?'
'আপনাদের সঙ্গে প্লেনে করে নিলে অসুবিধে কি?'
'তোমার মত নির্লজ্জ জীবনে দেখিনি আমি,' মুখ বাঁকাল ওমর। 'তাকাতেও ঘৃণা হচ্ছে।'
'দোহাই আপনাদের, আর যাই করেন, আমাকে এখানে ফেলে যাবেন না! মরে যাব!'
'পলকে তো সেজন্যেই ফেলে গিয়েছিলে। নিজের বেলায় অত ভয় কেন?'
'ইচ্ছে করলে ও আমার সঙ্গে আসতে পারে,' খারতুগা বলল। 'উট তো দুটো আমার।'
'তাতে ড্রিল মেশিনটা আপনাকে ফেলে যেতে হবে,' ওমর বলল। 'এমনিতেই অনেক টাকা নষ্ট হয়েছে আপনার। এত বদান্যতা প্রাপ্য নয় ওর। ওটা যদি ফেলেই আসেন, আমাদের সঙ্গে আসতে পারেন, পৌঁছে দেব।'
'থ্যাংক ইউ। লাগবে না। উট দুটো খোয়াতে পারব না আমি। মরুভূমি আমার চেনা। ফিরতে অসুবিধে হবে না।'
'তাহলে একাই যান। ওর মত খুনীকে কোন বিশ্বাস নেই। উট দুটোর লোভে

ও আপনাকে খুন করে মরুভূমিতে ফেলে যাবে না তার কি নিশ্চয়তা?' কপালের ঘাম মুছল ওমর। 'এই গরম আর সহ্য হচ্ছে না। গিরিখাতে যাচ্ছি আমরা। কাল ভোরে রওনা দেব।'

'আমার কি হবে?' অনুনয় করে বলল হুরুম।

'ওই কবরের মধ্যে ঢুকে বসে থাকো,' ভাঙা কবরটা দেখাল ওমর। 'ওটাই তোমার স্থান।'

কঙ্কালের গলার কাছে পাওয়া হারটা পলের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে খারতুগা বলল, 'এটা নিয়ে যান। স্যুভনির হিসেবে রেখে দেবেন।'

দুহাত নেড়ে পল বলল, 'লাগবে না! এখানকার কথা আর কোনদিন মনে করতে চাই না আমি। আপনিই রাখুন।'

গিরিখাতের দিকে ফিরে চলল দলটা।

কিছুদূর এগিয়ে ফিরে তাকিয়ে রবিন দেখল, পিছে পিছে আসছে হুরুম। ওমরকে বলল, 'ও তো আসছে। কি করবেন?'

তাকাল না ওমর। নিচু স্বরে বলল, 'আসুক। ফেলে তো আর যেতে পারব না। চেষ্টা করলেও ওর মত নির্লজ্জকে রেখে যাওয়া সম্ভব নয়। শেষে পা জড়িয়ে ধরে কান্নাকাটি শুরু করবে।'

'ও তো মনে হয় ভাল হয়ে গেছে,' মুসা বলল। 'দিব্যি হেঁটে চলে আসছে।'

'ভাল আর কই,' বলল কিশোর। 'ট্যাবলেট খেয়েছে তো, তাই। রাতে ঠাণ্ডা পড়লে টের পাবে, ব্যথা কাকে বলে। মরে না যায়!'

'না, মরবে না,' মাথা নাড়ল মুসা। 'ওই যে কথায় বলে না, শয়তান লোক বাঁচে বেশি। আমার তো ভয় ওকে হুল ফুটিয়ে বিছেটাই না মরে।'

পাশাপাশি হাঁটছে পল আর রবিন। হেসে ফেলল।

* * * *

ভলিউম ২৩

তিন গোয়েন্দা

রকিব হাসান

হাল্লো, কিশোর বন্ধুরা—
আমি কিশোর পাশা বলছি, আমেরিকার রকি বীচ থেকে।
জায়গাটা লস অ্যাঞ্জেলেসে, প্রশান্ত মহাসাগরের তীরে,
হলিউড থেকে মাত্র কয়েক মাইল দূরে।
যারা এখনও আমাদের পরিচয় জানো না, তাদের বলছি,
আমরা তিন বন্ধু একটা গোয়েন্দা সংস্থা খুলেছি, নাম

তিন গোয়েন্দা।

আমি বাঙালী। থাকি চাচা-চাচীর কাছে।
দুই বন্ধুর একজনের নাম মুসা আমান, ব্যায়ামবীর,
আমেরিকান নিগ্রো; অন্যজন আইরিশ আমেরিকান,
রবিন মিলফোর্ড, বইয়ের পোকা।
একই ক্লাসে পড়ি আমরা।
পাশা স্যালভিজ ইয়ার্ডে লোহা-লক্কড়ের জঞ্জালের নিচে
পুরানো এক মোবাইল হোম-এ আমাদের হেডকোয়ার্টার।

তিনটি রহস্যের সমাধান করতে চলেছি—
এসো না, চলে এসো আমাদের দলে।

সেবা প্রকাশনী
সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী

সেবা প্রকাশনী, ২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
শো-রূম: ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
শো-রূম: ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০